প্রকাশকাল [] শ্রাবণ ১৩৬৭

মুদ্রাকর [] অসীম সাহা দি প্যারট প্রেস ৭৬/২ বিধান সরণী কলিকাতা ৭০০০০৬
প্রচ্ছদমুদ্রণ [] স্পেকট্রাম ১৭ মনীন্দ্র মিত্র রো কলিকাতা ৭০০০০৯
প্রকাশক [] রেনুকা সাহা ২০ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট কলিকাতা ৭০০০০৯

উপত্যকা

চুপচাপ দাঁড়িয়ে পড়লাম আমরা। বেলা যেতে এখনও ঘণ্টাখানেক বাকি। বিশ্রামের সময় হয়নি এখনও! দিনের আলো থাকা পর্যন্ত আমরা মার্চ করি···তারপর অন্ধকারে হোঁচট খেতে খেতে ঢুকে পড়ি তাঁবুতে···ভোর হবার আগেই আবার উঠে পড়ি···শুরু হয় আবার পথ চলা। এমনি ভাবেই চলছে প্রতিদিন। এই মাত্র নির্দেশ আসে—আজকের মত এইখানেই থাম, পাহারার ব্যবস্থা করে রাত কাটাবার আয়োজন কর।

সামনে থেকে বিউগলের আওয়াজ আসে। ক্ষীণ শব্দের সংকেত—থেমে পড়! জেকব ইগেন ধুপ্ করে তার বোঁচকা নামায় কাঁধ থেকে। রাস্তার পাশেই বসে পড়ে চার্লি গ্রীন। দাড়ি-গোঁফওলা গোলগাল দেবদূতের মত মুখে হাসবার চেষ্টা করে সে। বেঁটে বামনের মত বাঁটকুল চার্লি। সারা দেহে তার ক্লান্তির অবসাদ। আমি সারির সামনে-পেছনে একবার ভাল করে দেখে নিই। সন্ধ্যায় থামবার মুখে আমাদের লাইন চার পাঁচ এমন কি ছয় মাইলের মতো কখনও লম্বা হয়।

কোনমতে কাঁধের বোঝা নামিয়ে রাখি। হায় ঈশ্বর! বিষম ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সামনে পেছনে রাস্তার উপরে লোকজন বসে পড়ে। শক্ত জমাট মাটিতে বন্দুকের খটখট আওয়াজ হয়। সবাই কাঁধ থেকে বন্দুকের বোঝা নামিয়ে ফেলতে ব্যস্ত। কাঁধ থেকে নামাতে পারলেই বাঁচে। ওজনও তো খুব কম নয়। কমসে কম বিশ পাউণ্ড হবে। মরচে ধরা বেয়নেট লাগান দুর্বহ ভার।

এখানে থামলাম কেন? জেকব জিজ্ঞাসা করে। বিশেষ কাউকে লক্ষ্য করে নয়। ওর চোখে মুখে কোনো ক্লান্তির ছাপ নেই। গম্ভীর মুখে সিধে হয়ে বসে আছে। কালো চোখে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি। একে একে সবাইর মুখের দিকে তাকায় সে। জানতে চায়, কি কারণে থামা হল। লম্বা হিলহিলে চেহারা জেকবের। মুখে একগাল দাড়ি। লম্বা চুল ছড়িয়ে পড়েছে কাঁধের উপর। বঁড়শীর মত বাঁকা লম্বাটে নাক। ঠোঁট দুখানি খুব পাতলা; দাড়ির ফাঁকে লক্ষ না করলে চোখেই পড়ে না। কথা বলবার জন্য হাঁ করলে, তামাকের কালচে ছোপওলা দাঁতগুলো দেখা যায়। পশুসুলভ একটা বেপরোয়াভাব উঁকি মারে ওর মুখের ভাবে।

কেন! এখানে থামলে হয়েছে কি?

এটা তো থামবার জায়গা নয়! শীর্ণ হাত নেড়ে সে অরক্ষিত খোলা জায়গাটা দেখায়।

এ যে থামবার জায়গা নয়, এটা বুঝতে জেনারেল হবার দরকার হয় না।

বিশাল একটা সমতল প্রান্তরে আমরা থেমেছি। উত্তরে কিছুটা দূরে দেখা যাচ্ছে উঁচুনীচু পাহাড়ের সার! পাহাড় মানেই নিরাপদ আশ্রয়। কিন্তু এই খোলা প্রান্তরে ছয় মাইল লম্বা পল্টন যদি আটকা পড়ে তো কি হবে? কিন্তু এসব ভাবনা চিন্তা অনেকে আগেই চুকিয়ে ফেলা হয়েছে। এখন অনেকেই বেপরোয়া।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমিও বসে পড়ি রাস্তায়। ক্লান্ত পা দুটো সামনে বিছিয়ে দিই। কতক্ষণই

বা বসা যাবে এ ভাবে ? বেজায় ঠাণ্ডা। পা দুটো জমে যাবে ঠাণ্ডায় ! মনে হচ্ছে আধঘণ্টা-খানেক বসলেই পা দুটো অসাড় হয়ে জমে যাবে।
আমাদের রেজিমেন্টের আর সকলেও আমাকে ঘিরে বসে। আমি ছাড়া আর মাত্র আটজন আছে আমাদের রেজিমেন্টে। কোন অফিসার নেই। ন'জনের জন্য আর অফিসারের দরকার কি ? একটা ছেঁড়াখোঁড়া ঝাণ্ডা ছিল। কিন্তু সেটাকে টুকরো করে এলি জ্যাকসন পায়ে জড়িয়ে নিয়েছে। চার নম্বর নিউইয়র্ক রেজিমেন্টে ছিলাম আমরা। এক সময় প্রায় তিনশো লোক ছিল আমাদের দলে। হোয়াইট প্লেইনসের মেজর এণ্টন ছিল আমাদের নেতা, নিজের বাড়ির কাছাকাছি হোয়াইট প্লেইনসেই মারা গেলেন। ইডেন সেজ ছিল ক্যাপ্টেন। সেও মরেছে। লেফটন্যাণ্ট ফেরেলও ফুটেছে আমাশায়। ১৭৭৭ সালের ডিসেম্বর মাসের কোন একদিন থেকে অফিসারবিহীন আমরা। তারিখটা ঠিক মনে নেই। পালাবার সময় সন তারিক ঠিক মনে থাকে না। হয়ত তেরোই ডিসেম্বর হবে, কি চোদ্দ,ইও হতে পারে। একে তেরোই তারপর শুক্রবার—নিতান্ত অশুভ যোগাযোগ। চার্লি গ্রীন তো গান বেঁধেছে তেরোই শুক্রবারের উপর। বোস্টনের মাঠে ভূতপ্রেত ডাইনীদের নেচে বেড়াবার গান।
রাস্তার ডাইনে-বাঁয়ে মাঠের মধ্যে নিজেদের খেয়াল-খুশিমত ছড়িয়ে পড়ল সৈনিকেরা। চমৎকার ছাউনি ফেলা ! যতদূর মনে পড়ে, গোটা প্রান্তরে একটিমাত্র পাথুরে পাকা বাড়ি ছিল বনের কাছাকাছি। জানালা দরজা বন্ধ, কোন আলো নেই—ধোঁয়াও বেরুচ্ছে না ঘর থেকে। মনে হয় এমন এলাকায় আমরা থেমেছি, যেখানকার লোকরা বিদ্রোহীদের ঘৃণা করে।
দুপাশের মাঠ থেকে পথটি নীচু। আমরা উঁচু মাঠের উপর উঠে বসি। এলি জ্যাকসন তার পায়ে জড়ান নেকড়া আবার ঠিক করে বেঁধে নেয়। সব সময় তার পা থেকে রক্ত ঝরে। নাদুস নুদুস চেহারার একটি স্টাফ অফিসার ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে আমাদের পাশ দিয়ে। নীল উর্দিপরা এক অল্প বয়সী ছোঁকড়া জেকব ইগেন থামায় তাকে।
এই যে খোকা বল দেখি, এইখানেই ছাউনি ফেলা হবে তো ? জিজ্ঞাসা করে জেকব।
বিচ্ছিরি নোংরা চেহারা ইগেনের। শুকনো গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, মুখের চার পাশে বরফ ক্ষতর দাগ। অবিশ্যি আমরা কেউই দেখতে এখন আর সুশ্রী নেই। ছেলেটি ঘোড়ার রাশ আলগা করে থামে।
ছাউনি ফেলা হবে কালকে। আজ শুধু সৈনিকদের বিশ্রাম করতে দেওয়া হল।
ও আচ্ছা, তা তোমরা আর জেনারেল মিলে আমাদের জন্য খুব করেছ। শ্লেষ করে বলে জেকব।
গট গট করে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যায় ছেলেটি। জেকব হেসে ওঠে হো হো করে। অফিসারদের বিষম ঘৃণা করে সে। ভগবান সাক্ষী, কেউই আমরা ভালবাসতাম না তাদের। কিন্তু জেকবের ঘৃণার মধ্যে খানিকটা পাগলামির ভাব আছে। আমরা সবাই যে দৃষ্টি ভঙ্গিতে বিপ্লবকে দেখি, সে দেখে তার চাইতে ভিন্ন দৃষ্টিতে। আমাদের কাছে বিপ্লবের অর্থ অনশন, কষ্ট আর শীত ভোগ ; কিন্তু বিপ্লব তার কাছে জনতার তৈরী জ্বলন্ত আগুনের মশালের মত। অফিসারদের সঙ্গে রীতিমত তর্কাতর্কি করে সে। যদি তারা বিপ্লবের সপক্ষে তাহলেই শুধু তারা আমাদের একজন। মানুষের জন্য, মানবতার জন্য সংগ্রাম এটা।

ভগবান আছেন মাথার উপর ; কোন ব্যাটা ঘোড়সওয়ারকে আমি কেয়ার করি না। এই-ভাবেই সে কথা বলে। কিন্তু আমরা তার কথায় বড় একটা কান দিই না। জেকবের কথা বাতাসের দীর্ঘশ্বাসের মত। চুপ করে শুনতে থাকি। শেষ অবধি তার গলার ঘড়ঘড় আওয়াজ ছাড়া কোন শব্দেরই অর্থ মালুম হয় না। একটানা হেঁটে চলি। শেষ পর্যন্ত সৈনিকদের ভীড়ের মধ্যে মিশে যাই। এখন যা আছে, তাকে সেনাবাহিনী বলা যায় না। পাঁচ ছয় মাইল দীর্ঘ এক জনতা ছড়িয়ে বসেছে এই প্রান্তরে। এখন পাশে থাকার চাইতে ভিতরে থাকা অনেক নিরাপদ।

আমরা পেনসিলভানিয়ার রেজিমেণ্টের পাশ কাটিয়ে যাই। জেনারেল ওয়েন তবু এদের মধ্যে খানিকটা নিয়ম শৃঙ্খলা বজায় রেখেছেন। ব্রিগেডে ভাগ হয়ে ছাউনি ফেলেছে ওরা ; পাহারাদার মোতায়েন করেছে। এক ছোকরা সৈনিক আমাদের থামায়। মনে হয় দক্ষিণাঞ্চলের চাষীর ছেলে এই বালকটি। আমরা তাকে কোনো আমল দিলাম না। হো হো করে হেসে তাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে পাশ কাটিয়ে চলতে থাকে। সে রাগত স্বরে বলে ওঠে, কোথাকার নবাব পুত্তুর তোমরা। পেনসিলভানিয়ার এলাকা দিয়ে জবরদস্তি করে চলবার কি অধিকার আছে তোমাদের ?

এডওয়ার্ড ফ্লাগ মোলায়েমভাবে তাকে বলে, এ কি তোর বাপের খাস তালুক ? নরম মেজাজের লোক এডওরার্ড। বেশ বড় ধনী চাষী। রাগে কম ; কিন্তু একবার রাগলে সহজে ঠাণ্ডা হয় না তার মেজাজ।

দেখ্ ছোকরা মারামারি করবার ইচ্ছে আমাদের নেই, বল্লাম আমি। আমরা নিউ ইয়র্কের এক রেজিমেণ্ট। এগিয়ে চলতে থাকি আমরা। পেছন থেকে ছেলেটি চীৎকার করে বলে, চাম উকুনেরও অধম তোরা !

পেনসিলভানিয়াদের এলাকা পার হয়ে চলি। গোলমাল বাঁধাবার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের। মানুষের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়ে তার মাথা বিগড়ে দেওয়া হয়। তারপর সৃষ্টি হয় নরক। এই যুদ্ধে যা হবে তা আমার জানা হয়ে গেছে, বলছি শোন। কেনটন ব্রেমার বলতে শুরু করে।—শেষে যদি উত্তর-দক্ষিণ আর পূব-পশ্চিমের লড়াই শুরু না হয়ে যায় তো কি বলেছি। পেনসিলভানিয়ার ঐ জার্মান খানকির বাচ্চাদের সঙ্গে আমার কোনদিন বনিবনা হবে না। বিনা প্রয়োজনেও জার্মানরা যখন বন্দুক নিয়ে ঘোরে, রাগে আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ব্রিডস্ হিল আর হোয়াইট প্লেইনসের যুদ্ধে কোথায় ছিলে যাদুমনিরা ?

তুমি এখন থাম কেনটন, মস বলে। নেহাৎ ছেলেমানুষ সে। মাত্র বছর আঠারো বয়স। তালিকায় এইবার তার পালা। পালা কথাটাও মসের আবিষ্কার। কে কখন মারা যাবে পালাক্রমে তার একটা তালিকা তৈরী করা হয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে তালিকাটি বানিয়েয়েছে সে। রেজিমেণ্টে কার পর কে মারা যাবে ক্রমানুসারে তার এক দীর্ঘ তালিকা। আশ্চর্যের বিষয় তালিকায় যে নামটি যেখানে আছে প্রায়ই তার কোনো নড়চড় হয়না। এ নিয়ে সে এমন সব নজীর খাড়া করে যে বিশ্বাস না করে উপায় নেই। মসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, সত্যিই এইবার তার পালা। খুকখুক করে সর্বক্ষণ কাছে, রক্ত উঠে শুকিয়ে থাকে ঠোঁটে। যখন সে কিছু কথা বলে, আমরা সবাই তার দিকে তাকিয়ে থাকি। সবাই চুপ করে থাকি !

বিশাল ধূসর মাঠের বুকে চটপট তাঁবু ওঠে অফিসারদের। সৈনিকরা মাঠের সর্বত্র এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে পড়ে! শৃঙ্খলার কোনো বালাই নেই। পেছনের দিককার কিছু সৈনিক রাস্তার উপরেই বসে পড়ে। উত্তরে বনের কিনার থেকে দক্ষিণে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠের সর্বত্র অগনিত সৈনিকের ভীড়।

ওঃ কত লোক! জেকব বলে।

তা' দশ এগারো হাজার হবে, সায় দিয়ে বলি।

সব শালাই এবার ভাগবে।

আঃ আমি আর পারছি না। ভাবছি বাড়ি ফিরে যাব। মস বলে।

কতগুলো গাছের তলায় এসে দাড়ালাম আমরা। মনে হয় ফলের গাছ। কাছাকাছি হাত ত্রিশের মধ্যে কোন লোকজন নেই। গাঁটরি ফেলে দিয়ে ধপ করে বসে পড়ি মাটিতে। ধীরে ধীরে নিজের ইচ্ছে মত বন্দুক গুলো জড়ো করে কেনটন ব্রেন্নার। নীরব উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি আমরা। সত্যিই বড্ড ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

সামান্য খাদ্য ও প্রকৃত বিশ্রামের অভাবে একটা ঝিমানো ভাব আচ্ছন্ন করে ফেলেছে আমাদের। প্রতিটি অঙ্গ, প্রতিটি সংযোগ অসাড় হয়ে আসছে ক্লান্তির অবসাদে। দেহের গভীরে প্রবেশ করেছে অবসাদ, মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে একটি মাত্র আকুতি - সে আকুতি দীর্ঘসময় ধরে ঘুমোবার মতো একটি কোমল বিছানার। যে বিছানা তোমাকে আপন করে নেবে, দূর করবে শরীরের এই গভীর অবসাদ। মাঝে মাঝে মনে পড়বে বাচ্চাদের চাকাওলা বিছানার কথা আর সেই বিছানায় শোওয়া শিশুর কথা। কিম্বা মনে পড়বে রুটি সেঁকার গন্ধ আর ওলন্দাজ উনুনের কথা। মনে পড়বে বাড়ির কথা।

ঠাণ্ডা মাটিতে শুয়ে পড়ি। কেউ টান হয়ে শোয়, কেউ শোয় গুটিসুটি মেরে। কিন্তু আগুন তো জ্বালান দরকার। পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করি; কেউ উঠতে বা নড়তে চায় না। চার্লি গ্রীন লাফিয়ে উঠে পড়ে। তার দিকে চেয়ে থাকি আমরা, কিন্তু কোনো কথা বলি না। তারপর আমিও উঠে পড়ি। গাঁটরি থেকে কুড়োল নিয়ে একটা ফলের গাছের গোড়া কোপাতে শুরু করি। আপেল অথবা প্লাম গাছ হবে হয়ত। ঠিক চিনতে পারি নে। কিন্তু বেশ শক্ত কাঠ।

ব্যথিত দরদী চোখে ওরা আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। একটা ফলের গাছে বড় হবার জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষা করতে হয় সেই কথা মনে পড়ে দুঃখ হয়। কেউ গাছটি পুঁতেছে; তারপর দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা করেছে বেড়ে ওঠবার জন্য। তারপর হয়ত গ্রীষ্মকালে পাকা ফল পেয়েছে।

বলবার জন্য হাঁ করে ক্লার্ক; তারপর নিজেই থেমে যায়। আমি ঝুঁকে পড়ে ডালখানি কেটে না নেওয়া পর্যন্ত ওরা চুপ করে থাকে। এলি জ্যাকসন তখন উঠে দাঁড়ায় এবং ডালখানা ভেঙে টুকরো টুকরো করে।

গ্রীষ্মকালের পাকা ফলের কথা মনে পড়েছে। ফিসফিস করে বলে মস্।

কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে আর একখানা ডাল কাটতে শুরু করি। আমার মনের মধ্যে একটি মাত্র কথা তোলপার করছে। আমার মনের কথাই মনে হয় এই রেজিমেন্টের সবাইকার মনের কথা। আবার যেন গ্রীষ্মকাল আসে। আবার গ্রীষ্মের ঘাম-ঝড়ান রোদ দেখতে

চাই। আবার গ্রীষ্ম আসুক আর রস চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ুক পাকা ফলের খোসা ফেটে!
কাটা ডালখানা টুকরো করে ভেঙে ফেলি।
চকমকি আর ইস্পাত দিয়ে এলি আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে, বয়সে সবার বড় এলি। এলিই আমাদের মুখপাত্র; অবিশ্যি যখন মোলায়েম কথার দরকার হয়। রেগেমেগে নিজেদের মধ্যে যখন ঝগড়াঝাঁটি করি, এলির কণ্ঠস্বর যেন জ্বলন্ত আগুনে জল ঢেলে দেয়। ঈশ্বর সাক্ষী, নিজেদের মধ্যে তখন হামেশাই ঝগড়াঝাঁটি লেগে থাকত। মাংসহীন রোগা চেহারা এলির—হাত দুখানা মস্ত বড়। সেই হাতের নিশ্চিত অক্লান্ত কাজ লক্ষ্য করছি। চকমকির পোড়া শোলা কি ফিতে দুর্লভ। চট্ করে আগুন ধরে এমন কিছুই পাওয়া যায় না। টুপির মধ্যে থাকে টেনে টেনে সুতো বার কেনটন। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি আমি। মনে মনে ভাবি, অনেক অভিজ্ঞতা হল। আমার বয়স এখন একুশ বছর। কিন্তু এই বয়সেই আটটি লোকের দেহমনের ঘনিষ্ঠ পরিচয় জেনেছি জমা হয়েছে অনেক অভিজ্ঞতা।
জোর কদমে ছুটে এসে একটি অফিসার ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে থামে এবং আমাকে গাছ থেকে নামতে বলে।
এই লুঠপাট করা চলবে না, সে বলে। লোকটিকে চেনা চেনা মনে হয়। মুখে একগাল দাড়ি, গায়ে উর্দি নেই। ওয়াশিংটনের দেহরক্ষী বলে মনে হয়। ভার্জিনিয়ানদের ঢঙে কথা বলছে লোকটি।
ইগেন উঠে দাঁড়ায়। জড়ো করা বন্দুকের কাছে যায় সে। আর সকলেও উঠে পড়ে। অফিসারকে গোল করে ঘিরে দাঁড়াই আমরা। সবাইর জামা কাপড় নোংরা আর ছেঁড়া। সবার মুখেই নাকাটা দাড়ি। মস ফুলারের বয়স মাত্র আঠারো, তার মুখেও এক গাল দাড়ি গজিয়েছে। যেমন নোংরা তেমনি শীর্ণ আমরা। পায়ে ছেঁড়া নেকড়া জড়ানো। এলি জ্যাকসনের পায়ে জড়ানো নেকড়ায় রক্তের ছাপ। কি যেন হয়েছে তার পায়ে—সারবার আশা নেই। সব সময় রক্ত ঝরছে। জীবনী শক্তি বেরিয়ে যাচ্ছে ঐ ক্ষতমুখ দিয়ে।
হেই তোমাদের কমাণ্ডার কে? ব্রিগেডের নাম কি?
চার নম্বর নিউ ইয়র্ক।
কেনটন ব্রেন্নার তার বন্দুকটা তুলে নেয়। সঙ্গে সঙ্গে জেকবও। জেকবের চোখে ক্ষুব্ধ রোষ। তার ভাব লক্ষ্য করে অফিসার বলে, তুমিই কমাণ্ডার? তোমার রেজিমেন্টের আর সবাই কোথায়?
আমরা সবাই এখানেই আছি। জেকব বলে। কোন অফিসার নেই আমাদের।
ঘোড়ার পিঠে কাত হয়ে গাছটি দেখিয়ে সে বলে, গাছটা কাটছিলে কেন?
আমরা সবাই বিদ্রূপ করি অফিসারকে। আমি গাছ কাটবার জন্য কুড়োলের কোপ তুলি। পিস্তল উঁচিয়ে আমার মাথা তাক করে সে বলে, লুটপাট করা একদম চলবে না।
কুড়োলের কোপ মারি। গুলির ভয় করি না। সে যে গুলি করবে, এ আমি ভাবতেই পারিনি। ওকে গ্রাহ্যই করিনি। সহসা একটা পিস্তলের আওয়াজ কানে আসে। আমার মাথার টুপিটা উড়ে যায়। কুড়োল হাতে আমি রুখে দাঁড়াই। জেকব আমার সামনে। বন্দুকের নলের এক বাড়িতে সে পিস্তলটি ফেলে দেয় তারপর হেঁচকা টানে অফিসারকে ঘোড়া থেকে টেনে নামায়। চেয়ে দেখি, জেকবের বজ্রমুষ্টির ঘুঁষি পড়ছে তার মুখে চোখে।

মাটিতে পড়ে যায় অফিসারটি। আমরা তাকে ঘিরে ধরি। বোস্টনের লোকজনের আস্তানা আমাদের কাছাকাছি। গুলীর আওয়াজ শুনে তারাও এগিয়ে আসে। অফিসার প্রীতি তাদেরও নেই। আর দখনে অফিসারদের উপরে তো নয়ই।

শুয়োরটাকে খতম করে দেওয়া উচিত। ওদের একজন বলে।

দাস চড়ানো বেজন্মাটাকে খতম করে দাও!

গোঙাতে গোঙাতে অফিসারটি উঠে দাঁড়ায়, তারপর কোন কথা না বলে ঘোড়ায় উঠে চলে যায়। বোস্টনের সৈনিকেরাও চলে যায় তারপর। ইগেন তখন বসে পড়ে এবং দুই হাতের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকে।

কোনমতে আগুন জ্বালান হয়। পোড়াবার জন্য আমরা ফলের গাছটির প্রায় সমস্ত ডালপালা কেটে নিই। এতক্ষণে জোর আগুন জ্বলেছে ; গোধূলির আলোর সঙ্গে মিশে গেছে আগুনের রাঙা আভা। স্টাফ অফিসাররা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। ওয়াশিংটনের মাথা আর সবকটি মাথাকে ছাপিয়ে উঠেছে। ঘোড়ায় চড়ে মাঠ পার হয়ে তারা দূরে বাড়িটার কাছে যায় এবং কবাটে হাতুড়ি মারতে থাকে। কপাট খুলে যায়। জানলার খড়খড়ি খুলে দেওয়া হয়। মিটমিটি আলো দেখা যায় ঘরের মধ্যে।

ঐ রকম একখানা ঘর যদি পাওয়া যেত! ফিসফিস করে মস বলে।

কোয়েকারদের[১] বাড়ি। দেখ কি আরামেই না ওরা আছে। বিড়বিড় করে বলে জেকব। হেসে ওঠে এগ্নি জ্যাকসন। আমাদের পুঁটলিতে কিছু আলু রয়েছে। সেগুলো বার করে বেয়নটের মাথায় ফুঁড়ে আগুনে সেঁকে নেওয়া হয়। আগের দিন এড ফ্লাগ আলু কটি চুরি করেছে। গমের দানা চিবিয়ে যাদের দিন কাটাতে হয়, আলু তাদের কাছে মহার্ঘ বইকি! হঠাৎ গানের সুর আসে কানে। একটি মেয়েছেলেকে বগলদাবা করে আগুনের দিকে হেঁটে আসছে চার্লি গ্রীন। গায়ে গতরে বেশ হৃষ্টপুষ্ট সুন্দরী মেয়ে একটি। নোংরা একটা র‍্যাপার গায়ে জড়ানো। পায়ে ছেঁড়া নেকড়া বাঁধা, মুখে প্রসন্ন হাসি। বুভুক্ষুর মত আমরা তাকে দুচোখ দিয়ে লক্ষ্য করি। মোটাসোটা কাউকে দেখলে সকলেরই ভাল লাগে।

ওর নাম জেনি কার্টার। চার্লি বলে—বাহ্, খাসা নাদুস নুদুস মেয়ে। সে গান গাইতে শুরু করে।

আগুনের পাশে বসে পড়ে মেয়েটি, মোটা পা দুটো ছড়িয়ে দেয় আগুনের দিকে। হাত নেড়ে মাথা ঝাঁকি দিয়ে সে চুল ঠিক করে নেয়। আমরা খেতে শুরু করি।

একে কোথায় পেলে চার্লি?

পেনসিলভানিয়ানদের কাছ থেকে নিয়ে এসেছি। শালা ওলন্দাজ চাষীভূষোগুলোর দলে মেয়েছেলে গিস্‌গিস্ করছে। তা প্রায় শ খানেক হবে। জেনিকে নিয়ে এলাম। বল্লাম আমরা মোহকের লোক। মোহকের একদল খাসা লম্বা লোক রয়েছে এখানে। মেয়েদের খাঁটি ভালবাসা দিতে পারে এমন লোকও আমাদের দলে আছে, চল। কি বল জেনি?

মেয়েটির পাশে বসে দুহাত বাড়িয়ে তাকে জাপ্টে ধরে চার্লি।

দুর! দুর! যত সব নোংরা ভিখারীর দল। থু থু ফেলে মেয়েটি।

সামান্য নোংরাতে নিশ্চিত কিছু মনে করবে না তুমি।

১। নিষ্ঠাবান ধর্মভীরু একটি খৃষ্টান যাজক সম্প্রদায়।

দু চারটে টাকার পরোয়া করিনা আমি।

পুঁটলির মধ্যে থেকে একমুঠো পুরোনো নোট বার করে মেয়েটির কোলে ফেলে দেয় জেকব। নোটগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেয় মেয়েটি। আগুনের শিখা সঙ্গে সঙ্গে টেনে নেয় নোট ক'খানা। ও সবে হবে না।

ওলন্দাজদের মতো দরকষাকষিতে খুব ওস্তাদ হয়ে উঠেছো দেখছি, জেকব বলে।

আমি তাকে একটা এক শিলিংএর মুদ্রা দেখাই। খপ করে মুদ্রাটি কেড়ে নিয়ে পায়ে বাঁধা নেকড়ার মধ্যে লুকিয়ে রাখল মেয়েটি। তারপর পোড়া আলুগুলো ভেঙে তার সঙ্গে কয়েক টুকরো নুন দেওয়া মাংস মেশান হলো। রসিয়ে রসিয়ে আস্তে আস্তে খাওয়া শুরু করা গেল। পুরোপুরি অন্ধকার হয়েছে এখন। পশ্চিম দিগন্তের পটভূমিকায় এখনও সৈনিকদের জটলা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু পূর্বদিকে সব কিছু অন্ধকারে বনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে। মালুম হচ্ছে শুধু আগুনের শিখাগুলো।

আমাদের উত্তরে মাঠটা ঢালু হয়ে গেছে দূরে পাহাড় অবধি। ওদিকে জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে। মনে হচ্ছে কতগুলি জোনাকি বসেছে মাঠের বুকে, এখুনি আবার হয়ত উড়ে যাবে। পশ্চিম আকাশের রাঙা আভা মিলিয়ে যায়। বাতাস বইতে শুরু করে সোঁ সোঁ করে।

ওঃ কি বেজায় ঠাণ্ডা রাত। ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার বলে।

শালা মেয়ে নিয়ে শোবার মত রাত বটে!

একটু মোটা সোটা মেয়ে হলে আরো ভাল।

মুখে এক টুকরো আলু দিয়ে খিলখিল করে হাসছে জেনি। তারপর সে চার্লির বাহুবন্ধনে এলিয়ে পড়ে। ব্যাপারটা আমরা সবাই লক্ষ্য করি ; কিন্তু কেউ তেমন আগ্রহ প্রকাশ করে না। কেউ কথা তেমন বেশী বলছে না, যা বলছে তাও চাপা গলায়। তবু মেয়েটির শ্বাস-প্রশ্বাস আর দীর্ঘশ্বাসের শব্দ কানে আসছে। বহুদূরে নিউ জার্সি'র সৈনিকেরা যেখানে শিবির ফেলেছে সেদিক থেকে একটা হৈ হল্লার আওয়াজ ভেসে আসে।

এলি জ্যাকসন তার পায়ের পট্টি নিয়ে সবসময় ব্যস্ত। মাঝে মাঝে আমার মনে হয় তার পা একদম অসাড় হয়ে যায়নি—এখনও সামান্য অনুভূতি রয়েছে হয়ত। তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু এলি যে মারা যাবে, এ আমি ভাবতেই পারিনা। মনে পড়ে বছর দশেক আগেকার কথা। হুরনরা[১] সেবার হানা দিয়েছিল মোহকে। এসেই তারা খুনখারাবি লুটপাট ঘরজ্বালানি শুরু করে। এলি আমাদের বাড়ি আসে! তাকে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আমরা তখন সব কটি পরিবারকে একসঙ্গে জড়ো করি। সবাই আশ্রয় নিই পেট্রুন কেল্লায়। যদিও খুবই বাজে আশ্রয়। এদিকে এলি আর জন ছয়েক লোক পুরো দুটোদিন ইণ্ডিয়ানদের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যায়। বেশ জোয়ান সাহসী লোক এলি।

নতুন সৈন্যদলের সঙ্গে জুতোও নাকি আসছে শুনলাম। সাগ্রহে বলে এলি।

দূর ওসব কংগ্রেসের পেটমোটা শূয়োরগুলোর ধাপ্পাবাজী।

কংগ্রেসকে যত ঘৃণা করি—এত ঘৃণা আমি এখন ব্রিটিশদেরও করি না। ক্লার্ক বলে।

আমি দুটোকেই সমান ঘৃণা করি। জেকব বলে ওঠে ,—যে ধাপ্পাবাজের দল নিজেদের

১। রেড্ ইণ্ডিয়ানদের একটি উপজাতি।

কংগ্রেস বলে জাহির করছে তাদের সবাইকে···। সহসা থেমে যায় জেকব। একবার আগুনের দিকে চেয়ে আবার বলতে শুরু করে জেকব, বহুত সময় পড়ে আছে, জান ক্লার্ক! কংগ্রেসের জন্য বহুত সময় পড়ে পাওয়া যাবে। আগে ব্রিটিশদের খতম করে নিই! আগে শালা ব্রিটিশ! ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আমাদের বাহিনীর প্রতীক ওই আগুনের ফুলকিগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নেয় জেকব।

ব্রিটিশদের তাড়াবার পরে, বুঝলে? আবার বলে সে।

শুনলাম আমরা নাকি এবার বাড়ি ফিরে যাচ্ছি? অনুযোগের সুরে বিড়বিড় করে বলে মস।

কিন্তু ফিরে যাবার জায়গা কই। ইণ্ডিয়ানরা মোহক পুড়িয়ে দিয়েছে! জ্ঞাতিদের মধ্যে কেউ যদি বেঁচে থাকে তো তারা যে কোথায় আছে ঈশ্বর জানেন।

আমি কিন্তু আর মোহকে ফিরে যাচ্ছিনে। মাথা নেড়ে বলে জেকব,—নিউইয়র্ক উপত্যকায় নির্বিঘ্নে বাস কারবার জো নেই। কানাডা থেকে একশো বছর ধরে লড়াই চালাবে ওরা।

তা তুমি তো আর একশো বছর ধরে বন্দুক কাঁধে করে বেড়াতে পারবে না। হেসে ওঠে কেনটন।

পেনসিলভানিয়ায় একটা অপূর্ব জায়গার কথা শুনেছি। তার নাম নাকি কেনটাকি। বুন নামে এক ভার্জিনিয়ান জায়গাটা খুঁজে বার করেছে···

বোকা বোকা! সব শালা বেহদ্দ বোকা! খেঁকিয়ে উঠল জেকব,—আমাদের বিরুদ্ধে রেডইণ্ডিয়ানদের লাগানোই তো ব্রিটিশদের চাল। জোসেফ ব্রায়ানট ছাড়া রেডইণ্ডিয়ানদের ছয় জাতির শক্তি কি? আর ব্রায়ানট এখন ব্রিটিশদের হাতের পুতুল! ইংলণ্ডে নিয়ে ওরাই তো তাকে আজকের ব্রায়ানট্ বানিয়েছে! শোন, ব্রিটিশদের রাজনীতির খেলা বলে দিচ্ছি। ভেদনীতির চাল চালছে ওরা—একটা শক্তিকে আর একটার বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আমরা স্বাধীন মানুষ, রাজার হাতের পুতুল নই। রাজার দলের সব শালাকে যেদিন আবার গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারব, সেইদিন এই পশ্চিমে শান্তি আসবে।

মেয়েটিকে নিয়ে যেখানে আছে সেইখান থেকেই ভাঙ্গাগলায় খেঁকিয়ে ওঠে কেনটন, থাম এখন জেকব! চুলোয় যাক ব্রিটিশেরা।

পাশ ফেরে জেনি। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে। চার্লি গ্রীন উঠে বসে, মাথা ঝাঁকায় ক্লান্ত ভাবে। কিগো, তোমার কাজ সারা হয়েছে? কেনটন জিজ্ঞাসা করে।

জেকবের ভাব বদলে যায়। উঠে মেয়েটির কাছে যায় সে। তার পিঠে কয়েকটা থাপ্পড় মেরে ওর গাল টিপে ধরে। বলে, সাচ্চা লোকের দিকে তাকাওনা কেন সোনামনি!

মেয়েটাকে ওরা মেরে ফেলবে। মস ফুলার অনুযোগ জানায়। নিজের বখ্রা চায় সে। ক্লান্ত মেয়েটির কাছ থেকে সামান্যটুকু যে আরাম পাওয়া যাবে তারই জন্য আকুপাকু করছে মস। থর থর করে কাঁপছে—অধীর হয়ে পড়েছে আসন্ন মৃত্যুর শঙ্কায়।

মেয়েটির পাশে শুয়ে পড়ে জেকব। আমরা গুটিসুটি মেরে আগুনের কাছে এগিয়ে যাই। নিউ জার্সির সৈন্য শিবিরে আবার বিরাট সোরগোল শোনা যায়—গুলীর আওয়াজ কানে আসে। আমরা আগুনের কাছে বসে থাকি, কেউ নড়াচড়া করি না। আগুনের উষ্ণতায়

ধীরে ধীরে ক্লান্তির অবসাদ আচ্ছন্ন করে ফেলে আমাদের।
আবার আক্রমণ শুরু হল নাকি ? এলি জিজ্ঞাসা করে।
কিন্তু আর গুলীর আওয়াজ শোনা যায় না। আক্রান্ত হলেও তেমন কিছু এসে যায় না। দুটি অফিসার জোর কদমে ঘোড়া ছুটিয়ে যায় ; আগুনের শিখায় ঝিকিয়ে ওঠে তাদের খোলা তরোয়াল। আরও কত দুর্ভোগ যে কপালে আছে !
সব চুপচাপ। জেকবের নাক ডাকার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। তাদের দিকে বারেকের জন্য তাকাই। জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে মেয়েটির সাথে। মস ফুলার হাতের মধ্যে মাথা গ‌ুঁজে বসে আছে। আস্তে আস্তে কাশছে সে। গুন গুন করে একটি ফরাসী পল্লী-গীতির সুর ভাঁজছে এলি।
লড়াইএর প্রথম দিকের কথা মনে করবার চেষ্টা করি—সেদিন শৃঙ্খলা ছিল, ছিল সহৃদয় ব্যবহার। যে উদ্দীপনা প্রেরণা নিয়ে প্রথমে আমরা লড়াইয়ের ময়দানে ছুটে এসেছিলাম, মনে করতে চাই সেদিনের কথা।
আমার নাম আলেন হেল। মাত্র একুশ বছর বয়স আমার। আমেরিকা মহাদেশের মুক্তি ফৌজের সৈনিক আমি। মাতৃভূমির স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য অনেক দূর থেকে এসেছি।
রাত্রি গভীর হয়। আগুন নিভু নিভু হয়ে আসে। আবার ফলের গাছ থেকে কাঠ কাটতে যায় কেনটন। ফিরে এসে আগুনে কাঠ গু‌ঁজে দেয়। গজ গজ করে বলে, ফলের গাছ কাটতে হবে, এ কল্পনাও করিনি কোনদিন। প্রায় দশ বছর ধরে শেরি ও প্লাম গাছের বীজ সযত্নে জমিয়ে রেখেছি। ভেবেছিলাম পশ্চিমে গিয়ে হ্রদ অঞ্চলে বিরাট ফলের বাগিচা করবো। যাই হোক, যুদ্ধের দৌলতে এখন পশ্চিমেই চলেছি—বীজগুলো রক্ষা করতে হবে দেখছি।
আগুন জ্বলছে। চারদিক চুপচাপ। মনে হয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে এখন মস শুয়ে আছে মেয়েটিকে নিয়ে। সেও ঘুমোচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাস দেখে মনে হচ্ছে সে গভীর ঘুমে অচৈতন্য। আমাদের মধ্যে আর কেউ মেয়েটির কাছে যেতে চাই না—মসের ঘুমও ভাঙাতে চাই না।
মাসাচুসেটসের জনকয়েক লোক এসে আগুনের পাশে দাঁড়ায়। তাদের অধিকাংশ ব্রিগেডই আগুন জ্বালতে পারেনি। আগুনের চার পাশে ভীড় করে দাঁড়ায় তারা। আমরাও ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা থেকে বাঁচি ! এদের মধ্যে একজন অফিসার। শতছিন্ন তাঁতে-বোনা বাদামি লড়াইর পোশাকপরা সবে দাড়িগজান নাবালক সে। কোমরে মরচে ধরা তরোয়াল।
চাপা গলায় কথা বলে তারা। পাশে লোক ঘুমোচ্ছে যে !
একজন বলে, শুনে এলাম বৃত্তের মত গোল হয়ে এখন নাকি পিছু হটা হবে। তারপর পাহাড় ডিঙিয়ে দক্ষিণ দিক থেকে ফিলাডেলফিয়া আক্রমণ করা হবে। শুনেছ পেনসিলভানিয়ায় নাকি অপরূপ এক সব পেয়েছির দেশ আছে। বুন নামে একটা লোক জায়গাটা মাপঝোঁক করেছে। সেখানেই বসবাস করতে পারি আমরা। চাষ আবাদ করে নিজেদের জমিজমা ঘরবাড়ি করতে পারি।
ঘরের মাগ আর ছেলেপুলেদের কি হবে ?
ঘর আর মাগের টান থাকলে তার ফৌজে আসা উচিত নয়।

ফৌজ বলে এখনও কিছু আছে নাকি ? বিড়বিড় করে কেনটন।
ঘরের টানওলা পাঁচ হাজার লোকও যদি এখান থেকে অস্ত্রত্যাগ করে পালায় তাহলে ফাঁসির দড়ি তাদের গলায়ও পড়বে নাকি ?
দূর, যুদ্ধ শান্তির পর আর ফাঁসিটাসি হবে না।
ঐ জর্জ ওয়াশিংটন বেঁচে থাকতে শান্তি আসবার কোন আশা নেই। ওয়েন আর তার পেনসিলভানিয়ার লোকজনের মাথায় কি ভূতই যে চেপেছে !
হার্লেমে আমরা বুঝেছিলাম কিন্তু শালা ওয়েনের লোকজন ভেগে গেল। আস্তে আস্তে বলে চলে ভ্যানডিয়ার।
দুবছর ধরে জমিতে চাষ-আবাদ হচ্ছে না। ফৌজ থেকে ভেগে যাবার পর ওরা সব জমি-জমা নিয়ে নেবে। কেনটাকি মুলুকে যদি মেয়ে থাকে তো...
কাল কোনদিকে যাব আমরা ? ইগেন জিজ্ঞাসা করে।
মাসাচুসেট্সের অফিসারটি বলে, উত্তর-পূর্বে, ফোর্জ উপত্যকা নামে একটা জায়গায় যেতে হবে।
ওইখানেই ছাউনি ফেলা হবে ?
কিছুক্ষণ পরে মাসাচুসেট্সের লোকজন চলে যায়। আগুন ধীরে ধীরে নিভে আসে। সারা মাঠ জুড়ে নিভু নিভু আগুনের মিটিমিটি আলো।
আমি ঘুমোবার চেষ্টা করি এবার। এলি জ্যাকসন উঠে তার বন্দুক তুলে নেয়।
আরে কি করছ এলি ?
এবার আমি খানিকক্ষণ পাহারা দিই। সে বলে !
গ্রীন হো হো হেসে ওঠে। নিরর্থক ! কি হবে পাহারা দিয়ে ? যে কোন সামান্য আঘাতে ভেঙে পড়ব আমরা। আমরা কি আর ফৌজী আছি।
কোন একদিন ছিলাম বটে ; আজ না হয় নয় !
পেঁজা তুলোর মতো তুষার পড়তে থাকে। মাঝে মাঝে বড় বড় শুকনো সাদা বরফের ফালি ঝরে পড়ে। খালি হাতে বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে এলি। ঝুর ঝুর করে তুষার ঝরে পড়ে তার গায়ে মাথায়। কিছুক্ষণ পরে সে নিস্পন্দ তুষারস্তূপে পরিণত হয়।

আঃ! ভোরবেলায় ঝলমলে রোদে ঘুম ভাঙে ! এক ঘুমে রাত কাবার। এখন চাই একটু আগুন একটু উষ্ণতা। আগুন জ্বালান হয়েছিল সেই দিকে শরীরটা এগিয়ে দিই। কিন্তু আগুন নিভে গেছে। বুঝতে পারি, বারবার ঠাণ্ডায় রাতের বেলা ঘুম ভেঙেছে আমার। কোথায় যেন বিউগল বাজছে একটা। উঠে বসি। ঝুর ঝুর করে বরফ গড়িয়ে পড়ে পোষাক থেকে। দুই তিন ইঞ্চি বরফ জমেছে মাটির উপর। গ্রীন, লেন, ব্রেম্নার ও ইগেন— প্রত্যেকে হয়ে উঠেছে এক একটি বরফের ঢিবি।
আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাঁড়াই। ঠক ঠক করে কাঁপছি। সারা শরীর অসাড় হয়ে গেছে। চারিদিকে ঘুরে তাকাই। লোকজন যেন মরে আছে। সব কটি ব্রিগেড বরফে ঢাকা। এলি জ্যাকসন নড়ে ওঠে। এবার শীতে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ায় জেকব। হাত পায়ের ব্যায়াম

শুরু করি আমরা—শূন্যে ঘুষো মারতে থাকি, শরীরের দুই পাশে থাপ্পড় মারি, নাচানাচি লাফালাফি শুরু করি।
জানো ঐ দৃশ্য দেখে একটা অদ্ভুত কথা মনে হয়েছিল আমার। সবাই যেন মরে পড়ে আছে, উপরে বরফের আস্তরণ, আমি বলি।
এলি হাসে। বরফে সাদা হয়ে গেছে তার গোঁফ দাড়ি।
অদ্ভুত লোক তো তুমি! এই কথা তোমার মনে এল! জেকব বলে ওঠে।
আমাদের দলের আর সকলেও উঠে পড়ে। ঘেঁষাঘেষি করে শুয়েছিলাম আমরা—পরস্পরের দেহের উত্তাপ পেতে চেয়েছি। মস ফুলার কিন্তু এখনও ঘুমোচ্ছে। মোটা স্ত্রীলোকটি জড়িয়ে রয়েছে তাকে।
ঘুমোনোর জন্য মেয়েছেলে বেশ চমৎকার ব্যাপার। মাথা নেড়ে এডওয়ার্ড বলে।
তুষার জড়ানো দেহ আমাদের। আবার আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করি, সুবিধে হয় না। আগুনের আশা ছেড়ে দিয়ে শুকনো ভুট্টা চিবোতে শুরু করি; নুন মাখা মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে গিলবার মত নরম করে ফেলি। সারাক্ষণ গরম হবার চেষ্টা করছি আমরা। ঘুম ভাঙছে সৈনিকদের। মাঠের সর্বত্র ভাঙা-গলার আওয়াজ শোনা যায়। জোর কদমে ছুটাছুটি করছে সেনানীরা, শরীর গরম করবার জন্য সর্বত্র লাফালাফি নাচানাচি করছে। দু চারটে জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে রাখা হয়েছিল সারারাত। সেগুলো ভাল করে জ্বালাবার চেষ্টা হচ্ছে এখন।
তাঁবুর মধ্যে যেতে না পারলে মরে যাব সবাই। ভ্যানডিয়ার বলে।
আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। ঘষাঘষি করে হাত পা গরম করবার চেষ্টা করি। দু একটা রাত হয়ত এভাবে কাটান যায়, তার বেশী নয়! একটু গরম হবার জন্য আজ প্রাণ যেমন অধীর হয়েছে, মনে হয় এমন আগ্রহ নিয়ে কোনদিন কিছু চাইনি।
পেনসিলভানিয়াদের ওখানে একটা আগুন দেখিয়ে এলি বলে, দেখি একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে আসা যায় কিনা!
হঠাৎ বিউগল বেজে ওঠে—হাতিয়ার তুলে নাও! এখুনি শুরু হবে মার্চ।
জাহান্নামে যাক!
এখন জাহান্নামেও বোধ হয় খুব ঠাণ্ডা, যেয়ে সুবিধা হবে না। হেসে বলে কেনটন!
ঠাণ্ডা লেগে ঠোঁট নীলচে ও লাল হয়েছে তার মুখ—নাকের ডগার মরা মাংস ফেটে যাচ্ছে। এত কষ্ট যে কি করে সহ্য করে মানুষ? কি করে এসব সহ্য করছি আমি? সত্যি অবাক হয়ে যাই। এখনও সমানে লাফালাফি করছি। যে করেই হোক একটু গরম হতে হবে। গরম হবার নেশা, যতটা সম্ভব চাঙা হবার নেশা পেয়ে বসে আমাকে।
আরে মসকে জাগাও।
জুতোর ডগা দিয়ে মেয়েটিকে খোঁচা মারে জেকব। বলে, ঢের হয়েছে সোনা, এখন খসে পড় দেখি।
মুচকি হাসে চার্লি গ্রীন। গরম হবার জন্য বগলে হাত দিয়ে পা ফাঁক করে ফোলা ফোলা মুখে দাঁড়িয়ে আছে সে। পেনসিলভানিয়ানদের দলের দিকে পা টেনে টেনে এগিয়ে যায় এলি। দেখে মনে হচ্ছে, প্রতি পদক্ষেপে তার পায়ের তলায় যেন ব্যথা লাগছে। আগুনের

কাছে যাবার জন্য বদ্ধপরিকর এলি। যে করেই হোক আগুন সে আনবেই। আস্তে আস্তে মিঠে কথায় ওদের মন ভেজাবে। কথা বলার একটা বিশেষ ধরণ আছে ওর।
আমরা মস ও জোনকে ঘিরে দাঁড়াই। গা ঝাড়া দিয়ে হাত ছাড়িয়ে দেয় মেয়েটি। প্রচণ্ড শীত গা কামড়ে ধরে তার ; হাত বাড়িয়ে মসের শরীর হাতড়ায় সে। তারপর হঠাৎ চীৎকার করে উঠে বসে। কাঁদ কাঁদ সুরে বলে—পুরো জমে গেছে, মরে গেছে ও।
হেসে ওঠে ভ্যানডিয়ার। মেয়েটির নাকের ডগা লাল টকটক করছে—চুলগুলো সারা মুখে লেপটে রয়েছে। মোটা কুৎসিত অশ্লীল দেখাচ্ছে তাকে। নোংরা ও কুৎসিত অবশ্য আমাদের সকলকেই দেখাচ্চে। তবু এখন মেয়েটিকে দেখে আমার ঘেন্না করতে লাগল। কারণ, সে পুরোনো দিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে, মনে জাগাচ্ছে পুরনো দিনের স্মৃতি। কোনো এককালে এমনতর একটা কুৎসিত নচ্ছার মেয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছিল আমার।
তাকে টেনে তুলে দাঁড় করাই। নোংরা কম্বল ধরে ঝাঁকাতে থাকি। আর সবাই একমনে লক্ষ্য করছে কি করছি আমি। বোকার মত হাসছে হেনরি লেন। কিন্তু আর সবাই চুপচাপ। শুধু দেখছে।
এই মরে যাব আমি ! চেঁচিয়ে ওঠে মেয়েটি।
এবার ছেড়ে দিই ওকে। ফিসফিস করে বলি,—ভাগ এখান থেকে !
ঘুরে ঘুরে সে কম্বলখানা ঠিকঠাক করে গায়ে জড়িয়ে নেয় ; ঠিক করে নেয় এলোমেলো হলদে চুলের গোছা। বলে. যা ভাবছ আমি তেমন নোংরা মেয়ে নই। ভদ্দর ঘরের ভাল মেয়ে, বুঝলে ?
হেসে ওঠে ভ্যানডিয়ার। ছোটখাট বেঁটে চেহারা তার। যুদ্ধের আগে যাজক ছিল। হোয়াইট প্লেইনসে তার পরের দুটি ভাই মারা গেছে। ইদানীং সে এমনি হয়ে পড়েছে। আমি বুঝতে পারি ওকে। চল্লিস পেরিয়ে গেছে তার বয়স কিন্তু সম্প্রতি তার মধ্যে ছেলেমানুষী ভাব দেখা যাচ্ছে।
ভালয় ভালয় চলে যা বলছি ! জেকব বলে ওঠে মেয়েটিকে।
টলতে টলতে চলে যায় মেয়েটি। বারবার পেছন ফিরে চীৎকার করে জানায় ভদ্রঘরের ভাল মেয়ে সে। মসের পাশে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে জেকব—আস্তে আস্তে নাড়া দেয় তাকে। একরোখা বদমেজাজি লোক জেকব ; তবু মসের কাছে বসে সে মেয়েদের মত কোমল হয়ে পড়ে। আস্তে করে সে মসের মুখ থেকে চুল সরিয়ে দেয়। দেখি, তার পাতলা দাড়ি চাপ চাপ রক্ত জমে কাল হয়ে আছে। জেকব উঠে দাঁড়ায়। বলে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। একথা না বল্লেও চলতো, ব্যাপারটা তখন সবাই বুঝতে পেরেছে।
মসের খোলা চোখে শূন্যদৃষ্টি। ভ্যানডিয়ারের মুখে হাসি নেই। নীচু হয়ে আমি তার পাতলা কোট খুলে ফেলি ; ঝুর ঝুর করে তুষার কণা গড়িয়ে গড়ে ! জোর করে তার চোখের পাতার উপর হাত দিয়ে চোখ দুটো বুজিয়ে দিই।
বেশ শক্ত পোক্ত লোক না হলে কালকের রাতের মত এত বেশী ঠাণ্ডা রাত সহ্য করতে পারে না। আস্তে আস্তে বলে ব্রেন্নার।
সত্যিই ও মারা গেছে ? আমাকে জিজ্ঞাসা করে জেকব ; তারপর ব্যস্ত হয়ে বলে, আচ্ছা এই সময় এলি গেল কোথায় ? এই কি তার দূরে থাকবার সময় ?

আগুন আনতে গেছে এলি, বিমর্ষভাবে বলে এডওয়ার্ড।

সে এখন কেন গেল ? আগুন দিয়ে কি হবে এখন ? ভোর বেলায় আগুনের দরকার ছিল ; কিন্তু এখন আর কি হবে আগুন দিয়ে ? এখন আগুন জ্বালালে আর তো মস ফিরে আসবে না !

পেনসিলভানিয়ানদের জাঁপিয়ে, আগুন আনতে গেছে সে ! ওর কিছু চাইবার একটা বিশিষ্ট ধরণ আছে।

নাও খুব হয়েছে, থাম।

চকমকি দিয়ে এখন আগুন জ্বালান যেত না। তাই জ্বলন্ত কাঠ আনতে গেছে এলি। ঠাণ্ডা অসাড় হাতে চকমকি ধরে রাখা যাবে কেন এখন ?

এলি এখন এসে পড়লেও কিছুই করতে পারবে না জেকব ?

মসের পাশে আবার হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে জেকব। আমি ফল গাছটার কাছে সরে যেয়ে গাছটায় ঠেস দিয়ে বসি। শীতে সর্বাঙ্গ অসাড় হয়ে আসে। কিন্তু মস ফুলার এখন যে হীম শীতল স্পর্শ অনুভব করছে তার তুলনায় আমার এই হাড় কাঁপানো ঠাণ্ডা কিছুই নয়—অত গভীর নীরব ঠাণ্ডার কাছাকাছিও যেতে পারবে না।

ঠিক বলছ, ও মারা গেছে ?

হাঁ। জেকব বলে।

একটানা বিউগল বেজে চলেছে। গোটা ফৌজের সর্বত্র সৈনিকেরা তোড়জোড় করেছে রওনা হবার জন্য। আমাদের পূর্বদিকে বেশ খানিকটা জায়গা জুড়ে একটা বন। সূর্য উঁকি মারছে গাছের ফাঁকে। বনের পাশ দিয়ে হালকা সার করে সৈনিকরা হেঁটে চলেছে। তাদের গায়ে ভার্জিনিয়ার রাইফেলধারীদের মত সেমিজের মত ঢলঢলে বাদামি রঙের জামা। অফিসাররা ঘোড়ায় চলেছে লাফিয়ে। হুকুম দিচ্ছে হেঁকে। দূরে ছাই-রঙা পাথরের ঢিপির পেছন থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাকলেনের অশ্বারোহী দল—কুচকাওয়াজ করে মাঠ পেরিয়ে যায়। সার বাঁধবার সময়ও মাসাচুসেট্সের লোকজন হাসাহাসি করে চলেছে সঙ্গীদের সঙ্গে।

ও মারা গেছে ! আবার বলে ওঠে জেকব ; ক্লোক দিয়ে সে মসের মুখ ঢেকে দেয়। আমাকে বলে, একটু সাহায্য কর না আলেন।

উঠে দাঁড়াই। মুখে ভাঙা ডালপালার ঘষা লাগে। একখানা জ্বলন্ত কাঠ নিয়ে এলি আসছে। অদ্ভুত যোগাড়ে ক্ষমতা এলির। কি করে যে লোককে জপায় ?

এখুনি চমৎকার আগুন জ্বালব, এলি চীৎকার করে।

এগিয়ে এসে সে আমাদের সবাইর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখে। বেশ অবাক হয়ে যায় আমাদের ঐ ভাবে দাঁড়ান দেখে। গত রাত্রের আগুনের কুণ্ডর উপর থেকে পা দিয়ে বরফ সরিয়ে বলে, কুড়োল দিয়ে ঐ গাছটা থেকে আরো খান কয়েক ডাল কেটে আনো তো আলেন। সামান্য খানকয়েক হলেই হয়ে যাবে।

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। আবার সে বলে, মস এখনও ঘুমোচ্ছে ? ডেকে তোল শিগ্‌গির, না হলে পড়ে এক পাও হাঁটতে পারবে না !

মস কিন্তু ঘুমোচ্ছে না। আমি বলি।

ও মারা গেছে। জেকব বলে,—ছেলেটি কাল রাতেই মারা গেছে এলি!
কালকের রাতের ঐ প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও সইতে পারবে কেন? কেনটন বিড়বিড় করে বলে।
নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এলি। মাঝে মাঝে মাথা ঝাঁকায়। জ্বলন্ত কাঠখানা পড়ে যায় তার হাত থেকে। বরফের মধ্যে পড়ে কাঠখানা দপ্‌দপ্‌ করে নিভে যায়। আগুনটুকু বাঁচাবার জন্য কেউ এগোয় না। মসের কাছে গিয়ে তার মুখের ঢাকা খোলে এলি। হাঁটু ভেঙ্গে বসে পড়ে সেখানে। এলির রক্ত মাখা পট্টি বাঁধা পায়ে বরফ জড়িয়ে আছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায়। মসের পায়ে জুতো জোড়া বেশ ভাল অবস্থায় আছে। কিছুটা ক্ষয় হয়েছে, মাসখানেক আগে মৃত এক হেসিয়ানের[১] পা থেকে খুলে জুতো জোড়া মসকে দেয় জেকব। কিন্তু এ নিয়ে এখন কথা তুলবে কে, ভেবে পেলাম না। মস মারা গেছে, এখন শুধু তার জুতো জোড়াই কাজে লাগতে পারে—এ কথাটা আমি মন থেকে মেনে নিতে পারলাম না।
এলির পায়ের দিকে চেয়ে মনে মনে ভাবি, জুতো জোড়া এলিকে দেওয়া যেতে পারে। নিজের পায়ের দিকেও তাকাই, আর ভাবি, এলি তার বয়সকাল পেরিয়ে এসেছে, এখন হয়ত যে কোনদিন সে মারা যাবে! কিন্তু কথাটা সত্যি নয়। পা দুটো পচে খসে গেলেও এলি তার জীবনীশক্তির জোরে বাঁচবে। মনে মনে তাকে গালি দিই, কিন্তু আবার তার শক্তির কথা ভেবে গালাগাল দেবার জন্য নিজের পর প্রচণ্ড ঘেন্না হয়।
উঠে দাঁড়ায় এলি, কিন্তু নিশ্চুপ। আমার দিকে ফিরে তাকায় সে।
আহা চমৎকার ছেলে ছিল। যেমন লম্বা তেমন চেহারা তেমনি স্বভাব। এডওয়ার্ড ফ্লাগ বলে,—এমন চট করে যে ও মারা যাবে তা ভাবতেই পারিনি।
ওর বেজায় কাশ হয়েছিল।
বাড়ির কথা ভেবে ভেবেই মরল। সেই উপত্যকা তো এখান থেকে অনেক দূর, তাই না?
আমরা মাথা নেড়ে সায় দিই। হাত জোড় করে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার এসে মসের উপর ঝুঁকে দাঁড়ায়। ওর ভাবগতি লক্ষ্য করি।
এবার ওর কবরের ব্যবস্থা কর সবাই, আমি প্রার্থনা করবো। ভ্যানডিয়ার বলে। ওর মুখ দেখে মনে হয়, যাজক থাকাকালীন প্রার্থনা ওর এখনও মুখস্ত আছে।
এখানকার মাটি বেজায় শক্ত। লেন বিড়বিড় করে বলে।
এলি বলে, মাসাচুসেট্‌সদের দলে গিয়ে একটা বিউগল বাজিয়ে সবাইকে ডেকে আন চার্লি।
বেয়নেট দিয়ে মাটি খুঁড়তে শুরু করে সবাই। আমি কুড়োল দিয়েই কোপাতে শুরু করি। মাটি জমে পাথরের মত শক্ত হয়ে গেছে, খুঁড়তে খুঁড়তে হঠাৎ থেমে যায় জেকব, মসের পায়ের দিকে তাকায়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ওর মনের কথা বুঝতে পারি।
মাত্র এক ফুট গর্ত খুঁড়তেই আমরা হাঁপিয়ে যাই। গ্রীন গেছে মাসাচুসেট্‌সের লোক ডাকতে। আমরা ওর পথ চেয়ে থাকি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই চুপ করে ভাবছে। কে জানে, হয়ত সবাই এক কথাই ভাবছে।
অবশেষে জেকব বলে, ছেলেটার পায়ে এক জোড়া চমৎকার জুতো রয়েছে।

১। জার্মানি হেস প্রদেশের লোক। এখন ইংরেজ পক্ষে ভাড়াটিয়া সৈন্য হিসাবে লড়াই করছে;

জামা জুতো খুলে উলঙ্গ করে তো আর কবর দেওয়া যায় না। এলি বলে। দুটি বছর এক সঙ্গে কাটিয়েছি ; কিছুতেই ওকে ওইভাবে কবর দিতে পারব না।
আমি শুধু ওর বুট জোড়ার কথাই ভাবছিলাম।
না, ওর জুতো ওর পায়েই থাকবে।
কিন্তু তোমার এক জোড়া ভাল জুতোর একান্ত দরকার এলি !
না, বল্লাম তো, ওর জুতো ওর পায়েই থাকবে। খ্রীষ্টের দিব্যি জেকব, জুতো খুলবার চেষ্টা যদি কর তো খুন করে ফেলব।
আরে এর মধ্যে রাগারাগির কি আছে এলি ? জেকব বলতে থাকে,—মস্ মরে গেছে··· ঠাণ্ডা উষ্ণ কিছুই সে আর অনুভব করতে পারবেনা। জুতোর ওর এখন কি দরকার বল ? কিন্তু তোমার এই সময় এক জোড়া না হলেই নয়।
এলি কোন জবাব দেয় না ; মাথা নিচু করে চেয়ে থাকে মসের দিকে। জেকব এগিয়ে গিয়ে খুলে আনে বুট জোড়া ; বারে বারে সে ফিরে তাকায় এলির দিকে। কিন্তু সে চুপচাপ।
আমায় ক্ষমা করো এলি !
ইতিমধ্যে মাসাচুসেট্‌সের বিগ্রেড থেকে একজন বিউগল বাজিয়ে নিয়ে ফিরেছে চার্লি। কৌতূহলবশে একদল বোস্টনের ছোকরা এসেছে তার সঙ্গে। আমরা সবাই ধরাধরি করে মসের দেহ কবরে শুইয়ে দেবার সময় তারা চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। মাসাচুসেট্‌সের এক রঙরুট বলে, আসছে বসন্তে এ জমি নিশ্চয়ই চাষ হবে। গর্তটা তেমন গভীর হলো না !
আমরা ধীরে ধীরে মাটি চাপা দিই। ভ্যানডিয়ার সামান্য গুটিকয়েক কথায় তার প্রার্থনা শেষ করে। আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায় ভ্যানডিয়ারের গলা।
বাড়ি অনেক দূর ! এলি বলে।
ভোরের বাতাসে কেঁপে কেঁপে ওঠে বিউগলের আওয়াজ। মসের জায়গায় যদি আমি হতাম আমিও তো এ-ই আশা করতাম। ড্রাম, একজন ড্রাম বাজিয়ে উপস্থিত আছে না ? সেও বার কয়েক বাজায়। চমৎকার ব্যবস্থা। সৈনিকদল তখন চলতে শুরু করেছে। তাদের অনেকেই থেমে দেখে কি করছি আমরা। কিন্তু এই নিত্যদিনের দৃশ্য দেখার জন্য কেউ বেশীক্ষণ দাঁড়ায় না এগিয়ে চলে সবাই। গোটা পল্টন চলেছে এগিয়ে।
মসের বেয়নেট খানা নিয়ে জেকব তার কবরের মাথায় পুঁতে রাখে, মরছে পড়া বাঁকা বেয়নেট। কোন কাজেই লাগবে না। বন্দুকটা আমরা মাসাচুসেট্‌সের লোককে দিয়ে দিই। তাদের অনেকেরই সাথে কোন হাতিয়ার নেই।
মাসাচুসেট্‌সের ব্রিগেডগুলো চলতে শুরে করে। ক্রমশঃ দূরে সরে যায়। আমরা কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকি। ওয়াশিংটন এবং তার পার্শ্বচরগণ বেরিয়ে আসে পাথুরে বাড়ির ভেতর থেকে। ঘোড়ায় চড়ে তারা জোড় কদমে ছুটে যায় পল্টনের সামনে।
এবার রাস্তা ধরি আমরা।
আজকে লম্বা মার্চ করতে হবে। লেন বলে।
ফোর্জ উপত্যকা নামের কোন জায়গার কথা মনে পড়ছে না তো !

লোহার কারখানা হবে হয়ত। জায়গাটা লোহার খনি অঞ্চলের মত।
জায়গাটা শুয়েলকিলের উপর।
দক্ষিণে মার্চ করবার মতলব থাকে তো উত্তরে যাচ্ছি কেন ?
শুনলাম, ব্রিটিশদের প্যাঁচাবার এক নতুন কায়দা বার করা হয়েছে।
একে যদি লড়াকু পল্টন মনে করে কেউ তবে আস্ত বোকা সে।
হঠাৎ ক্লার্ক বলে ওঠে, মস কোথায় ? ওঃ ভুলে গেছি।
রাস্তা দিয়ে চলেছি আমরা। রোদে আয়নার মত ঝকমক করছে বরফ। একটু বাদেই চোখ ধাঁধিয়ে দিতে পারে।
আস্তে আস্তে এগিয়ে চলেছে গোটা পল্টন। তবু এগোচ্ছে তো। কিন্তু কিসের জন্য চলেছি তা বুঝে উঠতে পারি না। ছয় মাইল ছড়ান এই একসুরে-বাঁধা প্রাণের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি বলে মনে হয়।
পেনসিলভানিয়ার লোকজনের পেছু পেছু চলেছি আমরা। আমাদের পেছনে মাসাচুসেটসের ব্রিগেডগুলো। বারোখানা কাঠের ওয়াগন আমাদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যায়। ভেতরে মেয়েছেলের গলা শুনতে পাই। পুরুষের সমান সমান বেশ্যারা এসে জুটেছে পল্টনে। ক্যানভাসের পর্দা ফাঁক করে একটি মেয়েছেলে মাথা বার করে—জিভ দেখায় মুখ ভঙ্গি করে।
এসো না খুকি, আমাদের সঙ্গেই না হয় হেঁটে যাবে ! চার্লি গ্রীন হেসে বলে।
বেশ খুবসুরৎ খানকি তো ! এডওয়ার্ড মাথা নেড়ে বলে।
একনাগাড়ে হেঁটে চলেছি। মসের কথা আর মনে পড়ছে না আমাদের ! এখন আর ওর কথা ভেবে কোন লাভও নেই। আমরা সকলেই শীগগির। তার কাছাকাছি পৌঁছে যাব জীবন ও মৃত্যুর ব্যবধান বড় সংকীর্ণ।
গান গাইছে মাসাচুসেট্সের লোকেরা। আমরাও গলা মেলাই ওদের সাথে। মাইলের পর মাইল জুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে গানের সুর। কেঁপে কেঁপে উঠেছে গানের লাইন ঃ

টাট্টু ঘোড়ায় চেপে
ইয়াংকি সাহেব যাবেন লণ্ডনে……

বোধহয় এতক্ষণে পৌঁছান গেছে। আর এগোতে হবে না। যদিও জানি বিশ্রামের অবসর নেই। কথাটা অস্পষ্টভাবে মনে হলেও বেশ অনুভব করতে পারি—বিশ্রাম নেই। এলি জ্যাকসন বলে। এক একটা গর্বিত জোয়ান লোককে তিলে তিলে মরতে দেখা সত্যিই মর্মান্তিক। এলি বলে, দক্ষিণে মার্চ করা আর হবে না। ভারি অদ্ভুত লোক ঐ ডানিয়াল বুন। কি করে যে এতটা পথ গেল ! আমরা কিন্তু তার বুনো পথ ধরে ট্রান্সসিলভানিয়া যাচ্ছিনে। এখন সত্যিই আমাদের আর পল্টন বলা যায় না।
ভীষণ অবসন্ন লাগছে। আর মার্চ করতে পারব না আজ। আমি বলি।
কেনটন বলে, এখন এখানেই ঘাঁটি করে ব্রিটিশদের সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত। ব্রিডস পাহাড়ের কথা মনে পড়ে ! ওদের লাল পোষাকের কি চেকনাই। মনে রাখবার মত সাচ্চা

সৈনিক ওরা। মস্ তখন কেঁদে ফেলেছিল, মাত্র ষোল বছর বয়স ছিল তার।

অমন দৃশ্য ওর মত বাচ্চা সইতে পারবে কেন? এলি বলে। তোপে টুকরো হয়ে উড়ে যাচ্ছে, তবু ওরা যেভাবে পাহাড়ের পর মার্চ করে এগোচ্ছিল তা দেখে তাজ্জব হতে হয়। আমার বেশ মনে আছে, এক ছোকরা ট্রামপেট বাজাচ্ছিল ব্রিটিশ পক্ষে। ছেলেটির পেটে গুলী লাগল. পড়ে যাওয়ার আগে পর্যন্ত সে বাজাবার চেষ্টা করছিল। নেহাৎ ছোকড়া।

এ ঘটনা ব্রিডস্ পাহাড়ের। লোকে এখন ওটাকে বাঙ্কার পাহাড় বলে ডাকে।

মসের মতই বাচ্চা ছেলেটি। এলি বলে চলে,—ঐ দৃশ্য দেখে মস একেবারে মুষড়ে পড়ে। এতই কম বয়স ছিল তার!

আমরা আগুন জেলে তার চারপাশে বসি। বেশ জোরাল আগুন জ্বালান হয়েছে এবার। কিন্তু এ আগুনের তাপেও শীত যায় না। আমাদের হাড় পর্যন্ত কন্‌কন্ করছে। শীতের দাপটে আগুনের শিখাও নিস্তেজ হয়ে যায়।

ঠিক পাহাড়ের মাথায় ছাউনি ফেলেছি আমরা। একপাশে গভীর জঙ্গল, অপর দিকে মেঠো ঘাস জমি। পাহাড়ের সর্বত্র এবং নীচে উপত্যকার মধ্যেও জায়গায় জায়গায় আগুন জ্বলছে। পশ্চিমে উপত্যকাটির যেখানে শুয়েলকিল নদীতে মিশেছে সেই স্থানটির নাম ফোর্জভ্যালি। খাড়িটি যেখানে নদীতে মিশেছে, একসময় সেখানে কিছু সৈন্য ঘাঁটি করেছিল, তৈরী ঘরদোরও কিছু কিছু আছে। শোনা যায়, সৈন্যরা নাকি সেইসব ঘরে বাসা বাঁধছে।

পূর্বদিকে ঢালু মাঠটি পেরিয়ে আঠারো বিশ মাইল দূরে ফিলাডেলফিয়া শহর। আমরা বার বার তাকাই ফিলাডেলফিয়ার দিকে। কেতা দুরস্ত উর্দিপরা ব্রিটিশ বাহিনীর কথা ভাবি। নিশ্চয়ই এখন গরম ঘরে ঘুমোচ্ছে তারা—শুঁড়িখানায় জমায়েত হয়ে হুল্লোড় করছে মনের আনন্দে। ফিলাডেলফিয়া শহর মায় তার ঘর দোর নরনারী ও আরামের বিছানা সবই আজ তাদের।

মনে ভাবি যুদ্ধ এইখানে শেষ হবে, আর যেতে হবে না দূরে কোথাও।

ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার ঘাড়ঝাঁকানি দিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে। আগুনের এত কাছে গুটিসুটি মেরে সে বসে আছে যে তার দাড়ি ঝলসে যাচ্ছে। তাও সে টের পাচ্ছে বলে মনে হয় না। মসের মৃত্যুর পর রীতিমত বুড়িয়ে গেছে ক্লার্ক, সাবেক পাদরির জীবনের হালচাল দেখা দিয়েছে নতুন করে।

আমার বেশ ভয় হয়। এডওয়ার্ড বলে। এইটেই তার কথা বলার ধরণ। এক সময় বেশ বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক ছিল সে। স্বপ্নবিলাসী ছিল না আর কাউকে পরোয়াও করত না সে।

এ।ল জ্যাকসন মাথা ঝাঁকায়।

আচ্ছা, কালকে যদি আবার মার্চ করবার হুকুম আসে? উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করে এডওয়ার্ড।

সবাইর মুখে শঙ্কার ছাপ পরে। যদি আবার মার্চ করতে হয়? বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা। পেটে খাদ্য নেই এতটুকু শক্তি নেই মার্চ করবার। এখান থেকে খসে পড়বার পথ বাতলাবার চেষ্টা করি। পাহাড়ের ঢালু গা বরফে ঢাকা—চিকচিক করছে চাঁদের আলোয়। আগুনের আরও কাছঘেঁষে বসি সবাই।

আমাদের নীচে পেনসিলভানিয়ার লোকজন মস্ত একটা বৃত্তের মত আগুন জ্বালিয়েছে। প্রতিটি আগুন কুণ্ড শিখাহীন জলন্ত অঙ্গার স্তূপ। আধবোজা চোখে তাদের ছাউনিকে চন্দ্রাকার মুকুটের মতো বলে মনে হয়। ক্ষিদের চোটে আমার মনে হরেক রকম আজগুবি কল্পনা ভীড় করে। জেকব রসদখানা খুঁজে বার করে সন্ধ্যার পর। আটজনের জন্য এক টুপি ভুট্টা নিয়ে ফেরে সে। রক্ত ঝরছে তার পা থেকে।

রক্ত ঝরাতে তোমার এক মিনিটও লাগে না! মোলায়েমভাবে এলি বলে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা চুপ করে থাকে জেকব। অদ্ভুত ধরণের গম্ভীর প্রকৃতিব লোক—কঠোর কঠিন! নাবালক বয়সে সে ফরাসী যুদ্ধে লড়েছে। তখনই সে পুরোদস্তুর বিপ্লবী—দ্বিধা দ্বন্দ্বের বালাই চুকিয়ে ফেলেছে। তার মতে, ফরাসী যুদ্ধেই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়। তার পর থেকে একই চিন্তা তার মধ্যে বয়ে চলেছে। প্রথমে ফরাসীদের হাঁকাও, তারপর ব্রিটিশদের। জনতার রাজ গড়তে হবে। এই কথাই সবসময় প্রচার করে জেকব ঃ সবকিছ জনগণের জন্য। ইণ্ডিয়ানদেরও হটাতে হবে। কিন্তু তার আগে প্রথমে ফরাসীদের তার পর ইংরেজদের হটান দরকার। ওরা দুদলই ইণ্ডিয়ানদের দিয়ে খেলাচ্ছে, তাদের লাগাচ্ছে আমাদের বিরুদ্ধে। ফরাসীদের উৎখাত করবার জন্য লড়েছে সে; এখন লড়ছে ব্রিটিশদের ধ্বংস করবার জন্য। চিরকাল সে লড়াই করে চলবে। যতদিন গুলীর আঘাতে সে ধরাশায়ী না হবে ততদিন লড়াই চালাবে জেকব। এ মাটি কোনদিনই তার হবে না।

এলি বলে, আমার এখনও মনে পড়ে, বাড়ির কথা কত বলত মস। শুনলাম, ম্যারিল্যাণ্ডের চার চারটি বিগ্রেড নাকি কিরিচ উঁচিয়ে পল্টন ছেড়ে চলে গেছে।

এই তো সবে শুরু!

ম্যারিল্যাণ্ডের হ্যাটারা বেহদ্দ পাজী। শালা যত চোর জোচ্চর বদমাসেব বাচ্চা। বিড়বিড় করে বলে জেকব।

সবে তো কলির সন্ধে। আমি বলি,—ছত্রাখান হয়ে যাবে পলটন।

উঃ! আমাদের উপোসী রেখে কংগ্রেসের পেটমোটা কর্তাদের যুক্তরাষ্ট্র গড়ার কথা যখন ভাবি! ম্যারিল্যাণ্ডের জন্য লড়ছি আমরা আর তারা অক্লেশে বাড়ি চলে গেল! তাহলে আজ সকালে মস প্রাণ দিল কিসের জন্য?

ওকে শান্তিতে থাকতে দাও। ভ্যানডিয়ার বলে।

মোহকের কথা বলছিল সে!

পল্টন ছেড়ে কোথায় যাবে আলেন? আমরা সবাই একেবারে নিঃশেষ হয়ে গেছি। এলি বলে।

প্রচণ্ড ভয় হয়?

ভয় আর আমার হয় না। এলি বলে। আমার দিকে তাকায় সে। তার ফোলা পা আগুনের দিকে ছড়ান। শীর্ণ হাত বাড়িয়ে সে আঙুল সেঁকছে। এলির কালো চোখের শান্ত দৃষ্টির আয়নায় আমার অন্তর ধরা পড়ে।

ক্ষুব্ধভাবে ভ্যানডিয়ার বলে ওঠে ঃ না না এলি, আর আস্থা রাখা যায় না। ভার্জিনিয়ার লোকজন যতদিন বোস্টনের লোকদের ঘৃণা করবে—যতদিন অবিশ্বাস ও ঘৃণা করবে নিউ ইয়র্কের সৈনিকদের, ততদিন শান্তির আশা নাই! আমরা জিতলেও শান্তি আসবে না—

আবার নতুন করে লড়াই শুরু হবে।

এলি কোন জবাব দেয় না। জেকব তার কালো উসকো খুসকো মাথা তোলে। আমাদের উপরে বনের কাছাকাছি নিউ জার্সির সৈনিকদের ছাউনি থেকে গানের সুর ভেসে আসে। করুণ এক ওলন্দাজ সুরে গাইছে তারা। আমি শুয়ে পড়ি; চোখ বুজে ঘুমোবার চেষ্টা করি। কেনটন তখনও বক বক করছে। একশোবার যে কথা শুনেছি, সেই কথাই বলছে সে। বোঝাচ্ছে কিভাবে নিউইয়র্ক ভ্যালিতে ফৌজ পাঠিয়ে ছয় জাতিকে ধ্বংস করা যায়। রেড ইণ্ডিয়ানদের শায়েস্তা করবার সুযোগ ইংলণ্ডের সেনাবাহিনী যে কেন দেবে না, নতুন করে সেই কথাই বলছে সে।

যেদিন আমরা সবল হব, সেইদিনই আমরা এক জাতি হয়ে গড়ে উঠতে পারব। কেনটন বলে।

এই আমাদের বিধিলিপি। জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্পর্কে—অনেক তত্ত্বকথা শোনায় সে। কিন্তু মনোবলহীন ছন্নছাড়া এক জনতার কাছে কিইবা মূল্য তার?

জেকবও আলোচনায় যোগ দেয়। উসকো খুসকো মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁঝাল গলায় সে বলে, একদিকে তুমি ঠিকই বলেছ কেনট। আমাদের বল এইখানে—সবার বলই আমাদের বল। ভেবে দ্যাখ, যে মোহকে ওরা খুনখারাবি লুটপাট করছে কি ঘর জ্বালাছে, সেখানে ফিরে যেতে পারতাম আমরা। কে মরেছে, কে এখনও বেঁচে আছে ভগবানই জানেন। কিন্তু আমাদের বল নিহিত এইখানে। ইণ্ডিয়ানরা সম্পূর্ণ ব্রিটিশদের উপর নির্ভর করে; কাজেই বেজন্মা রাজার লোকদের সঙ্গে লড়ছি আমরা। বিশ্রামের পর আর একটি মাত্র জোরালো আঘাত দরকার। বল সঞ্চয় করে আঘাত করব আমরা—জোরসে একটা মোক্ষম আঘাত হানব।

কোটটা মুখের উপর টেনে দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি। একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে, জেনি সহ ছোট্ট মস ফুলারের কথা। হি হি করে কাঁপি, হাড় পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিচ্ছে শীতে। কাত ফিরে শুই। চোখ মেলে আকাশের দিকে চাই। চোখে ধরা পড়ে অন্ধকার আকাশে নক্ষত্রের অনন্ত বিস্তার। ক্ষিদের জ্বালায় পেট টনটন করছে। মনে মনে বলি, এবার ঘুমোও আর ব্যাথা করবে না।

ভার্জিনিয়ার সৈনিকদের সাহায্যে এই ওয়াশিংটন লোকটা যদি রাজা হয়ে বসে।

লোকটাকে তোমরা ভুল বুঝছ। এলি বলে।

শেষ রাত্রে নক্ষত্রগুলো ফুলকির মত দেখায়। জেগে রাত কাটিয়ে দিই। চোখ চেয়ে দেখি ভোর হয়ে আসছে। তখনও আগুন জ্বলছে, নিভু নিভু হয়ে আসছে। মাঝে মাঝে ঝিম আসছে আমার। রাত বড্ড লম্বা মনে হয়। রাতগুলো এত দীর্ঘ হয় কেন? গড়িয়ে আগুনের আরও কাছে গিয়ে বুঝতে পারি, কে যেন রাতে আগুনে কাঠ গুঁজে দিয়েছে। কে দিয়েছে? মনে হয়, এলি কেনটন কি আর কেউ হবে হয়ত। আলবেনিতে মুদ্রাকর ছিল চার্লি গ্রীন। অনেকদিন সে দলে মিশতে পারেনি, অচেনা পরদেশীয় মত রয়েছে। প্রথমে বেশ নাদুসনুদুস ছিল, কিন্তু এখন সে চর্বি ঝরে গেছে। এডওয়ার্ড ফ্লাগ চাষীর ছেলে। জেকব ও এলি দৃঢ়চেতা সাহসী কিন্তু আলাদা প্রকৃতির। এদের যে কেউ রাত্রে আগুনে কাঠ যোগান দিয়েছে। যেই দিক এই প্রচণ্ড শীতে প্রচুর আত্মত্যাগ করতে হয়েছে

তাকে।
আমি উঠে দাঁড়াই। আর সবাই অঘোরে ঘুমোচ্ছে তখনও। গরম হবার জন্য কুঁকড়ে রয়েছে। ছেঁড়া ন্যাকড়ার বাণ্ডিলের মত দেখাচ্ছে ওদের। মনে পড়ে বহু বছর আগে একটা লোককে কাশরোগে মরতে দেখেছিলাম। এরা বেঁচে আছে, তবু সেই কঙ্কালসার লোকটির মতই এখন এদের চেহারা। কাঠ আনবার জন্য আমি বনের দিকে যাই। তুষার কণার উপর হালকা বরফের পরদা পড়েছে, মুরমুর করে উঠছে আমার পায়ের চাপে। ভোর হয়ে আসে তবু সূর্য ওঠবার কোন লক্ষণ এখনও নেই। পূব আকাশে একটা তুলোর মত সাদাটে ভাব। বরফ পরার পূর্ব লক্ষণও হতে পারে।
বনের সামনে জার্সির সৈনিকেরা শুয়ে আছে। আগুনের চার পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সান্ত্রীও মোতায়েন করেছে ওরা। তারাও ঘুমোচ্ছে এখন—গুটিসুটি মেরে, বন্দুক জড়িয়ে শুয়ে আছে। পাশ দিয়ে চলে যাই কিন্তু সান্ত্রীরা চোখ খোলে না। জার্সির লোকদের অবস্থা আমাদের চাইতেও খারাপ। খালি পা ও ছেঁড়া কোটের ফাঁকে ওদের গায়ের চামড়া দেখা যায়। কম্বল নেই বল্লেই হয়। তাঁবু আছে মাত্র দুটি। তবু মুখ বুজে আছে, অনুযোগ অভিযোগের ধার ধারে না ওরা। ওলন্দাজ রক্ত তাদের গায়ে, পেনসিলভানিয়ার জার্মানদের মত নয়।
কাঠ সংগ্রহ করে ফিরে আসি আমি। নিবু নিবু আগুনে কাঠ গুঁজে দিই ভাল করে। আগুনের তাপে জেকব ও হেনরির ঘুম ভেঙ্গে যায়। তারপর একসময় পেনসিলভানিয়ানদের বিউগলের শব্দে ভোরের আকাশ কেঁপে উঠে। সেই একই দৃশ্য, একদল ভিখারীর ঘুম ভাঙ্গছে—শীত তাড়াবার জন্য ছুটোছুটি হাঁটাহাটি পাশ কসরৎ করছে সকলে। আবার একজায়গায় জড়ো হচ্ছে সৈনিকরা।
কুচকাওযাজ হবে জেনে জেকব বলে,—ঝাণ্ডা নিয়ে প্যারেড হবে আজ।
বসে পা ছড়িয়ে গান ধরে চার্লি—ভিখারীরা আসছে লণ্ডন শহরে…
তাহলে একটা ঝাণ্ডা চাই যে আমাদের!
হাঁ, একটা শূয়োরের ছবি আঁকা মস্ত একটা ঝাণ্ডা দরকার।
কোন খাদ্য নেই আমাদের। খাড়া হয়ে আগুনের দিকে চেয়ে থাকি। এক মুঠো বরফ কুড়িয়ে নিয়ে নিয়ে চিবোয় ফ্লাগ।
আমি খাচ্ছি নে। এলি বলে,—মুখ পেট জ্বলে যাবে বরফে।
জার্সির লোকেরা খাচ্ছে। আমি বলি,—তাদের আগুনের উপর গোটা কয়েক বিশাল ক্যাম্পের কেতলি বসান দেখলাম।
একবার রসদখানায় যাচ্ছি আমি। এলি বলে।
কিন্তু ওরা অফিসারের সই-করা অনুমতি পত্র দেখতে চাইছে যে!
হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে যায় এলি।
মসের জুতো ও কিছুতেই পরবে না। আমি বলি,—ওর পায়ের হয়ে গিয়েছে, এখন জুতোর মধ্যে ওটা ভরাও যাবে না।
মসের সঙ্গে ভাল একটা কোটও কবরে গেল। মরা মানুষের তো আর ঠাণ্ডা লাগে না!
ওই জুতো জোড়া নষ্ট করা উচিত হবে না। চাপা গলায় বলি। বসে আগুনের দিকে পা মেলে আমি পট্টি খুলতে থাকি। পট্টি খোলার শেষে দেখি নীলচে হয়ে গেছে পা দুটো।

আগুনের সামনে রেখে অসার পা দুটো গরম করবার চেষ্টা করি। সারা পায়ে ক্ষত, কাঁচা ঘা, রক্ত চোঁয়াচ্ছে আর নোংরা।

বরফ দিয়ে ঘষে পরিষ্কার করে ফেল আলেন।

আর একবার ঠাণ্ডা করবার আগেই পচে যাবে, হেসে বলি।

ভ্যানডিয়ার বলে, বিশপ বার্কলির লেখা বইয়ের একটা ছত্র মনে পড়ছে। লোকটা চমৎকার দার্শনিক। ওর মতে, ব্যথা ও সমস্ত পার্থিব জিনিস মনের অনুভূতি মাত্র। মনে না করলে তার আর কোন অস্তিত্ব থাকে না।

মস মারা গেছে, কিন্তু আমরা বেঁচে রয়েছি এখনো। মড়ার মত আমিও একদিন কাঠ হয়ে পড়ে থাকব।

মসের গায়ে এখন আর ঠাণ্ডা লাগছে না। আমি বলি,—জুতোটার জন্য লটারি করা যাক না, কি বল জেকব।

ও জুতো আমার পায়ে ঠিক হবে না। গোমরা মুখে এডওয়ার্ড বলে। যেমন বিরাট চেহারা তার, তেমন বড় হাত পা। অত বড় হাত-পা জীবনে দেখিনি আমি।

কেনটন পুঁটলি থেকে এক জোড়া জুয়ার ঘুঁটি বার করে এবং বরফের পর গড়িয়ে দেয়। ডবল ছয় পড়ে. হেনরিই জুতো জোড়া পায়। কোলের মধ্যে নিয়ে জুতো জোড়াকে আদর করে সে··পরীক্ষা করে দেখে কেমন নরম। তারপর সে পায়ের পট্টি খুলতে শুরু করে। পায়ে আটকে যায়। বলে, আটদিন পরে পায়ের পট্টি খুলছি। পট্টি খোলার পর মোজা বেরোলে দেখা যায় চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে আছে মোজায়। আর পাও ফুলে ঢোল।

আমরা জোরাজুরি করে তার পায়ে জুতোটা ঢোকাবার চেষ্টা করি। পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে হেনরি · যন্ত্রণায় হাত মুঠো করতে থাকে অল্প কিছু তামাক ছিল আমার কাছে। তারই এক টুকরো ছিঁড়ে দিয়ে জুতো পরবার সময় চিবোতে বলি ওকে। তামাকটুকু মুখের মধ্যে পুরে জোরে জোরে চিবোয় হেনরি···তামাকের কালচে লালা গড়িয়ে পড়ে দাড়িতে। যন্ত্রণায় বারে বারে মুখ ভ্যাঙচায় হেনরি।

জুতো পরাবার পরেও সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেনি। ফিসফিস করে বলে, এ ব্যাথা আমি সইতে পারব না। খুলে নাও এখখুনি খুলে নেও।

আবার হেনরির পায়ের পট্টি বেঁধে দেওয়া হয়। পা দুটো গরম জলে ধুইয়ে দিতে বলে জেকব; কিন্তু হেনরি রাজী হয় না। জুতো জোড়ার পর আমারও লোভ আছে। আবারও বরফের উপর ঘুঁটি ফেলা হয়। এবার পায় কেনটন। কেনটনকে বল্লাম যে ওই জুতো জোড়ার জন্য লড়াই করব! সোজা কথায় বল্লাম যে পাবে তার বিপক্ষে দাঁড়িয়ে বুটের জন্য লড়াই করব।

জেকব আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। বলে, মাথা খারাপ হলো নাকি এমন করছ কেন আলেন?

ওটা মসের জুতো। আমি বলি,—মস কোথায় এখন?

মাটিতে বসে আমি দুহাতের মধ্যে মাথা গুঁজে থাকি। ক্ষিদে পেয়েছে প্রচণ্ড; মাথাটাও একেবারে হালকা লাগছে। নিজেকে এসময় বেশ শক্তিমান বলে মনে হয়। মনে হয়, শুধু কেনটন কেন, বাকী সবার সঙ্গেও লড়তে পারি। মনে হয়, অনায়াসে লম্বা লম্বা পা ফেলে

হন হন করে হাঁটতে পারি।
তারপর হঠাৎ কাঁদতে শুরু করি। আপনা থেকেই কান্না আসে। মুখ ঢেকে রাখি দু'হাত দিয়ে। চোখ তুলে দেখি, আমাকে ঘিরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। স্পষ্ট দেখলাম, ক্লার্ক ভ্যানডিয়ারের ঠোঁঠ কাঁপছে। ছোটো খাটো লোক সে, বাচ্চাকাচ্চা আছে নিজের। কে জানে, ওর হয়ত নিজের সন্তানের কথাই মনে পড়েছে।
এই আলেন কেঁদ না, শান্ত হও। জেকব বলে।
কেনটন তখনও বুট জোড়া হাতে করে বসে আছে। চাপা গলায় সে বলে, আমার জুতোর দরকার নেই আলেন।
আমি চেঁচিয়ে উঠি,—জানি, কি ভাবছ তুমি। ভাবছ, এইবার আমার মরার পালা। মসের পরে আমি।
আমরা এখুনি পেট ভরে খেতে পাব আলেন।
মস বাড়ি ফিরে যেতে চেয়েছিল। পল্টন ছেড়ে এখন বাড়ি ফিরে যাবার হিম্মত তোমাদের কারও নেই। ওঃ যীশু খ্রীস্ট, আমার পেটে একেবারে কিছুই নেই!
এলি এগিয়ে আসে। তাকে দেখে সবাই সরে যায়। শুধু কেনটন দাঁড়িয়ে থাকে বুট হাতে। মৃদু স্বরে বলে সে, মসের জুতো জোড়ার জন্য জুয়োর ঘুঁটি ফেলেছিলাম আমরা।
এলি কোন জবাব দেয় না। তার হাতে বেশ বড় এক টুকরো মাংস।
আঃ খাবার এনেছ? মাথা নেড়ে বলে জেকব।—সত্যিই অদ্ভুত লোক তুমি। আস্তে আস্তে পেছনে সরে গিয়ে কেনটন ও এলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে সে। বলে, এই জুতোর ঘটনার জন্য রাগ করোনি তো এলি?
রসদখানায় ভয়ানক কাণ্ড হতে যাচ্ছে। দু-একটা খুনখারাবিও হতে পারে। এই দশ হাজার লোক খাওয়াবার মত খাবার নেই আর তার ব্যবস্থাও নেই। আমার কাছে কাগজ পত্র চেয়েছিল; কিন্তু কোনমতে বলেকয়ে এই খাবারটুকু বার করে এনেছি। চেয়েছিলাম এক রেজিমেন্টের জন্য। কিন্তু মনে হয়, খাদ্য সামান্যই আছে। বন্দুকে গুলি ভরে বোস্টন ও পেনসিলভানিয়ার লোকজন ওখানে গেছে।
শালা পেনসিলভানিয়ানদের দেখতে পারি না।—কিন্তু খাবার নিয়ে ভার্জিনিয়ানদের মুরুব্বিয়ানাকেও ঘৃণা করি, জেকব বলে।
বেশ চুপচাপ অদ্ভুত লোক ওরা।
আমি উঠে একটু দূরে সরে যাই। ভেতরে ভেতরে হাঁপাচ্ছি নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে, গলা জ্বলে যাচ্ছে। আগুনের কাছ থেকে সরে গেলে পাতলা জামা ভেদ করে শীত যেন হাড় পর্যন্ত কামড়ে ধরে। এলির কথাবার্তায় বেশ চটে গেছি। জুতোর সম্পর্কে ও কিছুই বল্ল না! কিছুক্ষণ পর ফিরে দেখি, কেতলির পাশে জটলা করে ওরা মাংস কাটছে। অল্প কিছু ভুট্টার গুঁড়ো আছে জেকবের কাছে, এবার সেই শেষ সম্বলটুকুও সে ঢেলে দেয় কেতলির ফুটন্ত জলের মধ্যে। সৈন্যদলের নড়াচড়া দেখতে পাচ্ছি, ওরা ভীড় করছে বনের চারপাশে আর পাহাড়ের শেষ প্রান্তে।
আগুনের কাছে ফিরে আসি; হাত বাড়িয়ে আমাকে টেনে নেয় এলি। নীরবে দ্রুত খাওয়া শেষ করা হয়। বন্দুক তুলে নিয়ে নেহাৎই অভ্যাসের বসে সযত্নে মুছে নিই। মনে

হয় বন্দুকের উপর কোন রকম দরদই নেই আমাদের। ব্রিগেডগুলোর সঙ্গে হেঁটে চলেছি—চলেছি মাসাচুসেটস্, ভারমন্ট, পেনসিলভানিয়ান ও পাতলা লম্বা-চুল জার্সির ওলন্দাজদের সঙ্গে। যেখানে ছাউনি ফেলা হয়েছে সবারই মুখেই তার প্রশংসা—স্থানটির প্রাকৃতিক সুরক্ষা ব্যবস্থার সুবিধার কথা। ফোর্জ উপত্যকার চতুর্দিকে ঘিরে রয়েছে পাহাড়ের সারি। প্রাকৃতিক দুর্গ বল্লেই হয়।

একজন বললো, ফিলাডেলফিয়ার পথে যদি ওরা আক্রমণ করে তো আবার ব্রিডস্ পাহাড়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে। কিন্তু তখন বাংকার পাহাড়ের যুদ্ধের সময় সবে যুদ্ধে নেমেছি আমরা। অবশ্য সেই থেকে আর কোন যুদ্ধেই আমাদের জয় হয়নি।

আমাদের পথ চলার মধ্যে কোন শৃঙ্খলা নেই। মাঝে মাঝে দু একটি অফিসারের হুকুম শোনা যাচ্ছে তবু অধিকাংশ সময় সৈনিকেরা খেয়াল খুশি মত চলাফেরা করছে। অফিসারদের প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা জন্মেছে সৈনিক মহলে। তারাও সবাই শঙ্কিত। সংগঠিত পল্টনের সব চিহ্নই এই বাহিনী থেকে লোপ পেয়েছে। বহু সপ্তাহ মাইনে পাইনি আমরা; খাবারও জুটছে না পেট ভরে। যেখানে রয়েছি এই জায়গা আর বাড়ির মধ্যেকার দূরত্ব দীর্ঘ। মাঝখানে বিস্তীর্ণ ঠাণ্ডা অঞ্চল। মনে হয়, শুধু এই শঙ্কাতেই এখনও একত্র রয়েছি। শোনা যাচ্ছে, ব্রিটিশ টহলদার বাহিনী আংটির মত ঘিরে রেখেছে আমাদের।

বনের চার পাশে ও পাহাড়ের উপর ঘোরাঘুরি করে উত্তর দিকে এগিয়ে আমরা বিস্তীর্ণ এক খোলা মেঠো জমির মধ্যে নামলাম। শুয়েলকিল পর্যন্ত বিস্তৃত এই প্রান্তর। পরে এইটেই 'গ্রাণ্ড প্যারেড' নামে পরিচিত হয়। স্রোতের মত মাঠের মধ্যে সৈন্যদল আস্তে আস্তে নামছে। মোটামুটি একটা শৃঙ্খলার ভাব দেখা যাচ্ছে। পেনসিলভানিয়ার লাইন উত্তরে, তারপর নিউ জার্সি আর নিউইয়র্কের লাইন, তারপরেই ভার্জিনিয়ার রাইফেলধারীরা।

মাঠের চারপাশে কিছু কিছু লোক এসে জমে। আশপাশের গ্রামের লোক এরা। অধিকাংশই কোয়েকার। সৈনিকদের টিটকারি দিচ্ছে। মাসাচুসেটস্ ও পেনসিলভানিয়ার ব্রিগেড এখনও ড্রাম ব্যজিয়ে চলেছে। ক্রমে তাদের বাজনা জমে ওঠে···ড্রাম বাজনার তালে তালে চলতে শুরু করি। পুরনো অভ্যাস এত সহজে যাবার নয়।

পেনসিলভানিয়ার লাইনের শেষের দিকে নিউইয়র্কের সৈন্যদলের কাছাকাছি আমরা আটজন দাঁড়াই। বন্দুকে ভর করে থাকি। কারও মুখে কোনও কথা নেই। সৈন্যদলের আগে পিছের সমস্ত শব্দ স্তব্ধ হয়ে আসে।

হঠাৎ মেয়েদের কলকণ্ঠস্বর আসে কানে। চেয়ে দেখি, পেনসিলভানিয়ার লাইন থেকে মেয়েদের বের করে দিচ্ছে ফৌজদাররা। সৈন্যদলের পেছনে একজায়গায় ভীড় করে দাঁড়ায় শিবির সহচরীরা। এই মেয়েদের উপস্থিতি এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা করে!

তা' প্রায় হাজার খানেক মেয়ে হবে। জেকব বলে।

পুরুষের কাছাকাছি থেকে মেয়েরা কি যে না করতে পারে, তা বোঝা দুষ্কর।

আকাশে ঘন মেঘ জমে। ধূসর কালো ও সাদা মেঘের ভীড়। একটি গোলন্দাজ ব্যাটারি ঘড় ঘড় শব্দে প্যারেডের মাঠ পার হয়ে যায়।

নক্সের কামান। এলি বলে।

মাঠে এখন প্রায় হাজার দশেক লোক। পাইকারি দলত্যাগের ফলে এর পরে আমাদের

সংখ্যা এর অর্দ্ধেক কি তারও কম হয়ে গিয়েছিল।
চোখ, বুজে এদের আমি পল্টন হিসাবে কল্পনা করবার চেষ্টা করি। বোজা চোখের তুষার-জমা পাতার ফাঁক দিয়ে যদি এদের কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে কোনক্রমেই ভুলতে পারি না যে অর্দ্ধেকেরও রাইফেল নেই আর সবার পোশাকই শতছিন্ন। ভার্জিনিয়ার সৈনিক ছাড়া উর্দি নেই কারও পায়ে। পরনে তাদের তাঁতের-বোনা শিকার করবার খাকি শার্ট। ভাল একটা কোট কি এক জোড়া জুতো পর্যন্ত নেই কারও। প্রায় সকলেরই শরীরের কোন না কোন অংশ দেখা যাচ্ছে। যাদের প্যাণ্ট ছিঁড়েছে তাদের নীলচে পাছা কি হাঁটু দেখা যাচ্ছে…পায়ে কম্বলের টুকরো বাঁধা…পায়ের পাতা ঢাকা হয়েছে যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে। পা দুটোই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। সৈন্যদল যদি লড়াই করতে নাও পারে, তবু মার্চ করবার সামর্থ তাদের থাকা চাই…চাই দিবারাত্র কি চিরকাল চলবার মত ক্ষমতা।
কিন্তু এখন চোখ বুজলেই চোখের সামনে ভেসে উঠবে শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দাড়ি গোঁফ না কামানো দুর্গন্ধযুক্ত নোঙরা এক পল্টনের ছবি। বড় জোর বুনো জন্তুর মত লড়াই করতে পারে এরা। আবার শঙ্কা হয়, আর কোন দিনই হয়ত আমরা লড়াই করব না। উচ্চস্বরে হেসে উঠি। এলি আমার দিকে তাকায়। কেনটন বলে, মসের জুতোর জন্য রাগ করোনি তো আলেন? বহুদিন এক সাথে আছি, নিজেদের মধ্যে রাগারাগি করা বোধ হয় ঠিক নয় আলেন! ভগবানেব নামে হলপ করে বলছি, ও জুতো আমি পরব না।
ঠিক আছে!

হাতিয়ার তুলে নেবার আহ্বান জানিয়ে বিউগিলের আহ্বান শোনা যায়। বন্দুক তুলে নেয় সৈনিকরা। পলকের জন্য মনে হয়, আমরা যেন মানুষ নই…এক জীবন্ত বিপ্লবের অংশ · প্রবল অপরাজেয় আমাদের শক্তি। মনে হয়, সাধারণ মানুষের বাইরে আমরা। কিন্তু এ অনুভূতি ক্ষণিকের। সোঁ সোঁ করে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসে শীত ও ক্ষুধার অনুভূতি।
পেনসিলভানিয়ার একজন খিঁচিয়ে ওঠে, গোল্লায় যাক প্যারেড। ওরা আমাদের মাইনে দিচ্ছে না কেন?
ওয়েন ও স্কট পেনসিভানিয়ার লাইনের সামনে দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। ওয়েনের মাথায় একখণ্ড কাপড় বাঁধা। বহু ব্যবহারে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তার কোট। সামনে ঝুঁকে স্কটের পাশাপাশি চলছেন: পেননিলভানিয়ার সৈন্যদলে চাপা উল্লাস দেখা দেয়। এদের দুজনকেই ভালবাসে এরা। কিন্তু ওদের কেউ সেদিকে লক্ষ্য করে না। ঘোড়া নিয়ে ওরা সৈন্য দলের সামনে দাঁড়ায়।
একজন সৈনিক পতাকা নিয়ে যায়। আমাদের মধ্যে কেউ অভিবাদন করে না। অন্যদলেও সামান্য কয়েকজনেই করে। আমরা শীতে উসখুস করতে থাকি।
ফৌজদাররা ঠাসাঠাসি করে আমাদের গায়ে-গায়ে দাঁড় করিয়ে দেয়। ওয়াশিংটন ঘোড়ায় চড়ে মাঠের মাঝখানে আসেন। টান হয়ে বসে আছেন তিনি। মনে হয় এই ঝড়ো ঠাণ্ডা বাতাস সম্পর্কে কোনো হুঁস নেই তার। অদ্ভুত মানুষ বটে লোকটা। মনে হয় আমাদের মধ্যে কেউ বোঝে না তাঁকে, চেনে সামান্য জনকয়েক। তাই মাঝে মাঝে তাঁর বিরুদ্ধে আমরা প্রচণ্ড ঘৃণা প্রকাশ করি। কিন্তু অকুতোভয় তিনি।

আর ঠিক পেছনেই হ্যামিলটন। অভিজাতের মত ঘোড়ার পিঠে সোজা হয়ে বসে আছে। তার উর্দির লেস-দেওয়া কাফ্ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। হ্যামিলটনের পেছনে একদল সেনানী।

জেনারেলের কোন কথা শোনা যায় না। বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দে সামান্য দু-চারটে টুকরো শব্দ কানে আসে···অনেক পথ এসেছি...অনেক দুর্ভোগ ভুগেছি···আরো কষ্ট সইতে হবে ···ব্রিটিশরাও ভুগছে এমনি করে···কিন্তু আমাদের মত কোন আদর্শের জন্য নয়···

কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে, কোথায় ভুগছে তারা ? ফিলাডেলফিয়ায় ?

সমস্ত দুঃখ কষ্ট এখন সইতে হবে আমাদের···ঘৃণা করতে···

আমাদের মাইনের কি হল বলুন ? আপনাদের ঐ রদ্দি মহাদেশীয় মুদ্রা···

আমি জেকবের দিকে তাকাই। তার কালো চোখ দুটো যেন জ্বলছে। শীতে নীলাভ তার মুখের পেশী নড়ছে·· কখনও রাগে কখনও বা দুঃখে।

সাথীরা শিগগিরই পর্যাপ্ত খাবার আসবে·· পাবে রামের রেশন···কংগ্রেসের কাছে আবেদন...

বাজে কথা যতসব।

পেনসিলভানিয়ার একজন বলে ওঠে, আমি দিব্যি করে বলছি, ঘুমের কোন ব্যাঘাত হচ্ছে না ওর।

উষ্ণ ঘরের মধ্যে আরামে আছে আর শূয়োরের মত গিলছে।

সাথীরা, আমরা এখান থেকে মার্চ করে যাব ··জয় আমাদের সুনিশ্চিত···

তুমুল হট্টগোলের মধ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর হারিয়ে যায় : আমাদের মাইনে চুকিয়ে পল্টন ভেঙে দিন! শক্ত মাটিতে রাইফেলের কুঁদোর ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ কানে আসে। কোথায় যেন ড্রাম বাজছে একটা। তারই তালে তালে একজন রাইফেল ঠুকছে। আমি একমনে ওয়েন ও স্কটের ভাবগতি লক্ষ্য করে যাই। নিশ্চলভাবে বসে আছ তারা। ওয়াশিংটনও নড়ছেন না। সেনানীরা ঘিরে ধরে তাঁকে ; কিন্তু তাদের ভীড় সড়িয়ে তিনি পল্টনের দিকে এগিয়ে আসেন। আমাদেরই কাছাকাছি এসে ঘোড়া থামান। স্পষ্ট চোখে দেখতে পাচ্ছি শীতে নীলাভ তাঁর মুখ। পাতলা রাঙা ঠোঁট কিন্তু দৃঢ়সংবদ্ধ। শঙ্কা হয়, যে কোন মুহূর্তে হয়ত একটা বন্দুকের আওয়াজ শুনতে পাব। বেশ বুঝতে পারি, কি ভাবে সৈনিকেরা এখন খুন করবে ওঁকে। জেকব ফিসফিস করে বলে, কিন্তু মানুষের মত মানুষ। মামুলি অফিসার নয়, জননেতা হবার যোগ্য লোক।

সত্যি অদ্ভুত মানুষ। কদাচিৎ এমন লোকের দেখা মেলে। সায় দিয়ে বলে এলি।

ধীরে ধীরে গোলমাল থেমে আসে। মাথা হেঁট করেন জেনারেল। বেদনায় মুখ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

ওস্তাদ অভিনেতা। বিড়বিড় করে বলে চার্লি।

তোমরা এখনও আমার সহকর্মী সহযোদ্ধা। তিনি বলেন ওঠেন,—শুধু আমার উপর এইটুকু বিশ্বাস রেখ যে আমিও তোমাদের মতোই একজন...তোমাদের জেনারেল নই। এইখানে আস্তানা তুলে আমাদের এখন থাকতে হবে এবং যা দুঃখ কষ্ট আসে সহ্য করতে হবে। যে কোন মূল্যে এ করতেই হবে!

এরপর তিনি চলে গেলেন। ব্রিগেডগুলো আবার ছড়িয়ে পড়ে। কুচকাওয়াজ শেষ পর্যন্ত ক্ষুব্ধ জনতার সোরগোলে পরিণত হয়। মেয়েরা এগিয়ে আসে—আবার মিশে যায় পল্টনের সঙ্গে।
পেনসিলভানিয়ানদের দলে এখনও খানিকটা শৃঙ্খলা আছে। ঘোড়া ছুটিয়ে ওয়েন আমাদের ছোট্ট দলটির সামনে আসেন। আমরা সরে দাঁড়াই।
তোমরা আমার লোক তো নও! তিনি বলেন।
আমরা চার নম্বর নিউইয়র্ক রেজিমেণ্ট স্যর। এলি জানায়।
ওয়েন পকেট থেকে একখানা ছোট্ট খাতা বার করে এবং বুড়ো আঙুল দিয়ে খুঁজতে থাকে। ঝোড়ো বাতাসে পত্‌পত্‌ করে বইয়ের পাতা ওড়ে—খুলে যেতে চায়। এলিকে জিজ্ঞাসা করে, দল কি ভেঙে দেওয়া হয়েছে।
আমরা আটজন মাত্র বেঁচে আছি।
তোমাদের চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়ার ইউনিটে নিয়ে নেব। ক্যাপ্টেন মুলারের হুকুম নিয়ে চলবে তোমরা।
আমরা পেনসিলভানিয়া রেজিমেণ্টে যাব না। গোমরা মুখে বলে জেকব।
হুকুম মেনে চলতেই হবে।
হুকুম চুলোয় যাক।
তোমাদের নায়ক কে? গম্ভীরভাবে ওয়েন জিজ্ঞাসা করেন।
কোন নায়ক নেই আমাদের মধ্যে। আমি বলি,– তারা মারা গেছে।
চৌদ্দ নম্বরেই যোগ দিতে হবে তোমাদের; না হলে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হবে।
জেকব বন্দুক তোলে। তাকে থামাবার চেষ্টা করে এলি, কিন্তু জেকব তার হাতে ছাড়িয়ে নেয়। ওয়েনকে বলে, ঐ জার্মান চাষীর সঙ্গে চলতে পারব না। এমনিতেই আধমরা হয়ে রয়েছি অফিসার তাঁবেদারি করলে আর বাঁচতে হবে না।
পেনসিলভানিয়ানরা আমাদের ঘিরে দাঁড়ায়। তাদের ঠেলে এক অফিসার এগিয়ে আসে। ওয়েন তাকে বলে, ক্যাপ্টেন মুলার, তোমার লোকজন দিয়ে একে ঘিরে রাখ। আর যদি গুলি চালাতে চায় তবে ওকে গুলি করবে।
মনে হয়, এমনি একটি স্ফুলিঙ্গই গোটা মাঠে আগুন জ্বালাবে। আমি যেন বিপ্লবের শেষ অঙ্ক দেখছি। কিন্তু এলি দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে জেকবকে এবং জোর করে তার বন্দুক নাবিয়ে দেয়।
ক্যাপ্টেন এরা তোমার লোক, ওয়েন বলেন। তারপর তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলে যান। আর সবাইর সঙ্গে আমরা চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছি। বিষম রাগ হয় মনে মনে। বেশ অস্বস্তি বোধ করি। ব্রিডস্‌ পাহাড়েও আর একবার এমনি অবস্থায় পড়েছি। ব্যস, আর নয়। ভীড় ঠেলেঠুলে আমি জেকবের কাছে এগিয়ে যাই।
পেনসিলভানিয়ার লোকজন হাসাহাসি করছে। দলে গুটিকয়েক মেয়েও আছে। খিল খিল করে হেসে আমাদের দিকে চোখ টিপছে তারা।
আমার দলে বিদ্রোহ করা চলবে না, মুলার বলে। হুকুম মাফিক কাজ করতে হবে, বুঝলে

বাছাধনরা ! নয়ত দুর্ভোগ আছে।
আপনার যা খুশি করতে পারেন স্যার। মোলায়েমভাবে এলি কথাটা বলে।
এলির চোখের দিকে চেয়ে তাকে ধমক দেবার হিম্মত হয় না ওর। পেছনে ফিরে সে সার বেঁধে দাঁড়াবার হুকুম দেয়।
ফিরে আসবার জন্য সার বেঁধে দাঁড়াই। জেকব তখনও কাঁপছে রাগে কালো হয়ে গেছে মুখখানা। এলি তার হাত ধরে আছে। লম্বা ছিপছিপে একটি মেয়ের কোমর সাপটে ধরে আছে কেনটন। যে কোন ভদ্র গেরস্থ মেয়ে লজ্জা পায় তার মুখ দেখে। পেনসিলভানিয়ার একটি লোক এগিয়ে এসে মেয়েটির হাত ধরে টানে। বলে, এ আমার স্ত্রী।
তাই নাকি ! এ তো বেশ্যা ; এখন আমার পয়সা খাচ্ছে। কেনটন বলে।
বলছি আমার স্ত্রী !
একথা শুনে আর সব মেয়েরা হাসতে শুরু করে। কেনটনের হাতধরা মাগীটা স্বামীর দাবীওয়ালা লোকটার মুখে থুথু ছুঁড়ে মারে। হো হো করে হেসে ওঠে সবাই !
আচ্ছা একদল বজ্জাত মাগী জুটিয়েছে তো পেনসিলভানিয়ানরা ! চার্লি গ্রীন বলে।
আবার ফিরে আসি আমরা। মেঘের প্রাচীরে ফাটল ধরে...শুরু হয় বরফ-পড়া ! তুষারের মধ্য দিয়ে হোঁচট খেতে খেতে আমরা আস্তানায় ফিরে চলি।

চারিদিক গভীর অন্ধকার। সব নিস্তব্ধ নিঝঝুম। হাওয়া বইলেই আকাশ সাফ হয়ে যাবে—নক্ষত্র দেখতে পাব। পৃথিবীর বুকে স্তব্ধতা থমথম করছে। বড়দিনের আগের রাত আজকে।
মনে হচ্ছে যেন কয়েকদিন কি কয়েক সপ্তাহ এখানে এসেছি। দিনের হিসেব কে রাখে এখানে ? সবাই বলছে শোনা যাচ্ছে, আগামী কাল বড়দিন এবং সেজন্য রামের বরাদ্দ বাড়িয়ে দেওয়া হবে, আর মুরগীও নাকি দেওয়া হবে। সবাই বলছে ক্যাপ্টেন আলেন ম্যাকলেন আর তার হানাদারদল হাজার মুরগী ভরা একটি ব্রিটিশ কনভয় আটক করেছে। কিন্তু আবার কেউ কেউ একথা বিশ্বাস করছেনা। বড়দিন সম্পর্কেও বিশেষ উৎসাহ নেই কারও। বড়দিন মানে দুঃখ কষ্টেরই আর একদিন। আর হাজার মুরগী সাবাড় করবার মত অফিসারের অভাবও হবে না এখানে।
রাত হয়েছে। আজ পাহারার পালা আমার ! আমরা এখানে আসবার পর তিন দিন সমানে বরফ পড়েছে। ইঞ্চি ছয়েক পুরু আলগা ঝুরঝুরে বরফ জমে আছে মাটির উপর। হাঁটতে গেলে ছিটকে ওঠে—পায়ের পটির ফাঁকে ঢুকে পড়ে। স্মরণকালের মধ্যে এমন শীত পড়েনি কখনো।
আমি গুনে গুনে একশো কুড়ি পা হাঁটছি, আবার পেছনে ফিরছি। ঘণ্টা দুয়েক এই ভাবে চলে। বন্দুকের বোঝা টেনে গুটি গুটি পা ফেলছি। বনের কিনারে আমার 'বিট' শেষ। সেখান থেকে দেখা যায় জমাট বাঁধা শুয়েলকিল নদী, কিং অফ প্রুশিয়া রোড আর ফিলাডেলফিয়ার পথ যেন স্পষ্ট মালুম হয়। দেখা যায় রাত্রির গভীর রহস্যের-বুকে-হারানো সুউচ্চ গিরিশ্রেণী। দূর দিগন্তের কোলে আলোর ফুটকি দেখছি, ঐ বোধহয়

ফিলাডেলফিয়া সহর, এখান থেকে মাত্র আঠারো মাইল দূরে। এই নিঃসীম নিস্তব্ধতা পাগল করে দেয়।
ম্যাকস্ ব্রোনের জন্য অপেক্ষা করি, জার্মান কিশোর। হেরিশবার্গ শহরের আশেপাশের পাহাড়ি গ্রামাঞ্চলের গাঁইয়া ছেলে সে। আজকে রাত্রে আমার সঙ্গে পাহারায় আছে। সামান্য গুটিকয়েক ইংরেজী কথাই জানে। শীতের কষ্টে আর বাড়ির টানে ভারী কষ্টে আছে বেচারী। যা-ই হোক, কোন সঙ্গী না থাকার চাইতে এমন সঙ্গীও এখন ভাল লাগছে।
আমার বিটের শেষ প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াই। হাঁটা থামাবার সঙ্গে সঙ্গে শীতে গা কামড়ে ধরে। মনে হয়, যেন দুনিয়ার শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছি। আমার ও দূর আকাশের হিমলোকের মধ্যে যেন কোন ব্যবধান নেই। দুটি কোট আমার গায়ে। আমার নিজের, একটি অপরটি কেনটনের। যদিও দুটিই পাতলা। পায়ে বরফ জমে গেছে। মনে হচ্ছে পা দুটো যেন বরফের পিণ্ড। হাতে কম্বলের টুকরো জড়িয়ে নিয়েছি। হাত দিয়ে কোন মতে বন্দুকটা বয়ে বেড়াচ্ছি। কিন্তু হায় তাতেও শীতের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। মাঝে মাঝে পা ছুঁড়ে বরফ ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি।
দাঁড়িয়ে দেখি, অতিকষ্টে ঢালু পথ বেয়ে উপরে উঠছে ব্রোন। সামনে ঝুঁকে চলছে··· বলতে গেলে হামাগুড়ি দিচ্ছে। খুব কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত আমায় দেখতে পায়না ও। তখন আবার পেছন ফিরে রওনা হয়।
সব ঠিক আছে। আমি বলি।
সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ছোকরা। মুখ থেকে খানিকটা ধোঁয়া বেরোয়। নিজের গায়ে বন্দুকটা হেলান দিয়ে রেখে জোরে জোরে উরুতে হাত চাপড়ায়। বলে, আমার ভীষণ ভয় করছিল। বাবাঃ, কি নির্জন!
খানিকক্ষণ দুজনে একসাথে দাঁড়িয়ে থাকি। কারও মুখে কোনো কথা নেই। শীত তাড়াবার জন্য উভয়েই মাঝে মাঝে শরীর ঝাঁকাচ্ছি। দূরে একটা নেকড়ে ডেকে ওঠে। তার গর্জন কেঁপে কেঁপে রাত্রির স্তব্ধতাকে খান খান করে। ঘেউ ঘেউ করে কোথায় একটা কুকুর ডেকে উঠে জবাব দেয়। শিরদাঁড়ায় কাঁপুনি অনুভব করি। মেরুদণ্ড বেয়ে একটা মৃদু একটা কম্পন নীচু থেকে উপরে উঠে আসে। ভয়ে ব্রোনের মুখ সাদা হয়ে যায়।
যদি গুলি করে ওটাকে মারতে পারতাম! আমি বলি। ওটার চামড়া দিয়ে ভাল একটা টুপি আর দস্তানা বানানো যেত!
ব্রোন বলে, ভয় হয় এখন একলা হাঁটি, মনে হয় ওৎ পেতে থাকে ওরা।
আমরা প্রথম যখন এখানে আসি, এ মুলুকে বাঘ ছিল না। বছরের পর বছর যে অঞ্চলে চাষ আবাদ হচ্ছে, বাঘ থাকতে পারে না সেখানে। তাছাড়া আঠারো মাইল দূরে হাজার বিশেক লোকের শহর রয়েছে একটা।
রোজই এখন এদের সংখ্যা বাড়ছে। আমি বলি!
আজ রাত্রে বাড়িতে আগুন জ্বালান থাকত। শূয়োর রোস্ট করা হত। আঃ, সারা রাত মদ খেয়ে নাচানাচি করে কাটাতাম!
অপলক দৃষ্টিতে পরস্পরে চোখ চাওয়াচাওয়ি করি এবং মাথা নেড়ে সায় দি আমি। ছোকরার দিকে চেয়ে ভাল করে তার মুখখানা দেখবার চেষ্টা করি। বেঁটে লিকলিকে

রোগা ছেলেটি। পাতলা দাড়ি গজিয়েছে মুখে। চোখ দুটি নিষ্পাপ বোকা বোকা। শীতের চোটে ছেলেটির গোটা মুখখানা অসাড় হয়ে গেছে। কোন আশা, কোন আদর্শ তার আছে বলে মনে হয় না। নিজেকেই নিজে জিজ্ঞাসা করি, কেন? মনে মনে বলি, বিপ্লবের এই বিভীষিকাময় পথ চলতে হবে, স্বপ্নেও কোনদিন ভেবেছিল কি?

এরও ধমনীতে হেসিয়ানদের রক্ত বইছে। হেসিয়ানদের আমি অবশ্য ঘৃণা করি না, কিন্তু পেনসিলভানিয়ার জার্মানরা করে, তারা হেসিয়ানদের যতটা ঘৃণা করে এত ঘৃণা কোন মানুষকে করতে দেখিনি। এমনকি, মুমূর্ষু হেসিয়ানদেরও নির্মমভাবে উৎপীড়ন করে এরা। তাদের লাথি মারে, কিরিচ দিয়ে খোঁচায়···বীভৎস ঠাট্টা বিদ্রূপ করে জার্মান ভাষায়।

আমি পেছন ফিরে চলতে শুরু করি। যাবার সময় আর কোন কথা হয় না। ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, অতি কষ্টে ঢালু পথ বেয়ে নামছে ছেলেটি। তাকে আমারই প্রতিবিম্ব বলে মনে হয়। চোখ বুজে সে-ছবি ভুলবার চেষ্টা করি···এগিয়ে চলি হোঁচট খেতে খেতে।

আমার বিটের অপর প্রান্তে এসে থেমে যাই.. বন্দুকে ভর করে দাঁড়িয়ে থাকি চুপ করে। কিন্তু ঝিমুনি আসে। এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব বলে মনে হয়। দুনিয়ার সঙ্গে শেষ দেখা-শোনার এক মধুর অনুভূতি আমায় পেয়ে বসে। ধীরে ধীরে শীতের সমস্ত অনুভূতি লোপ পায়। আধ বোজা চোখে আমি স্কটের সৈন্যদলের আধ-ঢাকা আস্তানাগুলো দেখতে পাচ্ছি। আজকের রাত মিশে যায় অন্যান্য বড়দিনের পূর্ব রাত্রির সঙ্গে। কানে বাজে বাবার স্নেহভরা গম্ভীর মৃদু কণ্ঠস্বর। তিনি যেন বাইবেল থেকে ভাল মানুষের' কাহিনী পড়ছেন। তার সাথে কানে আসে মায়ের সুতো কাটার খড় খড় আওয়াজ। চাকার আওয়াজ আমায় ঘুম পাড়িয়ে দেয়। বাইরে হ্রদ অঞ্চলের সুবিস্তীর্ণ সমতল বনভূমি · ছয় জাতির রেড ইণ্ডিয়ানদের রহস্যময় রাজ্য। এইখানেই ডেরা বেঁধেছি আমরা। এ মুলুকের সব কিছুই রহস্য-ঘেরা বিভীষিকায়। কিন্তু এই এক ফুট পুরু গাছের গুঁড়ির বেড়া দিয়ে এ অঞ্চল বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে।

কানে আসে বাবা ডাকছেন, আলেন। সঙ্গে সঙ্গে মাও আস্তে আস্তে বলে ওঠেন, এই, এ বই পড়বার সময় ঘুমোতে নেই আলেন!

আচমকা সম্বিত ফিরে আসে। ভয়ে আঁতকে ওঠে প্রাণ। জমে যাচ্ছি! নড়বার চেষ্টা করি; কিন্তু নড়াচড়ার কোনো শক্তি নেই। আতঙ্কে সারা দেহ অবশ হয়ে আসে। হাত পা ছেড়ে দিই···মৃত্যুকে চোখের সামনে দেখতে পাই··নিজের সম্পর্কে কেমন একটা উদাসীনতা পেয়ে বসে।

হঠাৎ পেছন থেকে কাঁধের উপর একটা থাপ্পড় পড়ে। বরফের উপর মুখ থুবড়ে পড়ে যাই। বন্দুকের বাঁটে লেগে থেঁতলে যায় মুখ। মুখে বরফ লেগে আবার চেতনা ফিরে আসে; পাশ ফিরে গড়িয়ে যাই। এডওয়ার্ড ধরে তোলে আমায়। রীতিমত জোয়ান সে। তার বলিষ্ঠ হাতের স্পর্শে মনে জোর পাই।

আঃ, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

এডওয়ার্ড তার আস্তিনে থুথু ফেলে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখি যে থুথুও সঙ্গে সঙ্গে জমে গেলো। মাথা ঝাঁকায় এডওয়ার্ড। বেজায় ঠাণ্ডা রাত, শীগগির আগুনের কাছে যাও।

থরথর কাঁপছে সে। একটা বিরাট ক্লান্ত কুকুরের মত পা বেঁকে গেছে তার। শিগগির আগুনের কাছে যাও। আবার বলে সে।
মাথা নেড়ে আমি রওনা হই। পেছন থেকে সে বন্দুকটা হাতে তুলে দেয়। বন্দুকটা হাতে নিয়ে আবার চলতে থাকি আস্তানার দিকে। বুক ফেটে কান্না আসে আমার···কিন্তু দুঃখের বিষয় সে অশ্রুকণাও জমে যায় চোখের পাতায়।
ফিলাডেলফিয়ার পথের সামনাসামনি পাহাড়ের মাথায় পেনসিলভানিয়ানদের ঘাঁটি। এরাই আমাদের প্রথম রক্ষা ব্যূহ। কারণ ফিলাডেলফিয়ার দিক থেকেই তো আক্রমণ আসবার সম্ভাবনা! দুই তিন সারে আমরা ব্যূহ তৈরী করি। আদ্ধেকটা মাটি খুঁড়ে এবং বাকী আদ্ধেকটা গাছের মোটা গুঁড়ি দিয়ে পরিখার আস্তানা তৈরী করা হয়। গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরী করা আগুনের চুল্লীতে পুরু করে কাদা লেপে দেওয়া হয়। প্রতিটি আশ্রয়ে দশ থেকে বারোজন সৈনিক। বেরোবার দরজা বনের দিকে। গাছপালায় তবু খানিকটা পশ্চিমা ঠাণ্ডা হাওয়া আটকায়। কিন্তু ঝড়ো হাওয়া আসে পূব দিক থেকে। গাছের গুঁড়ির ফাঁক দিয়ে আস্তানার গভীরে ঢুকে গা কামড়ে ধরে—হি হি করে কাঁপায়।
পরিখার ভেতরে ঢুকে আমি দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়াই। হাতের বন্দুকটা ফেলে দিই। ঠকাস করে শব্দ হয় নোংরা মেঝেয়। ক্ষীণ ধারায় আমার পা থেকে বরফ গলে জল গড়াতে শুরু করে। নিজের বাঙ্কের এক পাশে বসে আছে এলি, নিরীক্ষণ করছে আমাকে। জেকব বন্দুকটা তুলে নেয়, সযত্নে মুছে রেখে দেয় থাকে। এলি আমার কাপে বেশ খানিকটা 'রাম' ঢেলে দেয়।
শেষটুকু তোমায় ঢেলে দিলাম, আলেন।
ঢকঢক করে সবটা একবারে গিলে ফেলি। গলাটা জ্বলে ওঠে, কিন্তু পেটের ভেতর বেশ গরম অনুভব করি। আগুনের দিকে পা বাড়াতেই জেকব আমাকে ঠেলে সরিয়ে দেয়।
একদম জমে গেছে খেয়াল আছে?
ধপ করে বসে পড়ি মেঝেয়। সামনে পা ছড়িয়ে দিই। ক্রমে ক্রমে অসাড়তা কেটে যায়। হাতে পায়ে ঝিনঝিনে ব্যাথা অনুভব করি। উবু হয়ে এলি আমার পায়ের পট্টির উপরের ন্যাকড়া তুলতে শুরু করে। খোসা ছাড়াচ্ছে যেন।
ধরে-আনা মেয়েটিকে নিয়ে নিজের বাঙ্কে শুয়ে আছে চার্লি গ্রীন। লড়াই করবার আর মুরদ নেই তার। সঙ্গিনী ছাড়া চার্লির মত পুরুষের জীবনের আদ্ধেকটাই ফাঁকা। ঈশ্বর জানেন, কিসের তাড়নায় বোস্টনের ছাপাখানা ছেড়ে এই নরকের গর্তে এসেছে সে। চার্লির কথা মনে হবার সাথে সাথে বেঁটে মোটা বৌ আর বাচ্চাকাচ্চা পরিবেষ্টিত স্থূল চেহারার একটি লোকের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তার ভুঁড়ি অনেকদিন আগেই শুকিয়ে গেছে। চামড়া ঢিলে হয়ে ভাঁজ পড়েছে। এখন সে এই সঙ্গিনীকে নিয়ে শুয়ে আছে। নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছে। আমি আসবার পর নড়াচড়া করতে দেখিনি। কেনটন বসে আছে তার বাঙ্কের একপ্রান্তে। তার সঙ্গিনীও হাঁটু মুড়ে শুয়ে আছে তার পেছনে। পেনসিলভানিয়ার সেই মেয়ে সঙ্গিনীটি। পাতলা চেহারা হালকা চুল আর ফিকে নীল চোখ মেয়েটির। কথা বলে ওলন্দাজি ঢঙে। কিন্তু তার নজর সবাইএর দিকে। দশ জন পুরুষের সঙ্গে একই পরিখার আশ্রয়ে থাকতে হলে এমনতো হবেই। এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে ভ্যানডিয়ার।

আগের চাইতে অনেক বুড়িয়ে গেছে সে। মুখে হাসি নেই, কথা বলে অতিকম। হয়ত মনে মনে স্বপ্ন দেখছে কাঠ দিয়ে তৈরী একটি গ্রাম্য গীর্জার— ছয়টি নির্ঝঞ্ঝাট দিনের শেষে যথারীতি যেখানে রবিবার ঘুরে আসে। হেনরি ঘুমিয়ে পড়েছে। ব্রোন এখনও আছে পাহারার বিটে। বাকী লোকটি শীর্ণকায় অদ্ভুত স্বভাবের এক পোলিশ ইহুদি। ফিলা-ডেলফিয়া থেকে আসছে। লম্বা কোল কুঁজো লোকটির কটা চোখ দুটো কোটরাগত। সবে বছর খানেক আমেরিকায় এসেছে। ইংরেজী জানে না ; তবে ওলন্দাজ ভাষা বলতে পারে। আমাদের প্রায় সকলেই ওলন্দাজ জানে। কুঁজো হয়ে সে আগুনের কাছে বসে আছে ; শুধু ঠোঁট দুখানা নড়ছে আস্তে আস্তে।

ও প্রার্থনা করছে। কেনটন বলে,—আজকের রাতটা যে কি, তার কোন ধারণাই নেই ওর। মনে হয়, ঘাবড়ে গেছে। অসভ্য পৌত্তলিক।

জীবনে কোনদিন ইহুদি দেখেনি কেনটন।

এডওয়ার্ড তার আস্তিনে থুথু ফেলেছিল। আমি বলি। তিন গুণবার আগেই জমে গেল !

রাণ্ডিওয়াইনের এক জিপসির কথা মনে পড়ে। যুদ্ধের আগে আলাপ হয়েছিল তার সাথে সে এমনি প্রচণ্ড শীতের কথা বলেছিল।

এলি আমার পায়ের পট্টি খুলে ফেলে। উবু হয়ে বসে কাজ করবার সময় তার কাঁচা-পাকা লম্বা দাড়ি আমার হাতে লাগে। আস্তে আস্তে সে আমার পা টিপে দেয়। আমি লজ্জায় মুখ ঘুরিয়ে নি ; কিন্তু এলি পরম যত্নে পা টিপে যায়। মনে হয় যেন সে নিজের পা আরাম করে টিপছে।

ব্যাথা লাগছে ?

মাথা নেড়ে জানাই— না।

জেকব দাঁড়িয়ে দেখছে। ওস্তাদের মত লক্ষ্য করছে আমাদের। আস্তানাটি যেমন গরম তেমনি ছোট্ট। সারা ঘরে ভুর ভুর করছে মানুষের গায়ের ঘামের গন্ধ আর বদ্ধ উত্তাপ। শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়াও এঁকে বেঁকে ঢুকছে মাঝে মাঝে। চিমনি দিয়ে ভাল ভাবে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। কাঠের চালে নীলচে ধোঁয়া জমে রয়েছে। সব কিছু ছাপিয়ে উঠেছে বাজে রামের ঝাঁঝাল গন্ধ।

পা হলো মানুষের দেহের সামান্য একটা অংশ মাত্র। জেকব বলে।

কেনটনের সঙ্গিনী উঠে বসে। বলে, যা নোংরা পা তোমাদের! তোমারা কি মানুষ না আস্তাকুড়ের শূয়োর ?

চুপ কর মাগী! বেশী চোপা করিস না। ধমকে ওঠে জেকব।

কেনটন, এই কেনটন, শুনলে তো!

আড়মোড়া ভেঙ্গে হাঁদার মত হাসে কেনটন। নিরীহ আয়েসী লোক। চার্লি গ্রীনেরও ঘুম ভেঙেছে। বাঙ্ক থেকে ঘাড় বাড়িয়ে সে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়। তার সঙ্গিনী চেঁচিয়ে বলে, আচ্ছা পুরুষ মানুষ বটে তুমি। অসহায় মেয়েছেলে পেয়ে অমনিভাবে গালাগাল করে নিলে!

তাতে তোর কিরে শালী ? কেনটন বলে।

ঐ মাগীটা আমার দু'চোখের বিষ! বিড়বিড় করে বলে জেকব।

শুনলে তো কেনটন ?
তুমি এভাবে বলতে পার জেকব ! মৃদু প্রতিবাদ জানায় কেনটন।
হাত মুঠ করে চোখ পাকিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় জেকব। ওদের লক্ষ্য করছি আমি। গরমের আরামে কারও নড়বার সাধ্য নেই। এলি একমনে আমার পা টিপে যাচ্ছে ; মনে হয় যেন কিছুই তার কানে যায়নি। ইহুদি লোকটা মাথা হেঁট করে মাটির দিকে চেয়ে আছে।
আমার যা ইচ্ছে তাই বলব। জেকব বলে।
কেনটন এবার উঠে দাঁড়ায়। ভ্যানডিয়ার দুজনকে ঠেলে দুপাশে সরিয়ে দেয়।
তোমরা মানুষ নও, জানোয়ার। ভ্যানডিয়ার বলে। ঈশ্বরকে ভয় ভক্তি কিছুই কর না তোমরা।
আগুনের কাছে গিয়ে ইহুদিটির মুখোমুখি গুটি মেরে বসে জেকব। আবার বিছানায় এলিয়ে পড়ে কেনটন। তার সঙ্গিনী তাকে আদর করবার চেষ্টা করে, ঠেলা মেরে তাকে সরিয়ে দেয় কেনটন।
এলি আবার আমার পা বেঁধে দেয়।
ও. বেজায় শীত ! এডওয়ার্ড বেচারীর জন্য কষ্ট হচ্ছে আমার। এলি বলে।
দুই হাত তুলে মুখ হাঁ-করে আস্তানার মাঝখানে এসে দাঁড়ায় ভ্যানডিয়ার। তার চোখের চারপাশের ঢিলে চামড়ার ভাঁজ পড়ে। তারপর হটাৎ হাত নামিয়ে সে নিজের বাঙ্কে ঢুকে পড়ে। আগুনের কাছে বসান একটা পাত্র তুলে নিয়ে জেকব আমাকে খানিকটা ঝোল দেয়। রসিয়ে রসিয়ে খাই। গরম ঝোল বেশ লাগে।
হাড়ের কাঁপুনি তাড়ান বেজায় কঠিন। এলি বলে।
ইহুদিটি মুখ তুলে চায়, ওলন্দাজ ভাষায় বলে, সাইবেরিয়ার শীত এর চেয়ে আরও ভয়ঙ্কর।
সাইবেরিয়া কি ?
ওলন্দাজ ভাষা বোঝেনা গ্রীন ; কিন্তু সাইবেরিয়া কথাটা বুঝতে পেরেছে।
উত্তর এশিয়ায় বরফের দেশ একটা।
সেখানে ছিলে তুমি ? আমি জিজ্ঞাসা করি, অত দূরে গিয়েছিলে কেন ?
বোঝাতে চায় ইহুদিটি। কিন্তু অত দূরত্ব বোঝাবার ভাষা খুঁজে পায় না।
আমরা প্রায় দুহাজার জন গিয়েছিলাম সেখানে—জারের বন্দী হয়ে।
কোন দেশ থেকে ?
পোলাণ্ড থেকে।
আরে পোলাণ্ডের একটি লোককে আমি চিনতাম। জেকব বলে। সে ব্রুকলিন পাহাড়ে মারা যায়।
তুমি বুঝি ওখান থেকে পালিয়েছিলে ? কৌতূহলী এলি জিজ্ঞাসা করে।
হাঁ, পালিয়েছিলাম। কোট ও শার্ট খুলে সে বুকের পর ক্রুশের একটা পোড়া দাগ দেখায়। এই ভাবে ইহুদিদের তারা ছাপ মেরে দিয়েছিল। আমরা নাকি বিপ্লব সৃষ্টি করি। আমি পালাতে পেরেছি।
চোখ বুজে আমি এই দীর্ঘ পথ-চলার কথা কল্পনা করবার চেষ্টা করি। এ যেন সারা

দুনিয়া পাড়ি দেওয়া। মাথা তুলে আবার যখন তাকাই, ইহুদিটি তখন মাথা হেঁট করে ঠোঁট নাড়ছে।
আচ্ছা, কিসের জন্য ওখানে লড়ছিলে তোমরা ? ইংরেজীতে জিজ্ঞাসা করে এলি।
ইহুদিটি জবাব দেয় না। কেনটন বলে, আমরা কিসের জন্য লড়াই করছি তাই বল না এলি। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, এবারকার শীত কাবার হবার আগেই গোটা পল্টন মরে সাবাড় হবে। বার বার নিজেকে প্রশ্ন করছি—কেন, কিসের জন্য লড়ছি আমরা ? ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত ভাবে কোন রাগ নেই আমার। যুদ্ধের আগে এমন একজন ব্রিটিশও দেখিনি যে আমার কোন ক্ষতি করেছে। পাকা দুশো একর জমি ছিল আমাদের, বছর দুয়েকের মধ্যে নিশ্চয় আরও হাজার একর সাফ করতে পারতাম। কোনদিন কোন ট্যাকস্ দেইনি। তবু এলাম। নেহাৎ বোকা ছিলাম তাই! বাবাকে বল্লাম, বোস্টনের লোকজন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়বার জন্য পল্টন গড়ছে। আমিও যাব তাদের দলে। হো হো করে হেসে উঠলেন তিনি। বল্লেন, বোস্টনওয়ালাদের ভাল করেই চেনেন তিনি, আর ব্রিটীশদেরও লড়াই করতে দেখেছেন...দু'মাসের মধ্যে আডমস ও হানককৃকে ব্রিটিশরা ফাঁসিতে লটকাবে।
তাহলে মরতে এলে কেন ? জেকব জানতে চায়। দুহাতে মুখ লুকোয় কেনটন।
জেকব ঝাঁকি মেরে বলে, তোমার মত শূয়োরদের দিয়ে কোনদিন যে পল্টন গড়া যায় না, এ আমি হলপ করে বলতে পারি।
রাগারাগি করো না জেকব। ফিসফিস করে এলি বলে।
এমনি এক রাতে খ্রীস্ট জন্মেছিলেন। ছাড়াছাড়া ভাবে বলে ভ্যানডিয়ার,—আজাদীর নামে তোমাদের ঘাড়ে মেয়ে মানুষের ভুত চেপেছে। যত সব অনাসৃষ্টি কাণ্ড। একগুঁয়ে জেদী বদমাইশ তোমরা, ভগবানের বিচারে তোমাদের রেহাই নেই।
হয়েছে পাদ্রী সাহেব আর উপদেশ দিতে হবে না। খেঁকিয়ে ওঠে চার্লি।
কেনটনের সঙ্গিনী তারস্বরে বলে, এই পোড়ারমুখো মিনসে তুই চুপ কর। তোরা কি মানুষ ? নচ্ছার যত ভিখারির দল!
জেকব উঠে পড়ে। দরজার দিকে দুপা এগিয়ে তার তাক থেকে সে বন্দুক তুলে নেয়। তারপর কেনটনের বাঙ্কের দিকে ফিরে বলে, এই মাগী আবার যদি টু শব্দ করেছিস তো খুন করে ফেলব। ওকে চুপ করে থাকতে বল কেনটন। খানকী মাগীর বেয়াদপি আর সইব না।
চট করে লাফ দিয়ে উঠে জেকবের সামনে দাড়ায় এলি ; বন্দুকটা সরিয়ে দেয় একপাশে। কর্কশ গলায় ভ্যানডিয়ার বলে, রিপুকে বশে আনো, ক্রোধ-রিপুর বশে যদি রক্তপাত করতে চাও তো আমায় খুন কর জেকব।
কেনটনের সঙ্গিনী তখন গলা ছেড়ে কান্না জুড়ে দেয়। জেকবের হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেয় এলি। এলির কাছে কেঁচো হয়ে পড়ে জেকব। তবু তার ঠোট কাঁপছে। গত সপ্তাহের সমস্ত বিভীষিকা পুঞ্জীভূত হয়ে আজ ফেটে পড়েছে। এলি তাকে ধরে বাঙ্কের কাছে নিয়ে যায়।
ভুলে যেওনা জেকব, বহুদিন একসাথে আছি আমরা। মোলায়েম ভাবে বলে এলি।

সবাই চুপ করে থাকে। মনে হয়, সাময়িক উত্তেজনায় সবার দম ফুরিয়ে গেছে। কেনটনের সঙ্গিনী তখনও ফোঁপাচ্ছে; তবু কেনটন তাকে শান্ত করবার কোন চেষ্টা করেনি। দুই হাতে মুখ চেপে বসে আছে। আগুনের পাশে বসা ইহুদিটিও নিস্পন্দ।

বাইরে বাতাসের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। একটা নেকড়ে বাঘ ডেকে ওঠে—দীর্ঘ করুণ তার ডাক। সবাইর মুখের দিকে তাকাই...একগাল দাড়িওয়ালা লম্বা আকাটা চুল ভরতি মুখ। দেহের যত্ন বা পরিপাটি সম্পর্কে কোন খেয়াল বা হুঁস নেই এদের। শতছিন্ন জামা-কাপড় পরা একদল বিষাদময় শীর্ণ লোক গুটিসুটি মেরে বসে আছে উত্তাপের আশায়। এদের সঙ্গিনীদেরও আর স্ত্রীলোক আখ্যা দেওয়া যায় না! মনে মনে কথাটা ভাবি... ভাবতে হয়, অদ্ভুত লাগে। না হলে পাগল হয়ে যাব যে। মনে মনে ভাবি কোথাও নিশ্চয়ই সুবেশা সুন্দরী নারী আর পরিচ্ছন্ন পোষাকের সুপুরুষ আছে। নারীর দেহ সম্পর্কে যে কল্পনা এতদিন করে এসেছি আজকেও কল্পনার চোখে সেই মেয়েদের ভাবতে চেষ্টা করি...ধবধবে সাদা আর নিখুঁত ..

কেনটনের সঙ্গিনী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে, আমরা তোমাদের সঙ্গে এখানে আছি...যদি নরকে যাও, সেখানেও সঙ্গে আছি তবু...

কেউ জবাব দেয় না। কোন একটা কিছুর জন্য কান পেতে আছি আমরা। দীর্ঘ গভীর নীরবতায় মানুষ যেমন করে কান পেতে থাকে, তেমনি ভাবে উৎকর্ণ হয়ে আছি। বাইরে বরফের উপর পায়ের শব্দ হয়...পদধ্বনি এগিয়ে আসে দরজার কাছে।

জার্মান ছেলেটি এসেছে। এলি বলে,—ভেতরে আসছে না কেন?

খানিকটা অপেক্ষা করে আমি দরজা খুলে দিই। হুস হুস করে তুষারকণা ঢোকে ঘরে। তারপর টলতে টলতে একটি মানুষ প্রবেশ করে।

কে তুমি? জেকব পরিচয় জিজ্ঞাসা করে।

আমি চেপে দরজা বন্ধ করে দিই। লোকটি মাথা তোলে, আরে একটি মেয়ে। তখন বুঝতে পারি কম্বল মুড়ি দেওয়া একটি মেয়ে ঢুকেছে। তার খালি পা নীল হয়ে গেছে, ঠাণ্ডা লেগে ফেটেও গেছে জায়গায় জায়গায়।

হায় খ্রীস্ট! ফিস ফিস করে বলে গ্রীন।

কম্বলখানা পরে যায় হাত থেকে। প্রায় অর্ধনগ্ন সে। কম্বলের তলায় শুধু একটা পুরনো ব্রিচেস পরা। প্রচণ্ড শীতে নীল হয়ে গেছে মেয়েটি। একহারা পাতলা চেহারা...গাল বসা মুখ...তরুণীর মত ছোট্ট স্তনযুগ...মাথায় লম্বা কালো চুলের গোছা। এককালে স্বাস্থ্যবতী লাবণ্যময়ী ছিল বলেই মনে হয়। একদৃষ্টে মেয়েটি দিকে চেয়ে থাকি। আর সকলেও অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে। হেনরি লেনের ঘুম ভেঙে যায়। বাঙ্ক থেকে উঠে আসে। মেয়েটিব দিকে এগোতেই তার ঐ দাড়িওলা উসকো-খুসকো চেহারা দেখে পিছিয়ে আসে মেয়েটি। কম্বলটা তুলে নিয়ে তার গা ঢেকে দিই আমি। টলতে টলতে আগুনের কাছে গিয়ে গুটি মেরে বসে পড়ে সে।

তুমি কে, কোত্থেকে এলে মেয়ে? এলি জিজ্ঞাসা করে।

আমায় একলা থাকতে দাও এখন। সে বলে,—ঈশ্বরের দিব্যি, আমায় একটু একলা থাকতে দাও।

কেনটনের সঙ্গিনী বলে, আমি বলছি কে। ভার্জিনিয়া ব্রিগ্রেডের নামকরা রূপসী মেয়ে… নাম বেস্ কির্নাল।
দয়া করে আমাকে একলা থাকতে দাও।
জেকব উঠে পড়ে। সরাসরি মেয়েটির কাছে গিয়ে তার কম্বল টেনে ধরে সে। কর্কশ গলায় বলে, বেরিয়ে যা, বেরিয়ে যা বলছি মাগী।
ভ্যানডিয়ার যোগ দেয় তার সঙ্গে ঃ বেরিয়ে যাও, অনেক নচ্ছার মেয়ে আছে এখানে। তোমার জন্যে ভার্জিনিয়ানদের সঙ্গে হয়ত খুনোখুনি হবে এবার। খসে পড়ো!
ওকে একলা থাকতে দাও। আমি বলি। জেকবের সামনে যেয়ে দাঁড়াই।
সরে যাও ছোকরা! মেয়েটা মোটেই ভাল না।
ও থাকবে এখানে। জেকবকে বলি,—পা দিয়ে রক্ত পড়ছে ওর। এখানে এখন থাক, অন্তত গরম করে নিক পা'টা।
জেকব আমার ঘাড় ধরে ঘুষি বাগায়, কিন্তু এলির ধমকে থেমে যায়। থ' মেরে সে মেয়েটিকে দেখতে থাকে।
ওরা পাঁড় মাতাল হয়েছে। মেয়েটি বলে,—আমায় পেলে মেরেই ফেলবে। এই দ্যাখ! কম্বলখানা খুলে শরীরের আঘাত দেখায় মেয়েটি।
কেনটন খেঁকিয়ে ওঠে, পাঁড় মাতাল হয়েছে। কুইলার শালা হলফ করে বল্লে আর একটুও রাম নেই, তবু ভার্জিনিয়ানদের মাতাল হওয়া আটকাল না তো।
রসদখানার কর্তা হল কুইলার।
ওকে বের করে দাও…। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে ভ্যানডিয়র।
কেনটনের সঙ্গিনী চেঁচিয়ে ওঠে, তুমি এখানেই থাক বাছা! পারে তো আমায় বার করে দিক না। মানুষ হলে আজকের এই রাতে কুকুরকেও কেউ বার করে দিতে পারে না।
সহসা দরজাটা খুলে যায়। একটা লোক উঁকি মারে। ভার্জিনিয়ানদের লম্বা বাদামি শিকারীর শার্ট তার গায়ে। মাথা খালি। হাঁপাচ্ছে লোকটি। আরও জন কয়েক পেছনে রয়েছে। কারও কারও হাতে লম্বা রাইফেল। দরজাটা তারা খুলে রাখে—হু হু করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে ঘরের মধ্যে।
এই দরজাটা বন্ধ করে দাও। এলি বলে।
ওকে নিয়ে যেতে এসেছি...আমাদের সঙ্গিনী।
ভার্জিনিয়ার মেয়ে ও। পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে ওঠে।
আগে দরজাটা বন্ধ কর বলছি।
জাহান্নামে যাও! আমি বলি,—যে চুলোয় খুশী যাও, কিন্তু এখান থেকে এখুনি খসে পড়ো চাঁদ!
লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। আমি তার পথ রোধ করে দাঁড়াই। দৃঢ় মুষ্ঠিতে সে আমার মুখে ঘুষি মারে, চোখে অন্ধকার দেখি। তার পরেই জেকবের গম্ভীর গলার ধমকানি কানে আসে। নীচু দরজা দিয়ে ভার্জিনিয়ানটিকে বার করে দিচ্ছে সে। কেনটন ও ভ্যানডিয়ারকে নিয়ে এলিও তার পেছু পেছু যায়। আমিও উঠে পড়ে তাদের পেছু নিই। লেন আর গ্রীন আসে আমার সঙ্গে। ইহুদিটির দিকে একবার চোখ পড়ে, নির্বিকার হয়ে

সে আগুনের পাশে বসে আছে।
বাইরে হিম ঠাণ্ডায় বরফের উপর ছায়া-মূর্তির তুমুল মারামারি শুরু হয়। সোরগোলে নিখুঁত রাত্রির স্তব্ধতা ভেঙে যায়। পেনসিলভানিয়ার লোকজন ছুটে আসে তাদের আস্তানা থেকে। বন্দুক পরিণত হয় লাঠিতে, ছুরিও চলে।
চারিদিকে আওয়াজ ওঠে ঃ ভার্জিনিয়ানরা এসেছে হামলা করছে।
ভার্জিনিয়ানরা দলে ভারী নয়। বড় জোর জনা বারো। অনায়াসেই তাদের হটিয়ে দিই। আমাদের দলের সংখ্যাধিক্যে কাবু হয়ে পড়ে ওরা। হাঁপাতে থাকি আমরা। প্রচণ্ড শীতেও গরম বোধ হয়। পেনসিলভানিয়ানদের একজন বলে ওঠে, পাঁড় মাতাল ব্যাটারা।
আমাদের রামের বরাদ্দ জোটে না আর ভার্জিনিয়ান শালারা প্রাণভরে মাল গিলছে।
গজ গজ করতে করতে আমরা আস্তানায় ফিরে আসি। তবে এই মারামারি না হলে আমরা যে পাগল হয়ে যেতাম, একথা সবাই বুঝতে পারি। ভেতরের ক্ষোভ, ঘৃনা ও উত্তেজনা বেরোবার জন্য একটা লড়াইএর দরকার ছিল। দরজার কাছে আমরা জটলা করে দাঁড়াই। উত্তপ্ত দেহে আগুনের তাত লাগে। ইহুদিটি একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে, যেন আমাদের বুঝতে পারছে না, আমরা যেন তার বুদ্ধির বাইরের একটা জিনিস।
পেনসিলভানিয়ার লোক তোমরা ? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে,—আজকের রাতটা আমাকে এখানে থাকতে দেবে তো !
আমরা পেনসিলভানিয়ার লোক নই। জেকব বলে।
নাম কি তোমার ? আমি জিজ্ঞাসা করি।
বেস কিনলি।
আগুনের পাশে বসে শরীরটা তাতিয়ে নাও। আমি ওকে আশ্বাস দিই,—কেউ তোমাকে আগুনের কাছ থেকে তাড়াবে না।
আমি মেয়েটির দিকে তাকাই। চোখাচোখি হয়। চোখে চোখে অজানা কি কথা যেন বলাবলি হয়ে যায়। নিজেকে বেশ বড় বলে মনে হয় মনে হয় যেন আলাদা মানুষ আমি।
ও থাকবে, কেমন ? সঙ্গীদের জিজ্ঞাসা করি আমি।
হাঁ, আজকের রাত তো বটেই। এলি সায় দেয়।
আমি ওর কাছ ঘেঁষে বসি। মেয়েটি কিন্তু কোনো কথা বলে না। আবার তার মুখের দিকে তাকাই আর এই শিবির সঙ্গিনীর মনের রহস্য বুঝবার চেষ্টা করি। অবশেষে তাকে বিষণ্ণভাবে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমাদের শিবির ছেড়ে চলে যাচ্ছ না কেন ? বেরিয়ে যাচ্ছ না কেন এখান থেকে ?
কোথায় যাব ? জিজ্ঞাসা করে মেয়েটি।
কেনটনের সঙ্গিনী তখনও চাপা গলায় ফোঁপাচ্ছে। সবাই চুপ করে আছে। মাঝে মাঝে কেউ হয়ত আগুনে একখানা চেলা কাঠ ফেলে দেয়। পট পট শব্দ হয়।
বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে আমার। মেয়েটি বলে।
খানিকটা লাপসি দিলাম তাকে। দুহাতে কাঠের কাপ ধরে আস্তে আস্তে লাপসি খায় মেয়েটি। কেউ কথা বলে না। হেনরি লেন আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। গ্রীন ও কেনটন

হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যায়। মেয়েটি সম্পর্কে তাদের আগ্রহ মিটে গেছে।
শীতে নীল হয়ে আস্তানায় ফেরে এডওয়ার্ড। তুষারকণা ঝেড়ে ফেলে গা থেকে। থমকে দাঁড়িয়ে সে মেয়েটির দিকে তাকায়। জেকব বলে, আলেনের সঙ্গিনী। এই আমাদের নীতিবোধ। বছরের পর বছর গীর্জার কাঠের শক্ত মেঝেয় প্রার্থনা করবার এ-ই পরিণতি! বিয়ে না করেই মেয়েটি এক মুহূর্তে আমার হয়ে গেল। ভগবানের নামে একটি কথাও কোন লোক উচ্চারণ করল না। যেহেতু আমরা পছন্দ হয়েছে তাই সে আমার। মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে মেয়েটি তাকায়। তার কালো চোখের উজ্বল শাণিত দৃষ্টি আমার বিদ্ধ করে। কিছুই বলি না আমি। এলি সব ঘটনা জানায় এডওয়ার্ডকে।
ভার্জিনিয়ার লোকগুলো ভারী পাজি—বেজায় নিষ্ঠুর। এডওয়ার্ড বলে। অবশ্য এ মেয়েটাও পুরোদস্তুর খানকি। ও কি আশা করেছিল যে ভার্জিনিয়ানরা ওকে আদর যত্ন করবে।
এই মুখ সামলে কথা কও, আমি চেঁচিয়ে উঠি।
ভার্জিনিয়ানদের আমি সমর্থন করছিনে আলেন।
ব্রোন কোথায়? এডওয়ার্ডকে জিজ্ঞাসা করে এলি,—এতক্ষণে তার আসা উচিত ছিল।
তাকে দেখিনি তো! এডওয়ার্ড বলে,—আমি ভেবেছি, সে ফিরে এসেছে।
ভুলেই গিয়েছিলাম। আমি বলি,—শীতে কাবু হয়ে পড়েছিল ছেলেটি। একদম ভুলে গিয়েছিলাম তার কথা।
উঠে দাঁড়িয়ে কোটটা গায়ে জড়ায় এলি। জেকব বলে, এই বোকার মত এখন বাইরে যাচ্ছ কেন!
আমিও উঠে কোটটা গায়ে জড়িয়ে নিই। ক্লান্তিতে অবসন্ন আমি, তবু ব্রোনের ব্যাপারটা জানি তো। মনে মনে ওর অবস্থা বুঝতে পারি।
এলির পেছন পেছন বেরিয়ে পড়ি। জেকবও আসে আমার পেছনে। কেউ কোনো কথা বলে না। পাহাড়ের কোল পেরিয়ে আস্তানা থেকে অনেকটা দূরে হেঁটে যাই। তারপর গালফ্ রোডের দিকে নেবে চলি। ব্রোন যে পথে গেছে, বরফের উপর তা বার করা খুবই সহজ। সেই পথ ধরেই চলেছি আমরা। পদচিহ্নের শেষাশেষি এসে খানিকটা দূরে বরফের পর দুটো দাগ নজরে পড়ে।
বন্দুকটা আনা উচিত ছিল; কাতর কণ্ঠে বল্লাম,—বন্দুকের কথা তোমারও তো মনে হওয়া উচিত ছিল এলি।
আমরা তারাতারী করে ব্রোনের কাছে যাই। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে জেকব।
বাঘের কাজ! সে বলে।—নিশ্চয় বাঘের কাজ! আবার বলে ওঠে কাতর কণ্ঠে। শেষের দিকে গলাটা বুজে যায়,—ছেলেটি এত দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে কোন বাধাও দিতে পারেনি।
আজ রাত্রেই সে বলছিল……
টের পায়নি। এলি বলে।—এখানে ঘুমিয়ে পড়েছিল। আমরা ওকে ঘিরে বসি। আমাদের নিশ্বাসে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। মনে হয় যেন মোম জ্বালান হয়েছে। এলি আমায় সরিয়ে দেবার চেষ্টা করে; তবু দেখতে হয় আমাকে।
ওকে নিয়ে যাব। এলি বলে।

কিন্তু মেয়েরা……

তাহলেও একবার আগুনের কাছে নিয়ে যাব ওকে। এলি বলে। এমন ভাবে সে আমাদের দিকে তাকায় যে আমরাও ঘাড় নেড়ে সায় দিই ওর কথায়।

আস্তানায় ফিরে ক্ষতবিক্ষত লাসটি শুইয়ে দেওয়া হয়, আগুনের কাছে। গম্ভীর ভাবে বলে এলি,—আগুনের খুব কাছে শুইয়ে দাও ওকে।

ইহুদিটি এবার উঠে দাঁড়ায়। দুনিয়ার সব দুঃখ যেন তার মুখে ভর করেছে। মাথাটা নীচু করে নীরবে সে মাথায় হাত দেয়। মেয়েরা কান্নাকাটি শুরু করে।

আমরা ব্রোনের চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াই। হাঁটু ভেঙে বসে ভ্যানডিয়ার। বলে, ঈশ্বর আমাদের ক্ষমা কর! আজকের রাতটার জন্য ক্ষমা কর। হাঁটু ভেঙে বসে সে প্রার্থনা করতে থাকে, প্রার্থনা করতে করতে সে এমন সব কথা বলে, যা শুনবার সুযোগ বহুদিন আমাদের হয়নি। সহজ সরল ভাবে আস্তে আস্তে দরদ দিয়ে সে প্রার্থনা করে।

শীত

১৭৭৮ সালের জানুয়ারির মাঝামাঝি দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দিল। তিনদিন পেটে কিছু পড়েনি। কোন খাবার জোটেনি আমাদের। খাদ্য বলতে যা বোঝায়, তেমন কিছুই খেতে পাইনি আমরা।

বরফ জমে জমে পরিখার চাল পর্যন্ত উঁচু হয়েছে—দশ পনর ফিট পুরু হয়েছে উপত্যকার মধ্যে। প্যারেড ড্রিল সব বন্ধ। কোন রকম কুচকাওয়াজ হচ্ছে না দু'হপ্তা ধরে। এদিকে গুজব যে পল্টনের বেশীর ভাগ লোক উধাও হয়ে গেছে। কি জানি! গুজব পরখ করবার কোনো উপায় নেই। ধীরে ধীরে শক্তি কমছে আর বৃদ্ধের মত কোন রকমে ঝিমিয়ে ক্লান্ত-ভাবে চলছি। শান্ত্রীদের জন্য বরফ কেটে পথ তৈরী করা হয়েছে। পাহারা দেবার কথা উঠলেই মেজাজ খারাপ হয়ে যায়, খিস্তি করি। তবু এই পাহারাদারির জন্যই এখনও পাগল হয়ে যাইনি।

আজ আমরা বিছানায় শুয়ে আছি। গুটিসুটি মেরে আছি গরম হবার জন্য। আগুনেরও তেমন তাত নেই। শুধু কেনটনই বসে আছে আগুনের খুব কাছে—একটা কবিতা খোদাই করছে বারুদ রাখার শিঙের উপর। আগুনের শিখায় চিকচিক করছে তার মস্তবড় শিকারের ছোরাখানা···কোনমতে ছোরা চালাচ্ছে হাতের থাবায় ধরে। কয়েক মাস ধরে প্রায়ই সে এই কবিতাটি এবং 'প্রসারিত হাত দিয়ে শিংএর প্রান্ত জড়িয়ে-ধরা একটি শিশু' এই ছবিটা খোদাই করতে লেগে আছে। খোদাই করতে বসলেই সে সব কিছু ভুলে যায়। শুধু মনে থাকে, গ্রীষ্মকালে সে এই কাজে হাত দিয়েছে। কখন-সখন চার্লিকে দু'একটা বানান জিজ্ঞাসা করে। লেখাপড়ার কাজে বা বানান করতে তেমন ওস্তাদ সে নয়।

এলি রসদখানায় গেছে। তার জন্য অপেক্ষা করছি আমরা। আগুনের শিখায় আস্তানার মাঝামাঝি পর্যন্ত আলোকিত। সব কটি বাঙ্ক অন্ধকারে ঢাকা।

বেসকে পাশে নিয়ে স্বপ্নাবিষ্টের মত শুয়ে আছি। চেঁচিয়ে উঠছি মাঝে মাঝে। বেস ধাক্কা দিয়ে বলছে—আলেন! আলেন! কি বলছ?

জানিনা কি বলেছি। স্বপ্নের খানিকটা মনে করবার চেষ্টা করি। ওকে বলি, আমার মায়ের নাম আন্না। আমাদের যদি সন্তান হয় তো তার নামও রাখব আন্না।

মেয়ে? বেস জিজ্ঞাসা করে।

প্রথমে ছেলে, তারপর মেয়ে।

আবার ঘুমিয়ে পড়ি। একটু বাদেই ঘুম ভেঙে যায়। উদভ্রান্তের মত বেসের দেহ হাতড়াই। চীৎকার করে বলি, তবে রে বজ্জাত খানকি, আবার তোকে ভার্জিনিয়ানদের কাছে ফিরে যেতে হবে। আমার স্ত্রী হবার যোগ্যা তুই নস্!

আলেন, কি বলছ তুমি?

আবার চোখ বুজি। মাথাটা এমন হালকা লাগে যে মনের খেই হারিয়ে ফেলি। চিন্তার

কোনো যোগসূত্র থাকে না, মনে হয়, সর্বত্রই আছি আমি। শাস্ত্রী হয়ে পাহারা দিচ্ছি বরফের মধ্যে, আবার সেই সঙ্গে শুয়ে আছি মোহকের গভীর উপত্যকার নিবিড় বনানীর মধ্যে। হাত দিয়ে বেস আমায় আশ্বস্ত করবার চেষ্টা করে···ছেঁড়া জামা কাপড়ের উপর দিয়ে খুঁজে বেড়ায় আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ···আমার দাড়ির জট খুলে দেয়।

একটু বাদেই আবার ঘুমিয়ে পড়ি। গভীর ঘুমে স্বপ্ন দেখি আচ্ছন্ন হয়ে। স্বপ্নে দেখি আমি যেন শিশু। সেদিন যেন কোন এক গরম দিনের রোদে ঝলমল প্রভাত। পশ্চিম দিকে চলেছি আমরা। কতদূর থেকে যে আসছি স্বপ্নের শিশুটির তা খেয়াল নেই। পূর্বে অনেক দূর থেকে আসছে হয়ত। হয়তবা কনেকটিকাট থেকে। চারখানা গাড়ি। কাঠের তৈরী সেকেলে সরু ঘোড়ার গাড়ি। হিকরি কাঠের বাঁকান গোঁজ দিয়ে তৈরী চালের খাঁচা, বাদামি ক্যানভাসে মোড়া। রাস্তা খারাপ। উচুঁনিচু এবরো খেবরো। গাড়িগুলো গড়াচ্ছে আর ঝাঁকানি খাচ্ছে। ভয় হয়, যে কোন সময় ভেঙে যেতে পারে। যে করেই হোক, গাড়ি ক'খানা যেন আস্ত থাকে। অনেকক্ষণ আস্ত রয়েছে।

আমি যেন প্রথম গাড়িটার পেছনে পা ঝুলিয়ে বসে আছি। তপ্ত রোদ পড়েছে মুখে। মিঃ এপ্লাই হলেন দ্বিতীয় গাড়ির চালক। আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসছেন। কখন-সখন লম্বা চাবুক তুলে ঘোড়া হাঁকাচ্ছেন। চেঁচিয়ে বলছেন, হল তো আলেন!

দুজনেই হেসে উঠি। চাবুকটা আমাদের মধ্যে মামুলি রসিকতার জিনিস। ভগ্নস্বাস্থ্য বুড়ো মানুষ মিঃ এপ্লাই। উঁচু সিটে বসবার সময় লম্বা বন্দুকটা সব সময় তার হাঁটুর উপর থাকে। গাড়ি যে ভাবেই টাল খাক না কেন, হাঁটু থেকে বন্দুক পড়বে না। মা চেঁচিয়ে ওঠেন, আলেন! গাড়ির মধ্যে এসে বসো লক্ষ্মী! না হলে মিঃ এপ্লাইর ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে যেতে পার।

সপাং করে আবার চাবুকের বারি পড়ে। আধ-ঘুমে আমি স্বপ্নটা আঁকড়ে থাকতে চাই···চাই রোদের তাত। যখন বুঝতে পারি স্বপ্ন ভেঙে গেছে, তখনও চোখ বুজে থাকি। চোখে মুখে রোদের তাত অনুভব করবার চেষ্টা করি।

ঘুম ভেঙে গেলে শিশুর মত গভীর ভালবাসা নিয়ে বেসের দিকে পাশ ফিরি। নারীর প্রতি পুরুষের ভালবাসার চাইতে এ ভালবাসার ধরণ আলাদা। এ আমার বেঁচে থাকার প্রক্রিয়া, আমেজের উৎস। ক্ষীনবল মুমূর্ষু লোকের পক্ষে এটা তুচ্ছ অবলম্বন নয়। কোন অনুযোগ করে না সে। আগেও কোনদিন করেনি। জানি, সেও মরতে চলেছে। তবু এও জানি, আমি মরবার আগে সে মরবে না।

যুদ্ধ বাঁধবার মুখে ভার্জিনিয়ার এক চাষীর ছেলেকে বিয়ে করে বেস। মরগানের রাইফেল বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে কুইবেক অবধি বেস স্বামীর অনুসরণ করবার চেষ্টা করে। তারপর সে পেছনে পড়ে যায়···ফিরে আসে বোস্টনে এবং কিছুদিন বাদে শুনতে পায় যে তার স্বামী কুইবেক অবধি পৌঁছোতে পারেনি। তখন সে ম্যারিল্যাণ্ডের এক গণফৌজের দলে ভীড়ে যায় এবং বাঁচার তাগিদে শিবির-সঙ্গিনী হয়ে পড়ে। ব্যাপারটা না বুঝবার মত কঠিন নয়। আস্তে আস্তে সে আমাকে নিজের কাহিনী শুনিয়েছে। কণ্ঠস্বর শুনে বিশ্বাস করেছি তার কথা।

আমি কোন কথাই তোমার কাছে লুকোই নি আলেন। তবে একদিন আমি ভাল মেয়ে

ছিলাম। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, সত্যিই ভাল মেয়ে ছিলাম একদিন। জ্ঞান আলেন, আমার বয়স মাত্র উনিশ বছর। এর মধ্যেই কখন যেন পুরোদস্তুর বেশ্যা বনে গেছি। আমাকে ভালবাসবার কোন টান্‌ই আর হয় তুমি বোধ কর না, না আলেন ?
দুজনেরই চোখে জল আসে—দুর্বলতার অশ্রু। উভয়ে উভয়কে আঁকড়ে ধরি। প্রাণপনে আমার নোংরা দেহটা জড়িয়ে ধরে থাকে সে। যে ভাবে আমি কাঁদি, কোন পুরুষ অমন করে কাঁদবে না। প্রতিবার কান্নার পরেকার ঘুম শান্তির প্রলেপ দিয়ে যায়।
বহুবার বলা কথাই বারবার সে বলে। পুরোনো দিনের কথা, ভবিষ্যতের কথা। এ সম্পর্কে দিবারাত্রি স্বপ্ন দেখি আমরা।

এডওয়ার্ডের কথা মনে পড়ে। আটদিন আগে সে পল্টন ছেড়ে চলে গেছে। শুধু বলে গেছে, মোহক যাচ্ছি। নিজের বন্দুকটা নিয়ে যখন সে চলে যায়, কেউ কোন কথা বলেনি। কেউ ডেকে ফেরায়নি তাকে। পাকাপোক্ত জোয়ান সে।—নিশ্চয় হেঁটে মেরে দেবে। এলি বলে। ক্ষ্যাপার মত চটাচটি করে জেকব। জেকব ছাড়া আর কারও বিপ্লবে আস্থা নেই। আমরা সকলেই বিপ্লবকে ঘৃণা করি এখন…ফৌজদারদের ঘৃণা করি…আর ঘৃণা করি পরস্পরকে। কিন্তু জেকবের আস্থা এখনও অটুট আছে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, মানুষে অনেক কিছুর অংশ হতে পারে কিম্বা গোটা একটা জিনিস হতে পারে। শুধু একটি মাত্র জিনিসে যারা বিশ্বাস করে, তারা মশালের মত চিরকাল কিন্তু জ্বলে না। ভয়-দুর্বলতা মুক্ত জেকবকে চিনতে একথাটা মনে রাখা দরকার। স্ববিরোধিতা আছে বলে ফৌজদারদের ঘৃণা করে সে। গভীর চিন্তাশীল লোক সে নয়। তার বিশ্বাস সহজাত। সে বিশ্বাস করে—সাধারণ মানুষ এক। ফৌজদাররা জনতার লোক নয়। নিজেদের তারা আলাদা করে রাখে। তাই সে ঘৃণা করে তাদের। তবু সে সমস্ত কার্য অব্যবস্থা সইছে, কেননা বিপ্লবের নেতৃত্ব তাদের হাতে। তাহলেও কিছুতেই সে স্বীকার করে না যে নেতৃত্ব করলেও ফৌজদাররা এই বিপ্লবের অংশ। দুর্বলতাকে আরও বেশী ঘৃণা করে সে। মানুষের জীবনের কোন মূল্য নেই তার কাছে। বিপ্লবই সব কিছু। এডওয়ার্ড তার বন্ধু। বহু বছরের বন্ধুত্ব তাদের। তবু সে দুর্বলচিত্ত—বিপ্লবের চাইতে নিজের কথাই বেশী ভাবে। এই জন্যই এডওয়ার্ডকে অনবরত গাল-মন্দ করছে। কিন্তু মনে হয় সে আর বেঁচে নাই।
ক্ষ্যাপার মত রাগারাগি করে জেকব। তারপর যখন হাঁপিয়ে পড়ে, আগুনের পাশে বসে ডুকরে কাঁদতে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুকনো ফোঁপানি চলে।
ভয় না পেলে আমিও এডওয়ার্ডের সঙ্গী হতাম। কিন্তু দূরত্বের কথা ভেবে ঘাবড়ে যাই আমি।

ম্যাকলেনের লোকজন এডওয়ার্ডকে ধরে আনে। মাইল খানেকের বেশী যেতে পারেনি। বরফের উপর তাকে দেখতে পায়। ক্যাপ্টেন মুলার আমাদের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করে, দল ছেড়ে পালাচ্ছিল নাকি ?
ও তো মরে গেছে, তাই না ? বিড়বিড় করে জেকব বলে,—এখন আর ওর কথা ভেবে লাভ কি ? ওর মনুষ্যত্ব খতম হয়ে গেছে।
শিকার করতে গিয়েছিল। মিথ্যে করে বলে এলি।

বরফের উপর একলা যে লোকটা মারা গেছে তার জন্য এলি মিথ্যে কথা বলতে পারে।
আমরা ওকে কবর দিতে যাই। কুঁকড়ে শক্ত হয়ে আছে এডওয়ার্ড। কাঠের মত শক্ত হয়ে গেছে ওর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ।
নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিল। এলি বলে,—ভালই হয়েছে, টের পায়নি। ঘুমের মধ্যে মারা যাওয়া ভাল।
বেসকে জিজ্ঞাসা করি, বল কোথায় যাব আমরা ?
মরণের ভয় আমি করিনে আলেন। কিন্তু যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও···
আস্তানায় ফিরে আসে এলি। দরজা বন্ধ করে টলতে টলতে সে আগুনের কাছে যায়। এলির শক্তির পরিমাপ করা যায় না। এ তো দৈহিক শক্তি নয়। আগুনের পাশে বসে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।
বিছানা ছেড়ে আমরা তাকে ঘিরে বসি। মরা মানুষের মত কোটরগত আমাদের চক্ষু। জামার তলায় হাড় দেখা যায়। এলি আমাদের দিকে তাকায় কিন্তু কথা বলে না।
জেকব বলে—খাবার এনেছ এলি ?
আমি তার ঘরে ঢুকলাম। এলি বলে,—কি চমৎকার পাথুরে ঘরে থাকে সেনানীরা! ও সব ঘরে ঢুকলে বাইরের ঝড় বা ঠাণ্ডা টেরও পাওয়া যায় না।
আমি অবস্থাটা কল্পনা করবার চেষ্টা করি। সেনানীদের আস্তানা মাইলখানেক দূরে। অতটা দূর যাওয়া-আসার মেহনতের কথা উপলব্ধি করবার চেষ্টা করি। তিনদিন কিছু খায়নি এলি। এডওয়ার্ড বরফের পর মাইল খানেক হেঁটেছে, তাতেই মরা এডওয়ার্ডকে নিয়ে আসতে হয়েছে। আর এলি ফিরে এসে আগুনের কাছে বসেছে।
জাহান্নামে যাক শালারা। আমি বলি।
বল্লে, আজকে রাতেই একখানা রসদ বোঝাই ট্রেন আসবে। রেজিমেণ্ট ও কোম্পানীর নাম টুকে রেখেছে।
জেকব কর্তাদের গালমন্দ করে। পায়চারি করতে করতে গলা ছেড়ে খিস্তি-খেউর করে। শেষ অবধি তার খিস্তি-খেউড়ে আস্তানা গমগম করতে থাকে।
ঢের হয়েছে। ক্লার্ক খেঁকিয়ে ওঠে,—এ পাপের শাস্তি, বুঝলে ? তোমরা মানুষ নও। সবাই সাচ্চা মানুষ হলে এ দুর্ভোগ ভুগতে হত না। এ পাপের শাস্তি। যেমন কর্ম, তেমনি ফল! মেয়েছেলে নিয়ে বেহায়ার মত বসবাস করে যাচ্ছ, কোন লজ্জা ঘেন্না নেই। মাগী নিয়ে সবার সামনে খেলা করছ কিন্তু তার জন্য কোন সঙ্কোচ বোধ করছ না। ভগবানকে সবসময় গালাগাল দিচ্ছ, তাই তাঁর অভিশাপ নেমে এসেছে তোমাদের মাথায়। স্বাধীনতার আদর্শকে তোমরা দেবতার আসনে বসিয়েছ ; কিন্তু সে আদর্শ আজ ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। আলেন ছোকরা একটা খানকি মাগী কোলে করে শুয়ে আছে। তোমাদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে কেনটন ভোগ করছে তার মাগীটাকে। চার্লসের এমন স্বভাব যে ভগবানের মুখ ফেলে সে মাগীর বুকের দিকে তাকাবে। নিজেদের মধ্যে হামেশা খুনোখুনি কেলেঙ্কারী লেগেই আছে! ভগবানকে ডাকছি, তিনি যেন তোমাদের এই পাপের শাস্তি দেন। ঊর্ধে বাহু তুলে হাঁটু ভেঙে বসে পড়ে ক্লার্ক। তার মুখ হঠাৎ ফ্যাকাশে হয়ে যায়··· মরা মানুষের মত বিবর্ণ হয়ে যায় পরক্ষণে। একটু বাদেই সে মেঝেতে নেতিয়ে পড়ে।

এলি তাকে উঁচু করে ধরে তুলবার চেষ্টা করে। বলে, একটু ধর না আলেন। ধরাধরি করে তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হয়। চোখ বুজে আছে ক্লার্ক—শ্বাস বইছে ঘন ঘন। জেকব তাকে ডেকে কথা শোনাবার চেষ্টা করে। সহসা শান্ত হয়ে পড়ে সে।
ক্লার্ক শুনছ, তোমার কথা আমরা মেনে চলব! বুঝলে?
আমি বেসের কাছে ফিরে যাই। ফুঁপিয়ে কাঁদছে সে। ডুকরে কাঁদছে কিন্তু দাপাদাপি করছে না। ধরা গলায় আমাকে বলে, আমি খারাপ মেয়ে নই আলেন! কিন্তু ও আমাকে অভিসম্পাত দিল—ভগবানকে শাস্তি দিতে বল্ল!
না না, কে বলেছে তুমি খারাপ মেয়ে! তুমি খারাপ মেয়ে নও! আমি বলি।
আর আমার ঘুম হবে না আলেন। যদি মরে যাই, তাহলেও শান্তিতে ঘুমোতে পারব না।
নীচু হয়ে আমি তাকে চুমু খাবার চেষ্টা করি; কিন্তু সে আমার মুখ সরিয়ে দেয়।—আমায় চুমু দিওনা আলেন।
চার্লি গ্রীনের সঙ্গিনী খেঁকিয়ে ওঠে, আমাকে শাপ দেবার কি অধিকার আছে ওর! ও কে? বিটলে মিনসে পাদ্রী না হাতি।
আঃ চুপ কর না আন্নি! চার্লি বলে।
আমি বেসের হাত ধরি। হাত খানা উলটে চেপে ধরি নিজের ঠোঁটে। বলি. তুমি ঘুমোও··· চুপ করে ঘুমোও!
তারপর ক্লার্কের দিকে ফিরি। জেকব তার বাঙ্কে শুয়ে পড়েছে। কখানা হাড় নেতিয়ে আছে বিছানায়। এলি ভ্যানডিয়ারের বিছানার পাশে দাঁড়ান। ইহুদিটি তার পেছনে। তার জরাকীর্ণ কুঁজো চেহারাও আমাদের যে কারও মত নোংরা এবং অস্থিসার। তবু সে আলাদা।
এলি বলে, ওর জন্য আমার শঙ্কা হচ্ছে আলেন। একজন ডাক্তার হলে ভাল হয়।
ক্লার্কের দিকে তাকাই। বিছানায় নেতিয়ে পড়ে আছে। শ্বাস প্রশ্বাসে ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে। প্রচুর ঘামও হচ্ছে। চোখ দুটো বিস্ফারিত।
পেনসিলভানিয়ার আস্তানায় কোন ডাক্তার নেই। হাসপাতাল থেকে এখন কোন শালা আসবে না।
তাহলে চল সেইখানেই নিয়ে যাই,—এলি বলে।
আমি মাথা ঝাঁকাই। আমি পারব না এলি! শরীরে একটুও বল পাচ্ছি না।
আস্তানাব চারদিকে তাকায় এলি। দেখি, তার উসকোখুসকো দাড়িওলা মুখ আস্তে আস্তে ঘুরছে। জেকবকে দিয়ে কোন কাজ হবে না। চার্লি গ্রীন অসুস্থ—নড়বার শক্তি নেই। হেনরি লেনের পায়ে মস্তবড় দগদগে ঘা। কেনটন এমনভাবে আগুনের পাশে ঝিম ধরে বসে আছেই যে ভ্যানডিয়ারের চেঁচামেচি যেন তার কানেই যায়নি।
এই তুমি যাবে? ইহুদিকে জিজ্ঞাসা করে এলি।
আমি যাচ্ছি এলি! নিশ্চয় যাব। আমি বলি।
যেখানে যা পাওয়া যায় তাই আমরা গায়ে জড়িয়ে নি। চার্লির সঙ্গিনী একখানা কম্বল আর একটা সায়া দেয়। অর্ধ-নগ্ন অবস্থায় সে চার্লির গা ঘেঁসে শুয়ে থাকে। আমাকে কাছে ডেকে নেয় মেয়েটি। বলে, যদি জ্ঞান ফিরে আসে তো ওকে শাপটা তুলে নিতে বল।

দূর, শাপটাপ কিছু নয়। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে এলি।
তিনজনে ধরাধরি করে ক্লার্ককে বয়ে নিয়ে চলি। এলি আমি আর ইহুদিটি। হাড়ের উপর চামড়া ছাড়া কিছুই নেই তার শরীরে। ওজন বড়জোর নব্বই কি একশো পাউণ্ড হতে পারে। তবু এটুকু বোঝাও আমাদের পক্ষে এখন দুর্বহ। কিছুতেই ধরে রাখতে পারছি না। বাইরে বেরিয়ে আমরা তুষারপাতের মধ্য দিয়ে চলবার চেষ্টা করি। বৃষ্টিও পড়ছে তুষারের সঙ্গে। এ যেন জলার মধ্য দিয়ে চলা…প্রতি পদে পা আটকে যাচ্ছে জলকাদায়! কিছুক্ষণ পরপরই হচ্ছে…দম নিয়ে নতুন করে হাঁটবার বল সঞ্চয় করতে হচ্ছে। রসদখানায় যেতে আসতে এই পথেই তো দুই মাইল হাঁটতে হয়েছে এলিকে! তবু ফিরতে হয়েছে শূন্য হাতে। আবার সে চলেছে আমাদের সঙ্গে। এমন কি আছে এলির মধ্যে? মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে আমি বুঝবার চেষ্টা করি। কোত্থেকে সে এত শক্তি পায়? আমরা সবাই শীর্ণ, কিন্তু এলি শীর্ণতর। আমাদের পায়ের অবস্থা খারাপ বটে, কিন্তু এলির পা তো পচা মাংসের পিণ্ড! তবু এলি হাঁটবার সময় ব্যথা পাচ্ছে বলে তো মনে হয় না। কারও কোনও কাজ করবার দরকার পড়লে তো এলি করে দিচ্ছে। যখন শক্তিশালী লোকের দরকার, এলি কোত্থেকে যেন শক্তি সংগ্রহ করে। জেকব এলির মত নয়। জেকব আগুনের শিখা; কিন্তু এলি আত্মিক শক্তির আধার। জেকবের বুকে ঘৃণার বহ্নিজ্বালা, আর এলি প্রেমময়। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, যখন সব কিছু চুকে যাবে, তখনও বেঁচে থাকবে এলি। জেকব বিপ্লবের আগুনে নিঃশেষে পুড়ে যাবে কিন্তু এলি বেঁচে থাকবে তখনও।
হাসপাতাল পৌনে এক মাইলের পথ। পাহাড় বেয়ে উপত্যকার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে আছি আমরা। হু হু করে বাতাসের ঝাপটা এসে লাগছে। এ মুলুকে হাওয়া বইলেই এখানে লাগবে। পেছন ফিরে আমি পরিখার আশ্রয়গুলোর দিকে তাকাই। সব কটা যেন বরফের ঢিবি। জীবনের সাড়া নেই কোনখানে। চিমনির মুখে ধোঁয়া পর্যন্ত নেই। মনে ভাবি, ব্রিটিশরা এখন যদি ফিলাডেলফিয়া থেকে মার্চ করে আমাদের আক্রমণ করে তো কি হবে? অনায়াসে পরিখায় ঢুকে যেতে পারবে। কেউ বাধা দেবে না কি প্রতিরোধ করবে না। এক মগ গরম ঝোলের বিনিময়ে এই অর্ধনগ্ন ভিখারীগুলো অনায়াসে তাদের মান ইজ্জত বিকিয়ে দেবে। একটি গুলির আওয়াজও হবে না। ভাল খেতে দেবে আমাদের। তারপর যার যার বাড়ি ফিরে যাব। বরফের সাদা ঢালের দিকে চেয়ে থাকি। সবটা ঠাহর করে উঠতে পারিনা। কেন তাহলে আসছে না ব্রিটিশরা? কেন চুকিয়ে দিচ্ছে না সবকিছু ঝামেলা?
আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছি। বেলা পড়ে গেছে। অন্ধকার হয়ে আসছে ইতিমধ্যে। আমি মাথা হেঁট করে চলেছি; কিন্তু এলি আমাদের পথ দেখিয়ে নিচ্ছে। যখনই তার দিকে তাকাই, দেখি মাথা উঁচু করে পথ খুঁজছে। ইহুদিটির ফ্যাকাশে সাদা চেহারা কুহেলিকা-ময়। হঠাৎ আমার কেমন মনে হয় যেন ঘোর অন্ধকার পথে চলেছি…পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা বরফ ঘেরা অন্ধকার পথ। মাথাটা কেমন হালকা লাগে। নিজের পা বা ভ্যানডিয়ারের ওজন কিছুই অনুভব করতে পারি না।
দম নেবার জন্য আবার কিছুক্ষণ থামা হয়। রাস্তার ওপারে জয় পাহাড়ের ঢালুতে একটি শান্ত্রী নজরে পড়ে। অর্ধচন্দ্রাকার এক ছাউনির তলায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা

কামানের মুখ দেখা হচ্ছে। পুত্তলিকার মত দাঁড়িয়ে আছে শান্ত্রীটি।
এই পথটা দিয়ে তাড়াতাড়ি যাওয়া যাবে। এলি বলে।
আঁকাবাঁকা পথ ধরে আমরা হাসপাতালের দিকে এগোতে থাকি। টানা লম্বা একখানা কাঠের ঘরে হাসপাতাল। দরজার পাশে দাঁড়ান শান্ত্রীটি আমাদের দিকে ফিরেও তাকায়নি মনে হয়, এমনি দৃশ্য দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।
এলি দরজায় ধাক্কা মারে। এক অফিসার দরজা খুলে দেয়। দাড়ি গোঁফ কামান লম্বা লোকটি। তার কাঁধে পদমর্যাদার প্রতীক চিহ্ন। আমি তাকে চিনিনা।
কে তোমরা ? সে জানতে চায়।
আমরা পেনসিলভানিয়ার ব্রিগেডের লোক। সঙ্গে রোগী আছে।
তোমাদের দলে তো ডাক্তার আছে। নাকি নেই ?
ডাক্তার না কচু আছে! নেই যে তা মশাই ভাল করেই জানেন। আমি খেঁকিয়ে উঠি।
কথা বলবার সময় একটু ভদ্রভাবে বলবে খোকা! না হলে চাবকে শিখিয়ে দেওয়া হবে।
গোল্লায় যাও! আমি বলি,—দিব্যি করে বলছি, গোল্লায় যাও!
অপরাধ নেবেন না স্যার! এলি অনুনয় করে বলে,—আধা-উপবাসী আমরা—হাঁটবার শক্তি নেই।
বেশ বুঝতে পারি যে আমাদের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার এখন করা উচিত মনে মনে তার আঁচ করছে অফিসারটি। যে আধা মানুষদের তারা পরিচালনা করছে ইদানিং অফিসার মহলে তাদের সম্পর্কে খানিকটা বিস্ময় সৃষ্টি হয়েছে।
কুচকাওয়াজ বন্ধ। লেফটান্যান্ট ও ক্যাপ্টেনরা মাঝেসাঝে দেখাশোনা করে যাচ্ছে। এদের পরিদর্শনের মধ্যেও অনেক দিনের ফাঁক থাকে। পাহাড়ের উপর একটি শান্ত্রী বন্দুকে ভর করে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। তার গায়ে সঙ্গীদের দেওয়া জামা কাপড় জড়ানো। যে যতটা দিতে পারে তাই দিয়ে দিয়েছে। জানোয়ারের মত আমাদের গর্ত থেকে বেরুতে দেখে তাদের মনে হরেকরকম আজগুবি চিন্তার উদয় হয়। বাইরের প্রচণ্ডতম শীতের শঙ্কাতেই এই অর্ধ মানুষগুলো এখনও একসাথে আছে। এই ভয়ের সঙ্গে জুটেছে দুর্বলতা। দুর্বলতার দরুণ তারা বহু দূরের বাড়ির পথে পা বাড়াতে সাহস পায় না। তবু এদের হাতে বন্দুক আছে। অফিসারদের দিকে বন্দুক ঘুরিয়ে একসাথে যদি এরা বেরিয়ে পড়ে তো সব চুকেবুকে যাবে।
আমাদের নিরীক্ষন করে অফিসারটি লক্ষ্য করে দেখে যে আমরা নিরস্ত্র। বলে, হাসপাতাল এখন ভরতি। কোন বেড খালি নেই। ভারনামের হাসপাতালে চেষ্টা করে দেখ। ভারনামের হাসপাতাল এখান থেকে কমসে কম মাইল খানেক দূরে।
এলি কোন কথা বলে না। শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে তার পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সামান্য সামান্য ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ওলন্দাজ ভাষায় আমস্টারডমের ঢঙে ইহুদিটি বলে, সাথীকে মরবার মত একটু জায়গা দিন। শত্রুদেরও তো এ জায়গা দিয়েছি আমরা! ওর মুখে সামান্য কিছু গরম খাবার ঢেলে দিন।
ফৌজদারটি ওলন্দাজ ভাষা জানে না। ইহুদিটির অদ্ভুত উচ্চারণ ভঙ্গীতে তা আরও দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। ইংরেজিতে বল। খেঁকিয়ে ওঠে অফিসার। পল্টনে তোমাদের জাতের লোক

অনেক আছে।
আর এক মাইল হাঁটবার শক্তি আমাদের নেই। অতদূর যেতে পারব না আমরা। আমি অনুনয় করে বলি। অনুনয় করবার জন্য ঘৃণা হয় নিজের উপর।
শীতে জবুথবু হয়ে শান্ত্রী দুটি চেয়ে আছে। তাদের দাড়িতে শ্বাস-প্রশ্বাসের জমাট ফেনা। মনে হয়, নড়বার ক্ষমতা নেই। অবাক হয়ে ভাবি, এক এক করে ক্লার্কের মত এইখানে এমনিভাবে আসতে আমাদের আর কতদিন বাকী! গোঙাচ্ছে ক্লার্ক। কথাও বলছে। কিন্তু প্রলাপ।
এখন আর এক মাইল হাঁটতে পারব না। আমি বলি,—অতটা দূরে যেতে পারব না।
আপনাদের মেঝেয় একটুখানি জায়গা করে দিন। এলি বলে,—মেঝেয় ছ ফিট জায়গা দিলেই হবে। লোকটাকে আর কিছুক্ষণ এখানে রাখলে শীতে জমে যাবে।
ফাঁসির মঞ্চেও ছ'ফিটের বেশী জায়গা তোমাদের লাগবে না। এ শালা নিশ্চয়ই নিউইয়র্ক শহরের লোক কিম্বা ইংরেজের সন্তান। নাকি সুরের কথা বলার ঢঙেই বোঝা যায়।
আমরা ভেতরে যাচ্ছি। এলি বলে। তার সঙ্গে চোখাচোখি হয় আমার। ভয়ে আঁতকে উঠি। আমি জানি, একবার যদি এলি চটে যায় তো সে নিজেও বাঁচবে না, আর যে তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াবে তারও নিস্তার নেই। আমি চেঁচিয়ে বলি, শূয়োরটা গোল্লায় যাক এলি! চল আমরা অন্য হাসপাতালে যাই!
ভ্যানডিয়ারকে নিয়ে এগিয়ে যায় এলি। আমরাও যাই ওর সঙ্গে সঙ্গে। আমি তাদের থামাবার চেষ্টা করি। অফিসারটির কোমরে তরোয়াল। মুঠোয় হাত দেয় সে!
বেঁটে একটি লোক তখন পেছন থেকে অফিসারকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। বেঁটে লোকটির কোমরে রক্ত-ছিটান লম্বা একখানা ছাই রঙের এপ্রন জড়ান···চোখে চশমা···দাড়ি গোঁফ কামান · লম্বা সরু নাক এবং টুকটুকে লাল পুরু ঠোঁট লোকটির! তার পাতলা চুল মাথার পেছনে জড়ো হয়েছে।
কি হচ্ছে মারপিট? ধমকে ওঠে লোকটি,—রোগী রয়েছে এদের সাথে দেখছ না।
হাসপাতালে জায়গা নেই।
আমার হাসপাতালের ব্যাপারে নাক গলাতে এস না। ওকে ভেতরে নিয়ে এস।
অফিসারটি তখন বেঁটে লোকটির দিকে কটমট করে তাকায়। ডাক্তার তার শাসানির পরোয়া না করে পেছনে ফিরে হাসপাতালের মধ্যে ঢুকে যায়। আমরা তখন ভ্যানডিয়ারকে নিয়ে ভেতরে যাই। কাঠের বেড়া দেওয়া ঘরখানা বড় জোর বিশ হাত লম্বা। তাহলেও শ'খানেক লোক আছে এর মধ্যে। লম্বালম্বি একটানা বিছানায় শুয়ে আছে।
কেউ কেউ ঘুমোচ্ছে। কিন্তু বেশীর ভাগ রোগীই কাতরাচ্ছে। জায়গাটা ভারী ঠাণ্ডা। বিরামহীন কাতরানি কানে আসে। একটু বাদে ওতে আর কিছু এসে যাবে না।
আমাদের এখানে বড্ড গাদাগাদি। ডাক্তার বলে,—রোগী আসছে আর যাচ্ছে। প্রায় সমান সমান। জননী বসুন্ধরার চাইতে আমাদের এ জায়গা মোটেই বেশী গরম নয়। পেছন দিকে বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট জায়গায় সে আমাদের নিয়ে যায় এবং হাতের ইশারায় ভ্যানডিয়ারকে বিছানায় শুইয়ে দিতে বলে। তাকে শুইয়ে দিয়ে আমরা তার গায়ের ঢাকা খুলে ফেলি। ছোট্ট একটা লোহার উনুন আছে ঘরে। ভীড় করে তার কাছে দাঁড়াই।

উঃ কি নোংরারে বাবা। কি করে যে তোমাদের একজনও বেঁচে আছে ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। নোংরা—নোংরা ! তোমরা দাড়ি কামাও না কেন বলত ? সে যাক, একে একবার দেখা যাক ! বলত কি হয়েছে এর ?

কঠোর মর্মান্তিক ভাষায় আস্তে আস্তে এলি তাকে সব কথা খুলে বলে।

জানি হে, জানি ! এলির কথা শেষ হবার আগেই মাথা নেড়ে বলে ডাক্তার,—জানি এমনি অবস্থায় মানুষ পাগল হয়ে যায়। কিন্তু এ রোগ সারাবার ওষুধ তো আমার জানা নেই ? কি আশা কর তোমরা। একজন সুস্থ মস্তিকের লোকও যে এখানে আছে এতেই তো আমি অবাক হয়ে যাই। যদি কেউ থাকে তো আমি তাদের একজন। কিন্তু আমিও আর বেশী দিন থাকতে পারব না। কি করতে পারি আমি ? পারি আমি এর মধ্যে জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে ? আমি কি ভগবান ?

ইহুদিটি মোলায়েমভাবে বলে, সাত্যই আপনি দেবতা। জানেন, সবাই দেবতা ছিলাম আমরা। এ আস্থা রাখতে হবে যে আমাদের অন্তরে ভগবান রয়েছেন। আগেও উপবাস করেছি। সাইবেরিয়ায় হেঁটে যাবার পথে দু'হাজার লোককে মরতে দেখেছি। মানুষের দেবত্বের পর নিশ্চয় আস্থা রাখতে হবে। তাহলেই মৃত্যুভয় জয় করা যায়। দেবতা ছেড়ে যাবেন, মৃত্যু সম্পর্কে এইটেই সব চাইতে বড় ভয়।

ডাক্তার চশমা খুলে ফেলে। এপ্রনে চশমা মুছে ওলন্দাজ ভাষায় জিজ্ঞাসা করে, কে তুমি ?

পোলাণ্ডের একজন ম্লেচ্ছ ইহুদি। আমি বলি।

তুমি কি স্পিনোজার[১] দর্শন পড় ? জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার।

আপনি কি এই ভাবে ওকে মরতে দেবেন ? ক্লার্ককে দেখিয়ে সে বলে।

ঠিক আছে, গামলাটা এদিকে দাও। এলি এগিয়ে ধরে। ডাক্তার ক্লার্কের হাত খুলে ফেলে ...আস্তে আস্তে শীস দিতে থাকে, শিরা পরীক্ষা করে। এক টুকরো নেকড়া নিয়ে সে হাতখানা ধুয়ে যতটা সম্ভব পরিচ্ছন্ন করে দেয়। গজ গজ করে বলে, চান করবার জো আছে ! বরফের মত ঠাণ্ডা এই নরককুণ্ডে হাসপাতাল বানিয়েছে ! আমিও তোমাদের মত নোংরা। মলাটটা চোস্ত হলে কি হয়, ভেতরে তোমাদের মত নোংরা। ভ্যানডিয়ারের হাত থেকে ক্ষুদে একটা জিনিস খুটে আনে ডাক্তার।—দেখছ ? উকুন। তোমরা সবাই উকুনের ডিপো। আমি কি করব ?

ছুরি হাতে নিয়ে সে ভ্যানডিয়ারের হাতের একটা শিরা কেটে দেয়। তারপর হাতখানা মেলে ধরে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ে গামলার মধ্যে। কালচে লাল রক্ত। যে রকম আস্তে আস্তে রক্ত আসছে তাই দেখে মনে হয়, ক্লার্কের শরীরে বেশী রক্তও নেই ! এলিকে জিজ্ঞাসা করে ডাক্তার, কদিন আগে খেয়েছে ?

তিনদিন খাওয়া জোটেনি। কারও না।

আবার শীস দেয় ডাক্তার।

বড্ড দুর্বল, এ ভাবে রক্ত পড়তে থাকলে মারা যাবে। এলি বলে।

১। স্পেনের ইহুদী দার্শনিক। মৃত্যু ১৬৭৭। এক অভিন্ন অনন্ত অদ্বৈত সত্তায় বিশ্বাসী। ব্যক্তি সত্তা, বস্তু ও মন তাঁর মতে একই মূল সত্তার পরিবর্তনশীল বৃত্তির প্রকাশ মাত্র।

আর কি করতে পারি ? আমি ভগবান নই, তা তোমাদের ঐ ইহুদি যাই বলুক না কেন !
জ্ঞান ফিরে না আসা অবধি ঐভাবে রক্ত ঝরাতে হবে। ও বাঁচবে না কিছুতেই।
ক্লার্কের হাত থেকে ঐভাবে রক্ত পড়তে দেখে অবাক আগ্রহে আমরা তার বিছানার চারপাশে ভীড় করে দাঁড়াই। ক্লার্ক কথা বলতে শুরু করে। এলির খোঁজ করে। ওস্তাদ হাতে চটপট রক্তের প্রবাহ বন্ধ করে দেয় ডাক্তার। আঙুল দিয়ে টিপে শিরাটি জোড়া দিয়ে সে চটপট পট্টি বেঁধে দেয়।
এই তো আমি রয়েছি ক্লার্ক। এলি বলে।
জেকব কোথায় ?
তোমার কথায় তার মন ভেঙে গেছে। আসবার শক্তি ছিল না। আমরাই তোমাকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি ক্লার্ক !
কে কে এসেছে ?
আমি, আলেন আর ইহুদিটি।
পাপের বোঝা। আলেনের মাথায় পাপের বিরাট বোঝা। ও যাতে ঐ মাগীটাকে ছেড়ে দেয় তার জন্য অনুরোধ করবে এলি ?
এলি জবাব করে না।
বল, অনুরোধ করবে তো ? ক্লার্ক চেঁচিয়ে ওঠে !—আমি তো মরতে চলেছি !
এলি রাজী হয়। আমি বলি ঃ ক্লার্ক, তুমি আমায় অভিসম্পাত দিচ্ছ ? কিন্তু আমি ওকে ভালবাসি !
আমাকে কথা দাও আলেন।
মাথা নেড়ে আমি সম্মতি জানাই। এলি মুখ ফিরিয়ে নেয়, ক্লার্ক চোখ বোজে।
ওকে ঘুমোতে দাও। ডাক্তার বলে,—আমার সঙ্গে এস।
পেছনের দিকে একটা ঘরে নিয়ে যায় আমাদের। একখানা টেবিল, একটা বিছানা এবং একটা অগ্নিকুণ্ড আছে সে ঘরে। আগুনের কয়লা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। টেবিলের উপর একখানা কাঠের পিরিচ রেখে সে কয়েক টুকরো ঠাণ্ডা মাংসভরা একটা পাত্র বার করে।
খুব বেশী নেই, বুঝলে !
মাংস দেখে আমি লোভার্ত হয়ে পড়ি। এলি নড়ে না। ইহুদিটির মুখে ম্লান হাসি।
এ দিয়ে তো তো আর গোটা পল্টন খাওয়ান যাবে না ! এলি বলে।
মহৎ হবার চেষ্টা কর না। ডাক্তার বলে ওঠে,—তোমার পেট ভরবে তো ! তারপর ইহুদিটির হাসি দেখে বলে ঃ গোল্লায় যাও, নোংরা ভিখিরী যত ! ফাঁসিতে লটকাবার জন্যও ইংরেজরা তোমাদের মত নোংরা লোকের গায়ে হাত দেবে কিনা সন্দেহ।
আমরা চুপ করে থাকি।
খানিকটা রাম খাও। ডাক্তার বলে। তিনটি ছোট কাপে রাম ঢেলে বলে, এইটুকু না খেলে আর প্রাণ নিয়ে আস্তানায় ফিরতে হবে না !
রামে তিনজনেরই শরীর চাঙা হয়—নেশাও হয় খানিকটা। পেটের মধ্যে রামের ঝাঁঝ এবং বাইরে অগ্নিকুণ্ডের উত্তাপে বেশ আরাম লাগে। ডাক্তার চেয়ারে বসে আছে—অদ্ভুত জন্তুর নমুনা হিসাবে নিরীক্ষণ করছে আমাদের। তারপর ইহুদিটিকে লক্ষ্য করে ওলন্দাজ ভাষায়

বলে, এখানে তোমরা আর আমরাই সভ্য। কুসংস্কার অজ্ঞতা আর নোংরামিভরা এই অসভ্যের দেশে একমাত্র তোমরা আর আমরাই সভ্য। মাত্র একটা জিনিস এরা বোঝে। পরস্পরকে ঠকাবার ও খুনোখুনি করবার স্বাধীনতা চায়…ইংরাজদের অধীনতা থেকে মুক্তি চায়। মানে, ঠকানো, জোচ্চুরি আর ঘৃণা করবার অবাধ অধিকার চায়—দেশটাকে অজ্ঞতা ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে ডুবিয়ে দেবার অবাধ সুযোগ চায়। বোকা বলে আমি এদের সঙ্গে জুটেছি। কিন্তু তুমি এসেছ কেন?

ইহুদিটি ঘাড় ঝাঁকানি দেয়।

নিজের জাত ভাইদের জন্য একটা স্থায়ী বাস ভূমির স্বপ্ন নিয়ে এসেছ, কেমন তো!

সমস্ত মানুষের জন্য নতুন দেশ পত্তন করতে এসেছি।

তা দেশটাও তো মস্ত! হতে পারে। কিন্তু কি জান, ইয়োরোপের কথাই বলো কি এখানকার বলো মানুষ সর্বত্রই এক রকম। যদি এরা জেতে, অবিশ্যি তার কোন আশাই নেই, তবু এরা যদি জেতে তো তোমাদের তাড়িয়ে দেবে। তোমরা ইহুদি—ম্লেচ্ছ!

না, না, তা দেবে না। ইহুদিটি মোলায়েম ভাবে বলে, বলতে গেলে গোটা দুনিয়া পাড়ি দিয়ে এসেছি আমরা…

বিতাড়িত হয়ে, কেমন তো!

না না, আমরা এখানে এসেছি সমস্ত মানুষের জন্য দেশ গড়বার স্বপ্ন নিয়ে। এ হবে নতুন পৃথিবী। পুরনো জগতের দিন ফুরিয়েছে। আরও কিছু সময়…হয়ত আরও দু'তিন শো বছর লাগবে। কিন্তু এর মধ্যে নতুন জগতের মানুষ তৈরী হবে। এই তো সবে শুরু। পণ্টন কিছুই না—শুধু একটা স্বপ্ন বই নয়! বুঝলেন? পণ্টন চলে যায়, কিন্তু স্বপ্ন মরে না। ফিলাডেলফিয়ায় একটা লোকের বাড়িতে ছিলাম। সে-ই হচ্ছে এই বিপ্লবের স্রষ্টা। এর নাম হেম সলোমন। সেও আসছে পোলাণ্ড থেকে। পোলাণ্ড আমাদের পক্ষে ইস্কুলের মত। পোলাণ্ড লড়াই করে যাবে কিন্তু স্বাধীন হবে না। ওটা স্কুল। মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন সফল করতে হয় তো ঐ দেশই তার উপযুক্ত স্থান।

আড়চোখে আমাদের দিকে তাকায় ডাক্তার,—এ বড় সুবিধের দেবতা নয়। এস, এ নিয়ে আলোচনা করা যাক। শুধু খেয়ে পরে যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, তেমন খাওয়া-পরা বাদ দিয়েও বাঁচা সম্ভব নয়। খাবার নেই। এ শীত আমি কাটাতে পারব না। যদি তোমাদের স্বপ্নের দেশ গড়তে পার তো সন্তান-সন্ততিদের এই অবিশ্বাসী বিজ্ঞানীর কথা বল। বল, সে বলত, এই সব আজে বাজে কথা!

আবার আমরা ক্লার্কের কাছে ফিরে আসি। তখনও ঘুমোচ্ছে সে। দাড়ির ফাঁকে যতটুকু মুখ দেখা যায় তা বরফের মত সাদা।

বেঁচে উঠবে কি? এলি জিজ্ঞাসা করে।

কি করে বলব বলো? ডাক্তার বলে ওঠে,—তাছাড়া, কি এসে যায় তাতে? তোমাদের কারও চাইতে খুব বেশী দূরে যাবে না।

তখন আমরা ক্লার্কের গায়ে জড়ান কোট দুটো এবং সায়াটা তুলে নি। একটা কোট এলিকে আর একটা ইহুদিটিকে দিয়ে দি। সায়াটা আমি গলায় মাথায় জড়িয়ে নি। তারপর তিন জনেই বেরিয়ে পড়ি। মুখে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা লাগে—ছুরিতে কেটে যাচ্ছে বলে মনে হয়। মামুলি

কৌতূহল বশে আমি জামার আস্তিনে থুথু ফেলি। আর দু'জন লক্ষ্য করে আমাকে। অবাক হয়ে লক্ষ্য করে। এক গুণতে না গুণতেই থুথুর ছোট ছোট গোল ছিটেগুলো তুষার কণার সঙ্গে মিশে যায়।
বাব্বাঃ। ফিসফিস করে বলে এলি।
এত ঠাণ্ডা জীবনে দেখিনি। এলি কানাডায় গেছে। শীতকালে আমিও হাডসন নদীর উজানে পাহাড়িয়া অঞ্চলে বাস করেছি। তীব্র ঠাণ্ডা পড়তে দেখেছি। কিন্তু এমন শীত কোন কালেই দেখিনি। এলিও দেখেনি এমন দুরন্ত শীত। সর্বপ্রকার আশ্রয়হীন এই গ্রহের বুকে প্রচণ্ড হিমধারা নামছে। এ ঠাণ্ডা যেন জীবন্ত আর হিংসুটে—মানুষের দেহ মন ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে। গোটা আমেরিকার অধিবাসীদের জীবনে শীতের এমন দুরন্ত প্রকোপ কেউ কোনদিন দেখেনি। কারও মনে পড়ে না এমন প্রচণ্ড শীতের কথা।
শুকনো বালির মত তুষারপাতের মধ্য দিয়ে পথ করে সন্তর্পনে চলেছি আমরা। এক পা এগোই আর সেইখানেই অপর পা রেখে আবার পা বাড়াই। রাত হয়ে গেছে কিন্তু আকাশে চাঁদ নেই। নক্ষত্রগুলো মাণিকের মত মিটিমিটি জ্বলছে। সাদা থানের মত বরফ জমে আছে। কোথাও কোন পাহারাদার শান্ত্রী নেই। আমরা ছাড়া বাইরে কোন প্রাণী নেই।
পেনসিলভানিয়ানদের আস্তানায় ফিরে যেতে একটি ছোটখাটো পাহাড় চড়তে হবে। শ'দুই ফিট উঁচু। কিন্তু এই পাহাড়ে চড়া না চড়ার সঙ্গে জীবন-মৃত্যুর প্রশ্ন জড়িত। ঢালু পাহাড়ের গা যেন নরকের পথ। এক পা এগোই আর হোঁচট খাই ; আবার দু পা পিছিয়ে টাল সামলে নিতে হয়। পা পিছলে বরফের পর গড়াগড়ি খেতে হচ্ছে। জামা কাপড়ের প্রতিটি ভাঁজ ও ফুটোর মধ্যে বরফের কুচি ঢুকছে। থুথু করে মুখ থেকে বরফের গঁুড়ো ফেলে দিচ্ছি আর ঠাণ্ডায় জমে ঠোঁট দুখানা অসাড় হয়ে যাচ্ছে। একটু বাদে আবার উঠে দাঁড়াই এবং এগিয়ে চলি। আর ভাবতে পারি না। মনটা কেমন যেন বিকল হয়ে যায়। দেহটা তবু চলে। দেহটা যেন আমি ছাড়া আলাদা একটা যন্ত্র। জীবনের বাতি যতদিন নিভে না যাবে ততদিন চলতে থাকবে।
একবার পেছন ফিরে তাকাই। ইহুদিটি বরফের উপর শুয়ে আছে, নড়ছে না। এলি আমাকে ডাক দেয়। কিন্তু বাতাসের ঝাপটায় তার কথা শুনতে পাই না। আমি ওদের চাইতে উপরে দাঁড়ান। এলি ইহুদিটির কাছে ফিরে যায়। আচমকা আমার সম্বিত ফিরে আসে। মনে মনে ভাবি. দশ পা নীচে নাবা মানে আবার দশ পা ওঠা। বার বার মনে হয় কথাটা। অনেক কথাই তখন মনে ভীড় করে। আমি কাঁদতে শুরু করি। কিন্তু অশ্রুকণাও চোখের পাতায় জমে যায়।
এলির কাছে ফিরে আসি। ইহুদিটি বলে, আমাকে ছেড়ে যাও। আমাকে খুঁজে বার করতে ওদের খুব দেরী হবে না।
আমরা তাকে দাঁড় করাই এবং তিনজনে এক সঙ্গে চলতে থাকি। সীমাহীন রাত্রির অসীম পথে তিনজনেই একসাথে হেঁটে চলি। আমি নিজে সময় ও গতির সমস্ত বোধশক্তি হারিয়ে ফেলি। পথ দেখিয়ে চলবার মত যে কোন একজন লোক একান্ত প্রয়োজন।
অবশেষে আস্তানায় ফিরে আসি। তিনজনেই ধপ করে বসে পড়ি মেঝেতে। ইহুদিটি সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে। চোখ টান করে। বিভীষিকাময় দৃষ্টিতে এলি চেয়ে থাকে আগুনের

দিকে । আমি কাঁদতে শুরু করি ।
বেস আমার হাত ঘষে দেয়, আমাকে চুমু খায় এবং নানাভাবে আমার শীত তাড়াবার চেষ্টা করে। টেনে আমাকে সে আগুনের কাছে নিয়ে যায়। দূরাগত কথার মত শুনতে পাই, ক্লার্কের কথা জেকবকে বলছে এলি।
তারপর বিছানায় শুয়ে পড়ি। বেস আমাকে গরম করবার চেষ্টা করে চলে। বেশ জানি, তারও সামান্যই শক্তি আছে। তবু তার আপ্রাণ চেষ্টা দেখে অবাক লাগে। থর থর করে কাঁপছি, অস্ফুট একটা শব্দ হচ্ছে ঠোঁটে। ঠোঁট কেটে গেছে এবং রক্ত ঝরছে তখনও। বেস বলে, বিশ্রাম কর, বিশ্রাম কর সোনা।
হাত দিয়ে আমি তার গরম শরীর আর স্তনযুগল চেপে ধরি। প্রাণের পরশ পাবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠি। জীবনের অনুভূতি লাভের জন্য বেসকে সজোরে আঁকড়ে ধরি।
আর এই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ি। কিন্তু স্বপ্নের ঘোরে ঘুম ভেঙে যায়।
তন্দ্রার ঘোরে বলে উঠি, ক্লার্ক আমায় শাপ দিয়েছে···সে মরতে চলেছে···না না না তোমাকে তাড়াতেই হবে। সে আমাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছে।
বেস ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে। অমন ভয়ার্ত চীৎকার আমি জীবনে শুনিনি।
আমি তাকে সান্তনা দেবাব চেষ্টা করি। কানে কানে বলি, ও কিছু নয়, স্বপ্ন দেখছিলাম। কিন্তু তার ঘুম টুটে যায়। বেশ বুঝতে পারি যে শীতের রাতের ভয়ে এবং আমাকে ছেড়ে যাবার শঙ্কায় সে আকূল হয়ে পড়েছে।

তবু আমরা বেঁচে থাকি। দিন যায়, দিনের পর দিন চলে যায়··দিবারাত্র মিশে এক কুৎসিত একঘেয়েমি সৃষ্টি করে, তবু অনুভূতি হীন ভাবে প্রাণে বেঁচে থাকি। এই সময় এক অদ্ভূত জিনিস টের পাই। মানুষের শক্তি সম্পর্কে নতুন অভিজ্ঞতা জন্মে। মনে হয়, স্তরে স্তরে সাজান মানুষের জীবনীশক্তির একটার পর একটা স্তর যদি কেড়ে নেওয়া যায়, এমনকি সব কটি স্তর সরিয়ে নিলেও যেন তলা থেকে নতুন সঞ্জীবনী শক্তি উদয় হয়ে জীবন বাঁচিয়ে রাখে।
তাই বেঁচে আছি আমরা। কতদিন চলে যায় মনে নেই, দিনকাল সময়ের কোনো বোধ নেই। আমাদের আস্তানায় এক নতুন সঙ্গী আসে। তার নাম মেয়ার স্মিথ। এককালে ফিলাডেলফিয়ায় হোটেলওয়ালা ছিল। ইহুদিটি অসুস্থ। মস ফুলারের কথা মনে পড়ে। ইহুদিটিও তারই মত অনবরত খকখক করে কাশে।
এলি বলে, ঠাণ্ডা লেগে হয়েছে। ঠাণ্ডা লেগে ফুসফুস জমে গেছে। ঐ যে সাইবেরিয়া না কি বলেছে, হয়ত সেইখানেই লেগেছে। ফুসফুস একবার জমে গেলে আর কোনদিন অ সারে না।
ওব খকখক করে কাশের শব্দ ভুলে থাকবার জন্য আমরা জটলা করে বসি। ইহুদিটির দিকে চেয়ে বাঙ্কের উপর তার অস্থিসার খাঁচার দিকে তাকালে আপনা থেকেই এমন চ্ছবি কথা মনে জাগে, যা আমরা কেউ-ই ভাবতে চাইনা।
খ্রীস্টও ইহুদি ছিলেন। জেকব বলে। কথাটা জেকবের মুখে অদ্ভূত শোনায়।

ইহুদিটির নাম আরন লেভি। তার সঙ্গে সবাই সদয় ব্যবহার করি। আমাদের নিজেদের কথা আলাদা। আমরা সবাই এই দেশের জল-হাওয়ার মানুষ। কিন্তু ইহুদিটি এসেছে দূর দুরান্ত থেকে। এই দূরত্বের ব্যবধান আমাদের দূরে সরিয়ে রাখে। একান্ত নিঃসঙ্গ সে। তার নিঃসঙ্গতা আমাদের ব্যথা দেয়। ঘুমের ঘোরে সে এমন ভাষায় কথা বলে যার এক বর্ণও আমরা বুঝি না।

স্মিথ এখানে আসবার দু'দিন বাদেই টের পায় যে লেভি ইহুদি। বলে, খুনী ইহুদিদের সঙ্গে কিছুতেই আমি একঘরে থাকব না। যে খানকির বাচ্চারা খ্রীস্টকে খুন করেছে, কিছুতেই তাদের সঙ্গে থাকব না।

জেকব তার গলা টিপে প্রায় মেরে ফেলবার উপক্রম করে। টেনে আমরা তাকে সরিয়ে দিই। এরপর সাতদিন পর্যন্ত স্মিথের গলায় জেকবের আঙুলের দাগ দেখা গেছে। জেকব আমাদের ছেড়ে দেবার অনুরোধ জানায়। বলে, ওকে খুন করলে কোন পাপ হবে না। ওর চাইতে অনেক ভাল ভাল লোককে মরতে দেখেছি।

স্মিথ ভড়কে যায়। লাফ মেরে বন্দুক রাখার তাকের কাছে গিয়ে বন্দুক হাতে করে সে জেকবের দিকে রুখে এগোয়। তারস্বরে বলে, খুন করব তোকে। সরে যাও তোমরা। গায়ে হাত দিয়েছে যখন, তখন ওর রক্ষা নেই।

এলি এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নেয়। এক মোচড় দিতেই সে ছেড়ে দেয়। এলি শান্তভাবে বলে, ভারী বদমেজাজী ছোটলোক তো তুমি!

স্মিথ হামাগুড়ি দিয়ে তার বাঙ্কে যায় এবং বাকী রাত চুপ করে শুয়ে থাকে। তার উপর করুণা হয়। ঘৃণা করবার অতীত অবস্থায় চলে গেছি আমরা। স্বচক্ষে দেখছি, জেকবের আমার স্মিথের ও হেনরি লেনের মাথা বিগড়ে যাচ্ছে। এলি মারা গেলে কি যে হবে ভেবে আমার দারুণ শঙ্কা হয়। একদিন সত্যি সত্যিই আমি তাকে না মরতে অনুরোধ করি। নানাভাবে কাকুতি জানাই। এলি হাসে। আমাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই এখনও হাসতে পারে।

তারপর আমরা খানিকটা গল্পসল্প করি। বেস গুটিসুটি মেরে আমার পাশে এগিয়ে আসে, হাত দিয়ে ধরে থাকে আমাকে। সব সময় সে আমাকে আঁকড়ে থাকতে চায়। ওরা বলে. যখন আমি বাইরে পাহারা দিতে যাই—ভয়ে সে ছটফট করে।

একবার বাইরে গেলে আর যদি ফিরে না আসি আমি। একদিন আমায় বলে, আলেন আমাকে কোনদিন ছেড়ে যাবে না তো!

কেন, আরও অনেকে রয়েছে তো।

না, আর কাকেও চাইনা। সে বলে।

আমার পাশে উঠে বসে বেস। ব্রিটিশদের আক্রমণ আর তার প্রতিবন্ধকতা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। কেনটন ছাড়া আর সবাই আছি এখানে। সে পাহারায় গেছে।

আর আক্রমণ হবে না। আমি বলি, লড়াই খতম হয়ে গেছে। দু'মাসের মধ্যে পল্টন উধাও হয়ে যাবে। কেন ব্রিটিশরা আক্রমণ করবে বল?

তুমি ভুল করছ আলেন। এলি বলে।

গ্রীন বলে, শুনছি ছাউনিতে নাকি এখন মাত্র পাঁচ হাজার সৈন্য আছে।

এসব মিথ্যে কথা। জেকব প্রবল প্রতিবাদ করে বলে।
তোমার মাথায় ভূত চেপেছে জেকব। এই ঘ্রাউনিতে জন অ্যাডমস্ বা স্যাম অ্যাডমস্ আছে। টমাস জেফারসন আছে? আছে ডিকিনসন? শেরম্যান? হ্যানকক? নিরাপদে বসে তারা ভুঁড়িতে হাত বুলোচ্ছে। একবার যুদ্ধে জিতি, তারপর ভুঁড়িতে হাত বুলোনো বার করে দেব। সত্যি বলছি, রক্ত ঘাম বার করে ছাড়ব।
চার্লি বলে, তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে! ওরা তো রাজা হবে! রাজা জন অ্যাডমস—রাজা স্যাম। অ্যাডমসকে আমি চিনিনে! ব্যাটা পয়লা নম্বরের কুঁড়ের বাদশা। জীবনে একদিনও কাজ করে দেখেনি। আমার দোকানে এসে বলত, চার্লি, বিপ্লব নিয়ে চমৎকার একখানা বই লিখেছি। আদর্শের জন্য এটা বিনে পয়সায় ছেপে দাওনা চার্লি! কিসের আদর্শ? হ্যানককের আদর্শ তো! ব্যাটা জোচ্চোর জলদস্যু! যদি দশ শিলিং দিয়ে কাগজ কিনতে বলতাম তো রেগেমেগে গালাগাল শুরু করত। হ্যানককের কথা বলছি শোন। ও ব্যাটা পাকা চোরাকারবারি। বন্ধু-বান্ধব নিয়ে বেশ একটি দল পাকিয়েছে। তোমরা দেশ গাঁয়ের লোক, এসব ব্যাপার বুঝবে না। সব শালা চোরাকারবারি বদমায়েস। আমরা যদি ব্রিটিশ মাল কিনতে বাধ্য হই, তবে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বীপ আর ওলন্দাজদের কাছ থেকে চোরাই মাল চালান দেওয়া বন্ধ হয়ে যাবে যে! কিন্তু আমাদের মাল কে কিনছে এখন? ইংলণ্ড! কাজেই হ্যানকক আর তার বন্ধুবান্ধব অ্যাডমসকে সামনে রেখে লড়াই বাঁধিয়ে দিয়েছে। আমিও ভীড়ে পড়লাম। চাঁদপানা মুখের একটি মেয়ে আছে আমার। সে আমার মাথায় একটা মজার গান ঢুকিয়ে দিয়েছে। 'ইয়াংকি-ডুডল' গেয়ে সে আমাকে বিদায় দিল। ভারি দুষ্টু মেয়ে। কি জানি এখন হয়ত তারও সঙ্গী জুটে গেছে।
হ্যানককের জন্য আমি যুদ্ধ করছি না। জেকব বলে, বন্দুক নিয়ে কি করতে হয় তা আমার জানা আছে। যে সব ব্রিটিশ চোখের সামনে মারা গেছে, হ্যানকক তাদের চাইতে এতটুকু ভাল নয়!
ঠিক আছে! মাথা নেড়ে চার্লি বলে। জেকবের কথায় সে খুশী ও উল্লসিত হয়। কথার মানুষ সে! কথা বলতে সে ভালবাসে, কথাই তার জীবন। বোস্টনের এই বেঁটে মুদ্রাকর প্লেটো[1] ভলতেয়ার, ডিফো ও সুইফট পড়েছে—টম পেইনের[2] সঙ্গেও ওর জানা শোনা আছে। জেকবের কথায় সে ভারি খুশি হয়। দাঁতে দাঁত চেপে বলে, ঠিক আছে! সেই সঙ্গে পল রিভারিকেও খতম করে দিও। সেও মস্ত বীর হয়ে উঠেছে। আমরা এখানে গর্তে পচে মরছি আর খবরের কাগজগুলো পল রিভারির বীরত্বে একেবারে পঞ্চমুখ। তার ঐ নাম করা ঘোড়ায় চড়ে আসাতেই নাকি বিপ্লব রক্ষা পেয়েছে। দিব্যি গেলে বলতে পারি, হ্যানকক পাকা জলদস্যু আর রিভারি ঘুণ ব্যবসায়ী। রিভারি তামা চায়। তোমাদের মত পাড়াগেঁয়ে চাষা এ সব কথার মর্ম বুঝবে না। তামার কারবারে বরাত খুলে যায় বুঝলে। কিন্তু বিপ্লব না হলে তামা আর গলান যাবে না। তাই সে তড়িঘড়ি করে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে খনিজ পদার্থ গলাবার বাধানিষেধ বরবাদ করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। ব্রিটিশ

১। প্লেটো বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক। ভলতেয়ার সাহিত্যিক, ফরাসী বিপ্লবের মহানায়ক ও দার্শনিক। ডিফো ও সুইফট ইংরেজ ঔপন্যাসিক।
২। টম পেইন আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম সংগঠক ও নেতা।

আর তাদের শুল্ক বিভাগের লোকজনদের হাটাও, তাহলেই নিশ্চিন্ত। তাহলেই হ্যানকক সৎ নাগরিক হিসাবে পরিচিত হতে পারে আর রিভারির ব্যবসায়ের বরাতও খুলে যায়। কিন্তু মনে রেখ, ভারি চালাক ওরা। একবার শুরু করে দিয়েই নিশ্চিন্ত। লড়াই করে মরছ তোমরা। তুমি নিরেট বোকা জেকব। ফোর্জ উপত্যকার এক ফুট নীচে পচে মরছ বটে, কিন্তু জেকব ইগেনের কথা ওরা ভুলেও মুখে আনবে না। জেকব ইগেন সম্পর্কে খবরের কাগজে একটি ছত্রও বেরুবে না। ওরা তারিফ করবে পল রিভারির ঘোড়ায় চড়ার কায়দা আর দেবতার আসনে বসাবে স্যাম অ্যাডমসকে। বুঝলে বোকার দল ?

নতুন এক দেশ গড়ছি আমরা। গোমরা মুখে জেকব বলে,—পশ্চিমে এক বিস্তীর্ণ সম্পদশালী দেশ পড়ে আছে। ইংরেজ এদেশে থাকলে কোন দিন সে দেশ আমাদের হবে না। ইংরেজরা যতদিন ইণ্ডিয়ানদের লুঠতরাজ ও গৃহদাহের সুযোগ দেবে, ততদিন মোহক বা হ্রদ অঞ্চলে শান্তির আশা নেই। স্বীকার করছি আমি জংলী মুলুকের চাষা ; তোমাদের শহুরে কায়দাকানুন আমার ভাল জানা নেই। তবু আমি হলপ করে বলতে পারি চার্লি, এই বিরাট দেশে তোমাদের ঐসব শহর ছোট বিন্দুর মত। তোমরা বোস্টনের লোকেরা নিজেদের গৌরবের দেমাকেই অস্থির। পশ্চিমের বিরাট অঞ্চল সম্পর্কে কোন ধারণাই তোমাদের নেই। এক সময় এক ফরাসীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ফাঁদ পেতে জন্তু-জানোয়ার ধরাই ছিল তার ব্যবসা। সে একবার পশ্চিম ভ্রমণে বেরোয়। বসন্ত গ্রীষ্ম শীত গিয়ে বছর ঘুরে আসে তবু সে একটানা পশ্চিম মুখো হেঁটে চলে। অস্তগামী সূর্যের দিকে মুখ রেখে দীর্ঘ পথ হেঁটেছে বেচারী, তবু এই বিরাট দেশের শেষ কিনারা পায়নি। মিথ্যাচার ও প্রবঞ্চনাভরা গোটা ইয়োরোপ থেকে অনেক বিরাট এ দেশ। বোস্টনয়ালারা এই ভুলই করছে, তারা ভাবে, তাদের জন্যই লড়ছি আমরা। এই বিরাট দেশ সম্পর্কে কোন জ্ঞান তাদের নেই। এই দেশকে সত্যি করে জানবার জন্যই লড়ছি আমরা। দুনিয়ার প্রথম থেকে শত শত বছর ধরে মানুষ স্বাধীন ভাবে বসবাস করবার মত একটি দেশের খোঁজ করেছে। ইহুদিটিকে জিজ্ঞাসা কর, তাহলেই বুঝতে পারবে কোন প্রেরণায় মানুষ স্বাধীন হতে চায় বা মৃত্যু বরণ করে। হ্যানকক বা রিভারিকে নোংরা ব্যবসা করতে দাও। কিন্তু এ দেশ আমাদের।

দু'বছরেই আমরা সাবাড় হয়ে গেছি। আমি বলি,—উপত্যকা অঞ্চল তচনছ হয়ে গেছে। শুনলাম, একখানা ঘরও নাকি আর খাড়া নেই।

এরপর আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। সবাইর মুখেই অর্থহীন মূক আকুলতা ফুটে ওঠে। এমন কি চার্লিও বোস্টন শহরের আরামের জন্য আকুল হয়। সকলেই এলির পায়ের দিকে তাকায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। দরজা খুলে না যাওয়া অবধি আমরা চুপ করে থাকি।

ডাক্তার ঘরে ঢোকে। তার গায়ে গ্রেট কোট, পশমী টুপি মাথায়। দরজায় দাঁড়িয়ে সে পা ঠোকে এবং আগুনের ধোঁয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের দিকে উঁকি মারে। সেদিন হাসপাতালের যাওয়ার পরে তার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। প্রথম আমি তাকে চিনতে পারিনি। প্রত্যেকেই তারদিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

হাসপাতালের ডাক্তার। এলি বলে।

উঃ একদম হাওয়া নেই। ডাক্তার বলে,—আরে জানোয়ারগুলো পর্যন্ত পরিষ্কার হাওয়া খোঁজে। কি বিচ্ছিরি ভ্যাপসা গন্ধ! এটা নিয়ে এরকম পাঁচটা গর্তে ঢুকলাম। এই যে ইহুদিও আছে দেখছি। চটপট করে সে ভেতরে ঢুকে হেঁটে এগোয়. তারপর ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একে একে আমাদের সবাইর মুখ লক্ষ্য করে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে মেয়েরা তার দিকে তাকায়। ইহুদিটির মুখে ম্লান হাসি দেখা দেয়। কিন্তু জেকবের মুখ ক্ষুব্ধ।

ক্ষুব্ধ মূক জানোয়ারের মত! ডাক্তার বলে,—দান্তের মত আমায় যদি কবিতায় নরকের মহান চিত্র আঁকতে হত তো আমি এখানে আসতাম। নরকে ভয়ের বালাই নেই। মাঝে তোমাদের কথা ভেবে আমার হিংসে হয় বন্ধুগণ! সব কিছুই তোমরা জেনেছ—সব কিছুর তলা অবধি দেখেছ। কিন্তু তোমরা একেবারে জানোয়ার হয়ে গেছ···

মুখ সামলে কথা বলবে। জেকব ধমকে ওঠে।

একেবারে খাঁটি জানোয়ার। তোমার ওই দাড়ির ফাঁকে মুখের যতটা দেখা যায় তার মধ্যে যে খুনীর ভাব ফুটে বেরুচ্ছে বন্ধু।

এ নরক আমাদের! বেরিয়ে যাও এখান থেকে। খেঁকিয়ে ওঠে জেকব।

আঃ জেকব! মাথা গরম কর না, ওকে থাকতে দাও! বিরক্ত ভাবে এলি বলে।

কিন্তু কেন এখানে এলাম মনে পড়ছে না তো! ডাক্তার বলে,—হয়ত ইহুদি বন্ধুর সঙ্গে দুটো কথা বলতে এসেছি। ও ভিন্ন-জগতের লোক। যা কাশি হয়েছে তাতে খুব তাড়াতাড়িই পাড়ি দিতে পারবে! সঙ্গীকে আমার ওখানে দিতে গিয়েই এই দশা হয়েছে নাকি?

আমাদের ঘৃণা ও দুরন্ত ক্রোধ সে নিজের চোখে দেখতে পায়! তবু সে অকুতোভয়। মনে হয়. ভয় যে কি তা জানেই না। আবার এও হতে পারে, ভয় করবার মত বোধশক্তিও হয়ত তার ভোঁতা হয়ে গেছে। আমাদের দিকে চেয়ে মুচকি হাসে লোকটি।

লোকটা মারা গেছে। সে বলে ওঠে,—এই সংবাদটা দেবার জন্যই এই শীতে মাইলটাক পথ হেঁটে এসেছি। অনেকের জন্যই এতটা করি না।

ক্লার্ক মারা গেছে? জেকব জিজ্ঞাসা করে। কথাটা তার বিশ্বাস হয় না।

আপনিই তাকে মেরেছেন! আমি চেঁচিয়ে উঠি,—আপনিই খুন করেছেন তাকে।

হাঁ ঠিকই, তবে আমি একা নই, ভগবান আর আমি দুজনে মিলে! তোমাদের মত নোংরা ছিচকাঁদুনে ভিখারীদের কথা ভাবতেও আমার ঘেন্না হয়। ঐ যে ইহুদিটিকে দেখছ, ও আর আমিই শুধু সভ্য। ওর দাড়িটা যদি ঠিক করে ছেঁটে দি তো ওকে অবিকল খ্রীস্ট বানিয়ে দিতে পারি। অনেকটা রেমব্রান্টের সেই ছবির মত। লেভির কাছে এগিয়ে গিয়ে সে নিউ ইয়র্কের ওলন্দাজী ভাষায় কথা বলতে থাকে।

কি গো ইহুদি দোস্ত, বেশ জম্পেস কাশ বানিয়েছ তো!

ইহুদিটি তার দিকে চেয়ে মৃদু হাসে। ডাক্তার হাসিটা লক্ষ্য করে এবং সহজেই তার অর্থ ধরতে পারে। কিন্তু এই গভীর উপলব্ধি ডাক্তার হালকা ভাবে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে।

আপনি ..আপনি আর আমি জানি। লেভি বলে, আমরা দুজনেই মানুষ মরতে দেখেছি।

কি কোন ভয় করছে না তো? ডাক্তার খোলাখুলি জানতে চায়।—খুলে বল ইহুদি দোস্ত আমার, বল তুমি ভড়কাও নি তো? চশমা খুলে সে সযত্নে মুছে নেয়. আবার চোখে পড়ে।

তারপর আবার হাতের দস্তানা খুলে ফেলে। আবার সে পীড়াপীড়ি করে, বল তুমি তাহলে মৃত্যুভয় জয় করেছ!

চুপ করে কান পেতে আমি ওদের কথা বার্তা শুনে যাই। কোনমতেই আমি ইহুদিটির মুখ থেকে চোখ সরাতে পারি না। আমার মনে পড়ছে ক্লার্ক ভ্যানডিয়ারের কথা। এককালে ধর্ম প্রচারক ছিল। আজ আর সে বেঁচে নেই। কিন্তু মৃত্যু তো আমাদের কাছে এখন অজানা নয়। মৃত্যু দেখতে দেখতে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। তবে নিজের মৃত্যু···

জেকবও সব শুনছে। ক্লার্কের মৃত্যুর কথা শুনে দুঃখে তার মুখ কালো হয়ে গেছে। তবুও সে কান পেতে আছে। বেস দুহাতে জাপটে ধরেছে আমাকে। আপনা থেকে আমি হাত দিয়ে তার কান চেপে ধরি—এসব কথা তাকে শুনতে দিতে চাই না।

মৃত্যু ভয় বলে তাহলে কিছু আছে নাকি? ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি লোভি।

এ তো প্রাচ্যের দর্শন! জিজ্ঞাসার জবাবে পাল্টা প্রশ্ন।

আমি বাঁচতে চেয়েছি, বাঁচতে চাই আমি। ইহুদিটি বলে,—অন্তত আগামী বসন্ত ঋতুটা দেখবার বড় সাধ ছিল আমার। আজীবন এ দেশে আসবার স্বপ্ন দেখেছি। আগামীতে কত সুন্দর হবে এ দেশ!

অ্যা, এই জায়গা? খেঁকিয়ে ওঠে ডাক্তার।

হাঁ হাঁ, এই জায়গা! মানুষের কল্পনাতীত সৌন্দর্য আর সমৃদ্ধি ফুটে বেরুবে···বড় মধুময় হবে এ দেশ।

তুমি আচ্ছা স্বপ্নবিলাসী তো! ডাক্তার হেসে ওঠে হা হা করে।

ইহুদিটির কণ্ঠে গভীর ক্ষোভ ফুটে বেরোয়ঃ না এ অলীক কল্পনা নয়। কিন্তু স্বপ্ন বিলাস মনে করে আপনি হয়ত ঠাট্টা করতে পারেন!

আমি দুঃখিত বন্ধু! আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই নি। সংক্ষেপে ডাক্তার বলে,—হে ঈশ্বর সারা দিন ওদের যাওয়া আসা যদি দেখতে! কবর দেবারও কোন উপায় নেই। না আছে মাটি না পাথর! কাজেই কাঠের মত পাঁজা করে এক যায়গায় রাখতে হচ্ছে। সারাদিন এইকাণ্ড চলছে। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে মাথায় হাত বুলোতে বলবে না। রক্ত মোক্ষণ করিয়েও কোন লাভ নেই এখন। তুমি আর আমিই শুধু সভ্য। আমরা এই গাঁইয়া জানোয়ারদের মত নই।

তোমাদের কাছে মিথ্যে কথা বলবার দরকার হয় না। যে মানুষ হাতড়ে বেড়ায় তাদের সম্পর্কে পোপ (ইংরেজ কবি) যেন কি একটা বলেছেন! ঠিক মনে পড়ছে না। তোমাদের সে-অবস্থা কেটে গেছে। তুমি ত মরতে চলছে, তোমার কাছে মিথ্যে কথা বলে কি হবে?

জেকব হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠেঃ দোহাই ভগবানের, এখন থাম।

গভীর ক্ষোভে ও উত্তেজনায় ডাক্তার বিরস মুখে ফিরে দাঁড়ায়। আধবোজা চোখে গভীর চিন্তায় ডুবে যায় ইহুদিটি। ফিক করে একবার হাসে ডাক্তার। তারপর কোট গায়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

হাঁপাতে হাঁপাতে ইহুদিটির কাছে যায় জেকব। কিন্তু মুখে কথা সরে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে সেখানে।

স্মিথ বলে, ব্যাটার গায়ে রামের গন্ধ ভুরভুর করছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এক ফোঁটা মদ আমাদের মুখে পড়ছে না, কিন্তু ওদের তো শালা বেশ জুটছে।

চুপ করে বসে থাকি আমরা। বাইরে নিস্তব্ধ রাত্রি নামে। দরজার ফাঁকে ফাঁকে আলোর ঝিলিমিলি ম্লান হয়ে মিলিয়ে যায়। আজকাল দিন বড্ড ছোট। কেনটনের জন্য অপেক্ষা করতে থাকি। প্রত্যাশা করবার আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। পাহারা থেকে ফিরে আসবে কেনটন। তার কাহিনীও মামুলি.. সেই দুরন্ত শীত আর অসাড় পা। যখন সে পা খুলবে, হয়ত দেখা যাবে যে কড়ে আঙুলটি জন্মের মত অসাড় হয়ে গেছে।

বসে থাকতে থাকতে সহসা পায়ের শব্দ শোনা যায়। কেনটন দৌড়ে আসছে। দমকা হাওয়ার মত সে ঘরে ঢুকে পড়ে। সারা গায়ে রক্ত! মুখে রক্ত, হাতে রক্ত—সারা কোটে তাজা রক্তের ছিটে। হাতে একখানা রক্তমাখা ছোরা! দাঁড়িয়ে প্রবলভাবে হাঁপাচ্ছে।ঃ চোখ দুটো পাগলের মত উদভ্রান্ত। বলে, ইয়া দুটো মদ্দা সম্বর! মস্ত বড় আর হৃষ্টপুষ্ট হরিণ! আমি তাদের শিঙের শব্দ শুনতে পাই। ফিলাডেলফিয়া রোডের পর গুঁতোগুঁতি করতে করতে ওদের শিঙে শিঙে আটকে যায়। দুটোকেই মেরেছি।

হেনরি উদভ্রান্তের মত তাকে ধরে ঝাঁকতে থাকে। আঙুলে রক্ত নিয়ে চেখে দেখে ঃ হরিণ! সত্যিই হরিণ!

মিছে কথা বলছে। বেসকে বলি, নিশ্চয় ও বানিয়ে বলছে।

ভগবানের দিব্যি চটপট চল। না হলে তোমরা পৌঁছোবার আগেই হয়ত বাঘে টেনে নেবে। ছোরা ঘুরিয়ে কেনটন বলে! তার চেহারায় এক বিভীষিকাময় হিংস্রতা ফুটে বেরোয়।

সঙ্গে সঙ্গে জামাকাপড়ের জন্য হুড়োহুড়ি লেগে যায়। হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়ি। ভ্যানডিয়ার, ডাক্তার বা ইহুদিটির তখন কারও মনে থাকে না।

বাইরে বেরিয়েছি কিন্তু কই শীত লাগছে না তো! এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। কেনটন আগে আগে ছুটতে থাকে ; আমরাও দৌড়োই তার পেছু পেছু। তারপর সে নীচে নামে। আমরা থেমে পড়ি। শ্বাস-প্রশ্বাসে ধোঁয়া বেরোয়। দুর্বল বলহীন আমরা। আস্তে আস্তে হেঁটে চলি। মেয়েরাও এসেছে সঙ্গে। আচমকা দু একটা আর্তনাদ করে আমাদের সাথে ছুটছে। বেসের হাত ও মাথা খোলা।

এলি আমাদের হুঁশিয়ার করে দেয়, সবাই আস্তে আস্তে চল। না হলে ফিরতে পারবে না। পাগলের মত লাফাচ্ছি, হাসাহাসি করছি আমরা। একই সঙ্গে হাসছি আর কাঁদছি। সহসা হরিণ দুটি নজরে পড়ে। মস্ত বড় দুটো হরিণ পড়ে আছে বরফের পর। কেনটন আঙুল ।দয়ে এদিকে দেখায়। দৌড়ে যেয়ে উন্মত্তের মত ছোরা চালাতে থাকে সে? একবারে বাঁট পর্যন্ত ছোরাখানা সেঁধিয়ে দেয়।

এই ভাবেই দুটো গুঁতোগুঁতি করছিল। সেই সুযোগে সাবাড় করেছি।

এলি চীৎকার করে বলে,—কেনটন তুমি পাগল হয়ে যাবে! এখনও হরিণের কাছে থেকে সরে এস বলছি। দৌড়ে যেয়ে খানিকটা রক্ত এনে আমি মুখে দিই! এলি আমায় রেগে জোরে একটা ঘুসি মারে। আমার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। বেকুবির জন্য মাফ চাই।

সবাই মিলে টেনে টেনে হরিণ দুটো নিয়ে আসা হয়। স্ত্রী-পুরুষে মিলে অক্লান্ত চেষ্টায়

কোনমতে বরফের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে আসি। যে করেই হোক, খবরটা কেমন করে রটে যায়। দলে দলে লোক বেরিয়ে আসে পেনসিলভানিয়ানদের পরিখা থেকে। প্রতিটি জন্তুর পর কমসে কম একশোখানা হাত এসে পড়ে, নেড়েচড়ে দেখে। পুরুষদের মধ্যে হাসাহাসি ও গানের হুল্লোর পড়ে যায়।

টানতে টানতে হরিণ দুটোকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে আসা হয়। কেনটন শিকার দুটির উপর দাঁড়ায়। পেনসিলভানিয়ার লোকজনদের সরিয়ে রাখবার জন্য আমরা সকলে গোল হয়ে দাঁড়াই।

সবাই খাবে!

নিশ্চয়ই তোমরা নিজেদের জন্য সবটা রাখবে না!

এক টুকরো টাটকা মাংসের অভাবে মরে যাচ্ছি আমরা সবাই।

যতটা মাংস আছে তাতে আমাদের সবাইর হয়ে যাবে।

সহসা জেকবের গম্ভীর গলার চেঁচানি শোনা যায়,"কেনটন শিকার করেছে, ওকেই বলতে দাও।

সবাইর মুখে কেনটনের নাম। ভীড় ঠেলে মেয়েরা এগিয়ে এসে কেনটনকে জড়িয়ে ধরার চেষ্টা করে।

সত্যিই কেনটন বাহাদুর!

ভারি চমৎকার শিকারী।

চোখ মুখ দেখেই বুঝেছি, তোমার দয়া-মায়া আছে কেনটন। নিশ্চয়ই সবটা নিজে রাখবে না।

আমার কাছে রাম আছে। মাংসের বদলে তোমাকে রাম দেব কেনটন।

কেনটন গম্ভীর হয়ে মর্যাদা বজায় রাখে। হতচ্ছাড়ার মত শীর্ণ খোঁচাখোঁচা দাড়িওলা চেহারা ও হলদে চুলে রক্ত মাখা থাকলেও সে তার গাম্ভীর্য হারায়নি --হাতের ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলে। তারপর গলা চড়িয়ে বলে, আমরা শুধু একখানা পেছনের পা নেব। তাতে নিশ্চয়ই কারও আপত্তি হবে না। বাকী সবটা একসঙ্গে রোস্ট কর। চটপট মস্ত একটা আগুন জ্বালাও।

জনতা কেনটনের জয়ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। আলুথালু পাগলীর মত মৃত্যুভীতা মেয়েরা নখ দিয়ে আঁচড়ে আমাদের বেড়া ভেঙে তাকে জড়িয়ে ধরবার জন্য ছুটে যায়। আমরা একখানা পা কেটে নিই। হেনরি টুকরোখানা আস্তানায় নিয়ে যায়। আগুন জ্বালাবার জন্য তখন কাঠ সংগ্রহ করা হয়। এক মুহূর্তে সবার অবসাদ ঘুচে যায়। ক্রমে ক্রমে কাঠের পাঁজা তৈরী হয়। পরিখার চাল ও গাছের সঙ্গে একখানা কাঠ টাঙিয়ে ঝলসাবার শিক বানান হয়। চটপট হরিণ দুটোর ছাল ছাড়ান হয়। নাড়ি-ভূঁড়ি খুলে আলাদা করে রাখা হয়। ওগুলো পরে আলাদা করে ঝলসান হবে। আগুনের পাশে একটা গাছে হেলান দিয়ে এক নাগাড়ে রাম টানছে কেনটন। জমা রাম যাদের আছে তাদের প্রায় সকলেই দিয়েছে কিছু কিছু। সে কোন কাজ করছে না, জ্বলন্ত আগুনের পাশে বসে রাম টেনে যাচ্ছে। চোখ লাল বেশ নেশাও হয়েছে। হরিণ মারার কাহিনীটি তাকে দশ বারো বার বলতে হয়েছে। আমাকে কাছে ডেকে বলে : জান আজেন, পেনসিলভানিয়ানরা কিন্তু খুব খারাপ লোক

নয়। তোমার জন্য এই মওকায় মোটাসোটা খুবসুরত একটা মাগী যোগাড় করেছি। চমৎকার জার্মান বলতে পারে। কোন রকম আপত্তি কিন্তু শুনব না···

আমি হেসে উঠি। মেজাজের অবস্থা এখন হাসবার মত। রামও মুখে পড়ে খানিকটা। বেস আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। কাঁপতে কাঁপতে উৎকণ্ঠা ভরা কণ্ঠে বলে, আলেন, সব রাত আমার সঙ্গে থাকবে বল, পেনসিলভানিয়ার সুন্দরী জার্মান মেয়ে পেয়ে আমায় ছেড়ে যাবে না তো!

যাব না, কোন মেয়ের জন্য না। আমি বলি।

এবার শিক বিঁধিয়ে হরিণ দুটোকে ঝলসাবার জন্য প্রস্তুত করা হয়। বেশী উত্তাপ পাবার জন্য আমরা আগুনটা অনেকটা জায়গায় ছড়িয়ে দিই। সবাইর মুখে হাসি ফোটে। অনেক-দিন এমন হাসি হাসতে পারিনি। পাহাড়ের উপর অফিসারদের ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনেও আমরা হাসাহাসি করতে থাকি।

হঠাৎ মুলার ঘোড়ায় চেপে হাজির হয়। লেফটন্যান্ট কোলবি এবং ক্যাপ্টেন ফ্রিস্টোনও আছে তার সঙ্গে। ঘোড়া থেকে নেমে তারা ভীড় ঠেলে আগুনের দিকে এগোয়।

এখানে এসব কি হচ্ছে? মুলার জানতে চায়।

জেকবই জবাব দেয়। দেখতেই তো পাচ্ছেন হরিণ রোস্ট করা হচ্ছে।

লুঠের মাল সব রসদখানায় জমা পড়বে। মাংসটা তুলে নিয়ে যাও কোলবি। জন বারো লোক নিয়ে এটা রসদখানায় নেবার ব্যবস্থা কর।

শালা অফিসারদের পেট ভরাবার জন্য! গর্জে ওঠে জেকব।

চুপ কর বেজন্মা ভুত!

তবে রে শালা শূয়োর······

কেনটন তারস্বরে বলে ঃ কবে থেকে হরিণ লুঠের মাল হল? বনের স্বাধীন জন্তু শিকার করেছি। ছোরাখানা দেখিয়ে বলে, দরকার হলে এখন হরিণ মারার চাইতেও ভাল কাজে লাগিয়ে দেব।

অফিসারদের কাছে ছোট হাতিয়ার আছে। আমাদের মধ্যে কারও কারও হাতে বন্দুক আছে। সবাই ঘৃণায় উন্মত্ত। ভয়ে মেয়েরা আমাদের গা ঘেঁষে দাঁড়ায়। অফিসারদের চাইতে অফিসার-গৃহিণীদের তারা বেশী ঘেন্না করে। কোয়েকারদের পাশাপাশি পাথুরে ঘর-বাড়িতে কর্তাদের সঙ্গেই বসবাস করছে চমৎকার সাজ-পোশাক-পরা এই গৃহিনীর দল। ছাউনিতে তারা বড় বেশী আসে না। মাঝে মাঝে অনেকটা দূর থেকে দেখে-শুনে কৌতূহল চরিতার্থ করে যায়। আসে যেন মেয়ে-মদ্দা জানোয়ার দেখতে। আমাদের সঙ্গিনীরা বেদম ঘৃণা করে ওদের। কুৎসিত গালগাল আর অঙ্গ ভঙ্গী করে ওদের দেখলে।

একজন চীৎকার করে ওঠে,—কেমন করে হরিণ মেরেছিলে ব্যাটাদের একবার দেখিয়ে দাওনা কেনটন। ভাল করে হাতের ছোরা চালনোটা দেখিয়ে দাও।

অফিসারদের সাহস আছে বলতে হবে। আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে একে একে সবাইর মুখ লক্ষ্য করে। মুচকি মুচকি হাসে মুলার। এলি তাদের দিকে এগিয়ে যায়। শান্তভাবে বলে, খুন-খারাবি কাণ্ড ঘটাবার মত বোকা নিশ্চই আপনারা নন।

মোড় ঘুরে গটমট করে আমাদের মধ্য দিয়ে হেঁটে যায় মুলার। আর দুজনও যায় তার পেছু

পেছু। আমরা তাদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করি। আমার মনে হয়, ঘটনাটা ওরা কোন দিন ভুলবে না।

আমাদের পরিচালনা করবার যোগ্যতা ওদের নেই। এলি বলে,—আমাদের একদম বোঝেই না।

সব ব্যাটা একেবারে নিরেট। আমি বলি।

জন ছয়েক মিলে মাংসটা আগুনের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে। আস্তে আস্তে ঝলসে রোস্ট হচ্ছে। ফোঁটা ফোঁটা চর্বি ঝরে আগুনের মধ্যে নীল-হলদে শিখা সৃষ্টি করে। আধ-সেদ্ধ কাঁচা অবস্থাতেই আমরা মাংস কেটে নিতে শুরু করি, আর সঙ্গে সঙ্গে হাভাতের মত গরম অবস্থাতেই মুখে পুরে দিই। 'বিপ্লবের হাসিখুশি ছেলের দল' নামে বোস্টনের একটি গানের 'প্যারোডি' গাইতে শুরু করে চার্লি গ্রীন। আমরাও যোগ দিই। গানটা ভারি ভাল লাগে। আমরাও গাইতে শুরু করি ঃ

আয়রে আমাদের বিপ্লবের মাতোয়ারা নওজোয়ানের দল
আয় সব মন প্রাণ এক করে।
সহজে ভীত হবার মতো পাত্র শত্রুরা নয়।
তবু আমাদের চরম বোকামি চমকে দেয় ওদের
আমাদের শূন্য পেট, সমস্ত কষ্ট করতে হবে বশ
এই তো তার ঠিক সময় বয়ে যায়
না হলে কোনদিন আসবে না সুসময়
আমাদের এই আদর্শ সার্থক হোক সবার জীবনে—
ঝরে যাক সব পয়মাল।

'গৌরবোজ্জ্বল পয়লা আগস্ট' গানের সুরে আমরা গানটি গাই। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একই পদ বার বার গাইতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পদগুলো অর্থহীন হয়ে পড়ে। খালি পেটে মাতাল হয়ে পড়ি। জনকয়েক বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শেষে হোঁচট খেতে খেতে আস্তানায় ফিরে আসি।

আমি রাত পাহারা দিতে বেরিয়ে পড়ি। গভীর রাত্রি নিস্তব্ধ নিঝ্‌ঝুম। পেনসিলভানিয়ার সৈনিকেরা হুল্লোড় করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ঢিবির মত চাপা ছোট ছোট বরফ চাপা আস্তানাগুলো একেবারেই নীরব।

শীতের প্রকোপ খানিকটা কমেছে। হাওয়া নেই বল্লেই চলে। ধীরে ধীরে পায়চারি করছি। মাঝে মাঝে ফিরে আস্তানাগুলোর ওধারে গাছের ফাঁকে আগুনের আভাটির দিকে তাকাই। ওটা আমাদেরই আগুনের আভা। মনে পড়ে, ক্লার্ক ভ্যানডিয়ারকে হাসপাতালে নিয়ে যাবার সময় কেমন করে ইঁদুরটির ফুসফুস জমে যায়। কিন্তু এলি আর আমি তো এখনও বেঁচে আছি। দুইজনেই শক্তিমান।

ক্লার্ক মারা গেছে। কবরও জোটেনি তার। বেয়নেট হাতে নিয়ে বরফের মধ্য দিয়ে মাটি অবধি বসিয়ে দিই। পাথরের মত শক্ত মাটি। হাঁটু ভেঙে বসে মাটি খুঁড়বার চেষ্টা করি। কোনমতে সামান্য কিছু মাটি উলটে দিতে পারি।

ভয় আমাকে জয় করতেই হবে। চারিদিকের প্রাকৃতিক শোভার দিকে চেয়ে থাকি।

ভাবতে চেষ্টা করি, বসন্তকালে কেমন শোভা হবে এই পল্লী প্রকৃতির! ঘুরে ফিরে ইহুদিটির কথা মনে পড়ে। আমেরিকার বসন্ত সে কোনদিন দেখেনি।
এইখানেই আমরা শেষ হব—এই শঙ্কা বার বার মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করি। কোনও সাড়াশব্দ নেই। সবাই মরে গেছে নাকি? ভীষণ জোরে চেঁচিয়ে উঠি। করুণ প্রতিধ্বনি তুলে আমারই কণ্ঠস্বর ফিরে আসে। গুলি করতে ইচ্ছা হয়। প্রবল আগ্রহ জাগে। কিন্তু প্রাণপণে নিজেকে প্রতিনিবৃত্ত করি। পাহারাদারিতে এসে একই কারণে কত লোক যে গুলি ছোঁড়ে। একাকিত্ব নিস্তব্ধতা ভাঙতে চায়। গতকাল এজন্য একটা লোককে চাবকে আধমরা করা হয়েছে।
দূর পাহাড়ের মাথায় চাঁদ ওঠে। হলুদে বরফের বাঁকা পাশের মত ম্লান শীর্ণ চাঁদ। জ্যোৎস্নার যাদুস্পর্শে বনজঙ্গল সবমিলিয়ে সৌন্দর্যের মায়াপুরী সৃষ্টি হয়। ক্রমে চাঁদ উপরে ওঠে। তখন তার রূপ উজ্জ্বল হাসিভরা আধখানা রূপসী মুখের মত।

ইহুদিটি মুমূর্ষু। স্মিথ দুরারোগ্য চুলকানিতে ভুগছে। তার রোগ সারাবার জন্য কিছুই করবার উপায় নেই। অল্প-বিস্তর এ রোগ আমাদের সবারই আছে। স্মিথের মুখখানা পচা আপেলের মত—সব কটা দাঁত পড়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে সে রোগযন্ত্রণায় কাতরায় এবং ইহুদিটিকে গালাগাল করে। কিম্বা মাঝে মাঝে নিজের হোটেলের রান্নাঘরের রোস্টের কথা স্মরণ করে যা মুখে আসে তাই বলে। বলতে বলতে তার গলা চড়ে যায়ঃ আঃ, গো মাংসের রোস্ট চাই। এক পাউণ্ড দিলে পনেরো মিনিটের বেশী লাগবে না। ওহে আস্তে আস্তে উলটে-পালটে দিও। আস্তে আস্তে উলটোবে আর চর্বির ফোঁটাগুলো ধরে রাখবে। মাংসের তেলে···। এ আমাদের আর সহ্য হয় না। আমরা তাকে বকবকানি থামাতে বলি।
ডাক্তার এরমধ্যে দুবার এসেছে। একবার সে স্মিথের জন্য কিছুটা আলু নিয়ে আসে। তাতে খানিকটা উপকার হয় কিন্তু আলুও তো দুষ্প্রাপ্য। দ্বিতীয়বার এসে সে ইহুদিটিকে জিজ্ঞাসা করে, সে হাসপাতালে যেতে চায় কিনা।
মা ধরিত্রী আমাদের রক্ষা করেছেন। ডাক্তার বলে,—এখনও জায়গা খালি আছে। কিন্তু মুরগীর ছানার মত সব সময় ঝগড়া লেগেই আছে। কেউ বলে জায়গাটা নিউ জার্সির লোককে দাও, কেউ বলে মাসাচুসেটস্ওলাদের দাও, আবার কেউ বলছে ভারমণ্টারদের দাও। উঃ, এই ভারমণ্টওয়ালারা যে কি বিচ্ছিরি লোক। পাহাড়ের মত প্রাণহীন ঠাণ্ডা আর শূয়োরের মত নিরেট। জায়গাটা আমি একজন ইহুদির জন্য রাখছি, এ কি বলা যায়? তাদের কাছে বলতে পারি এ কথা? আমি সবশেষে ছেড়েছুড়ে চলে যাবার ভয় দেখাই। তখন আর পীড়াপীড়ি করে না। আপনার যা খুশি করুন বলে চুপ করে যায়। সেইজন্যই তো জায়গাটা এখনও আমার ইহুদি দোস্তর জন্য রাখতে পেরেছি। তা আমার কথা অবশ্য কিছুটা শোনে। আমি বলি, আঠারো মাইল দূরে ফিলাডেলফিয়ায় এক একজন পল্টনের ডাক্তার সপ্তাহে দশটি সোনার পাউণ্ড পায়। এদিকে আমি মহাদেশীয় নোট নিচ্ছি আর তাই দিয়ে ব্যাণ্ডেজের কাজ করছি। তা ব্যাণ্ডেজের কাজও এই অবস্থায় ভালমত হয় নাকি?
আর কদিন বাকী আছে ডাক্তার? ইহুদিটি জিজ্ঞাসা করে।

এখন তো যে কোন দিন হলেই হয়।
তাহলে এখানেই থাকি। ইহুদিটি বলে। তার মুখে রহস্যময় হাসি খেলে যায়।
ডাক্তার কেমন যেন থতমত খেয়ে যায়। মনে হয়, সত্যিই সে দুঃখ পেয়েছে। বলে. ভেবেছিলাম দুজনে খানিকটা আলোচনা করব। কারুর সঙ্গে কথা বলতে না পেয়ে তুমি পাগল হয়ে যেতে পার।
তা বলে আপনি পাগল হবেন না। ইহুদিটি বলে!
উভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মনে হয়, দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা আছে।
আমরা ইহুদিটির মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করি। নিজের মৃত্যুর কথা ভেবে তার যতটা ভয় হক-না-হক, আমাদের দারুণ ভয় হয়। যদিও এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত, খুব বেশী দেরী নেই আচমকা একবার তার নাক মুখ দিয়ে অনেকক্ষণ রক্ত পড়ে। তারপর অসাড়ের মত পড়ে থাকে সে—শ্বাস বইছে বলে মনেই হয় না। তার মুখের চেহারা হলদে কাগজের মত-- হাড়ের পর শুধু একখানা পাতলা চামড়া! কিন্তু ওর বয়স খুব বেশী বলে মনে হয় না। এলিকে জিজ্ঞাসা করি, ওর বয়স কত হতে পারে? এখন ওর কাছে বয়সের কোন দাম নেই। আস্তে আস্তে বলে এলি।
ত্রিশটা শীতের বেশী কাটিয়েছে বলে মনে হয় না! জেকব আন্দাজ করে।
কোন সময় ছেলে-বউএর কথা বলে না তো! অদ্ভুত চাপা লোক!
আমি অস্থিরভাবে বলি, এখনও মরে না কেন? মরি মরি করেও তো এক হপ্তা কাটাল।
নিশ্চয় কেউ আমায় তুক করেছে। স্মিথ বলে।— ঐ ম্লেচ্ছ ইহুদিদের সংস্পর্শে কাউর রোগ আসে।
হামাগুড়ি দিয়ে আমি বিছানায় ফিরে যাই। বেস জিজ্ঞাসা করে, ও কি মারা গেছে?
না, এখনও মরেনি।
আলেন, এ আমি আর সইতে পারছি না। সত্যি বলছি, আর সহ্য করতে পারছি না। আমাকে আর কোথাও নিয়ে চল আলেন। এখানে মরার চাইতে বাইরে কোথাও মরা অনেক ভাল। রাত্রে ঘুম ভেঙে আমি ভয়ে ঘামতে থাকি। মনে হয়, জায়গাটা আমার বুক চেপে ধরেছে। দোহাই তোমার, চল আর কোথাও চলে যাই।
ভয় করবার কি আছে? আমি প্রবোধ দিই,—কোন ভয় নেই।
তবু আমায় আর কোথাও নিয়ে চল আলেন।
মোহক পাঁচশো মাইল দূর। কঠিন দীর্ঘ পথ। আমি বলি। এই ঠাণ্ডায় এতটা পথ চলবার সাধ্য আমাদের নেই। তাছাড়া মাঝখানকার জায়গাগুলো ব্রিটিশদের দখলে।
মোহকে যাবার দরকার হবে না আলেন।
কোথায় যাবে তাহলে?
খোঁজ-খবর দেবার জন্য ব্রিটিশরা ফিলাডেলফিয়ায় টাকা দিয়ে লোক রাখে। সেখানে খাওয়া থাকার···
কি সর্বনাশ! পেটে পেটে এত বজ্জাতি তোমার! দিনে দিনে আসল রূপ বেরুচ্ছে! আমায় দিয়ে তুমি এলির আর সবার সর্বনাশ করতে চাও—ওদের সবাইকে বিকিয়ে দিতে চাও! এ শুধু তোমার জন্য আলেন, শুধু তোমারই জন্য। তোমায় ভালবাসি বলেই একথা বলছি।

একান্তভাবে তোমাকেই ভালবাসি বলে বলছি।

না না, তোমার মত মেয়ে কোন পুরুষকে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসা পাবার যোগ্যতাও তোমার নেই। তোমার মত মেয়েরা চায় ভাল পোষাক, ভাল খাওয়া, স্ফূর্ত্তি ও পুরুষের দেহ…

বলছ কি আলেন?

হ্যাঁ সত্যি কথাই বলছি। মরবার সময় ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার আমায় অভিশাপ দিয়ে গেছে। তার অনুমান একটুও মিথ্যে নয়! জঘন্য স্বার্থপর কুটিল স্বভাব তোমার…পুরুষের সাঙ্গিনী হবার যোগ্য তুমি নও।

না আলেন, ভুল বুঝো না তোমায় ভালবাসি বলেই বলেছি। ভালবাসি বলেই এ কথা মনে জাগছে। যখন জেগে থাকি, তোমায় জড়িয়ে থাকি ভালবাসি; আর যখন ঘুমোই, স্বপ্ন দেখি। দুর্বলতার জন্য দিন রাতের আদ্ধেক সময়ই তো ঘুমিয়ে থাকি। কিন্তু স্বপ্ন দেখি সব সময়। স্বপ্ন তো তুমিও দেখ আলেন, দেখ না। আমিও তেমনি স্বপ্ন দেখি, আমি যেন এখানে নেই, চলে গেছি স্বচ্ছল সাচ্চা মেয়ে-পুরুষের দেশে। ভগবানের দিব্যি, সব সময় একটা ভাল পোশাকের কথা ভাবি। সাদা শনের মিহি সুতোর একটা পোশাকের কথা ভেবে মাঝেমাঝে প্রায় পাগল হয়ে যাই। নিজেই আমি সুতো পাকাতে পারি আলেন। দিন রাত মনে মনে শনের সুতো পাকাই। শন থেকে সুতো তোলা বলো, সুতো পাকান বলো, বোনা বলো · সবই পারি। কোন খারাপ মেয়ে এত কাজ জানে না। মনে মনে কাপড় বুনি; মাপসই পোশাক কাটি আর সেলাই করি। হলদে সুতো দিয়ে বরফের মত ধবধবে সাদা কাপড় সেলাই করি। ঠিক বাইরের বরফের মত সাদা…তেমনি ধবধবে পরিচ্ছন্ন সুন্দর পোশাক! তাতে কোন দাগ নেই আলেন…একটিও দাগ খুঁজে পাবে না কোথাও। একটা পোশাক পেলেই ভাল হয়ে যাব। বিশ্বাস কর আলেন, খারাপ মেয়ে আমি নই, চাষী ঘরের গেরস্ত মেয়ে। সত্যি বলছি খারাপ নই। একটা পরিচ্ছন্ন পোশাক পেলেই ভাল হয়ে যাব। ওদের কাছে যেয়ে তোমাকে সত্য কথা বলতে হবে না আলেন। শুনেছি, ব্রিটিশদের নাকি তেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি নেই। তুমি যা বলবে তাই ওরা বিশ্বাস করবে আলেন। শীত কাটাবার মত থাকা ও আশ্রয় নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে তখন।

না না, তুমি তেমন সুবিধার মেয়ে নও . আমাকে যেতে দাও।

আলেন, সত্যি বলছি আমি ভাল। আমায় ছেড়ে যেও না আলেন। থাকা-খাওয়া পেলে এই শীতকালেই শরীরে জোর পাব . বেশ গোলগাল জওয়ান চেহারা হবে। বসন্ত আসুক, তখন আমরা দক্ষিণে রওনা হব…বুনের পথ ধরে পেনসিলভানিয়া যাব। দক্ষিণে কোন যুদ্ধের হাঙ্গামা নেই। সেখানে গেলে আবার গায়ে জোর পাব, গেরস্থালীর খাটা-খাটনির সব কাজ করতে পারব। তখন আর তোমাকে আমার জন্য খাটতে হবেনা আলেন; শুধু তোমার জন্য খাটবার সুযোগটুকু দিও। তোমার জন্য কাজ করবার সুযোগ পেলে আর তোমার ঘাড়ে চেপে থাকব না, তোমাকে শুধু ভালবাসা দেব।

বিছানা থেকে নেমে টলতে টলতে আমি আগুনের কাছে দাঁড়াই। বেসের শঙ্কিত চাপা-ফোঁপানি কানে আসে : আগুনের কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টে শিখার দিকে চেয়ে থাকি। আগুনটা নিভু নিভু হয়ে এসেছে। জ্বালানিও প্রায় শেষ হয়েছে। নিভু নিভু অগ্নিশিখা

থেকে একটা কিছু খুঁজে বার করবার চেষ্টা করি।
এলি ইহুদিটির পাশে রয়েছে। সে কি যেন বলেছে, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে ডাকে, এদিকে একবার এস তো আলেন।
আমি গিয়ে বিছানার উপর ঝুঁকে দাঁড়াই।
তুমি ইস্কুলে পড়েছ আলেন, নিশ্চয়ই বই-টই পড়াশোনা আছে।
আমি ঘাড় নেড়ে সায় দিই।
তোমাদের পাঠ্য তালিকায় ইহুদিদের প্রার্থনা ছিল ?
অসহায়ের মত মাথা নেড়ে জানাই যে ছিল না। তখন সে গুটিকয়েক কথা বলে। দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ইহুদিটি। এলি চোখ বোজে। বলে, স্বর্গ ও নরকের প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবার স্বভাব আমার নয় ; কিন্তু ও যেখানে যাচ্ছে, সেখানে যেতে পারলেই আমি খুশি হব।
আমার মুখে কোন কথা সরে না।
এলি বলে, চল কিছু কাঠ কেটে নিয়ে আসি আলেন। আগুনটা নিভে এসেছে।
অমনিই কুড়োল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি। এলি পথ দেখিয়ে আগে আগে বনের দিকে যায়। আমি একটা ছোট্ট গাছ কাটি। তারপর আমি জিরিয়ে নি আর এলি ডাল কাটে। কাজ পেয়ে বেঁচে যাই, তাতে আনমনা হওয়া যায়।
কাঠের বোঝা নিয়ে দুজনেই ফিরে আসি এবং ভাল করে আগুন জ্বালাই। জেকব হাঁটু ভেঙে ইহুদিটির বিছানার পাশে বসে আছে। উভয়েই আমরা তার দিকে তাকাই, কিন্তু কারও মুখে কথা ফোটে না।
আবার বিছানায় ফিরে আসি। বেস সন্তর্পণে আমার মুখে হাত বুলিয়ে দেয়। তার বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে ডুকরে কেঁদে উঠি আমি।

কেনটন ব্রেন্নার, চার্লি গ্রীন আর আমি পালাব বলে ঠিক করেছি। হুট করে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি। ক্রমে ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে এবং পল্টন ছেড়ে যাবার জন্য যা যা প্রয়োজন নিজেদের মধ্যে সলা পরামর্শ করে সব কিছু ঠিকঠাক করবার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কেনটন প্রথমে কথাটা তোলে এবং আমি রাজী হই, তারপর চার্লিও জোটে।
দুদিন পরে ইহুদিটি মারা যায়। কেনটন আর আমি পাহারায় যাই। টাটকা মাংসটা আমাদের খানিকটা চাঙ্গা করেছে, নিস্তেজ দেহে নতুন করে শক্তির নিভু নিভু ক্ষীণ শিখা জ্বালিয়েছে। বিটের প্রান্তে কেনটনের সঙ্গে দেখা হয়। বন্দুকে ভর করে সে উত্তর মুখো পাহাড়ের দিকে চেয়ে আছে। ডেকে বলি, কি হে, অনেকক্ষণ এই ভাবে চুপটি করে দাঁড়িয়ে আছ যে, ব্যাপার কি ? এতক্ষণ এক ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ভাবলাম, শীতে জমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোচ্ছ বুঝি।
ভাবছিলাম, জোয়ান লোক হলে এই বরফের মধ্য দিয়েও হেঁটে যেতে পারে।
কোথায় ? হেঁটে যাবে কোথায় ?
উত্তরে—মোহকের দিকে। এই উপত্যকা অঞ্চলের দিকে তাকাতেও আমার এখন

ঘেন্না করে।
পাঁচশো মাইল দূর খেয়াল আছে ? মনে আছে এডওয়ার্ড জমে গিয়েছিল—গাছের গুঁড়ির মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল সে। তাকে নিয়ে এসে যখন শুইয়ে দিল, সারা গায়ে তার বরফ জড়ান, ঠোঁট দুখানা বরফ দিয়ে বন্ধ করা। ঐ দৃশ্য আমি জীবনেও ভুলব না।
এডওয়ার্ড একলা ছিল, তাই।
আমি ওর চোখের দিকে তাকাই। স্পষ্ট বুঝতে পারি যে নিজের মনটাও এইসঙ্গে যেন উতলা হয়ে উঠেছে। বিড়বিড় করে বলি, ইঁদুরের মত খাঁচায় ধরা পড়েছি আমরা—শক্তি সাহস সব চুলোয় গেছে।
সেই রাত্রেই চার্লির কাছে কথাটা পাড়া হলো। বোস্টনের লোক চার্লি—শহুরে মানুষ। অদ্ভুত ধরণের লোক। বেশ কয়েকশো বই পড়েছে। উপোস করেও গায়ের জোর লোপ পায়নি।
তিন বছর আগে আমরা পল্টনে নাম লিখিয়েছি। চার্লি বলে।
হাঁ, প্রায় তিন বছর হল বটে! ভেবে দেখ, তিনশো লোক ছিল তখন আমাদের দলে। কিন্তু এখন ঠেকেছে ছয় জনে। তিন বছর পরে ইংরেজদের ফাঁসিকাঠে ঝুলবার জন্য মনে হয় একজনও পাওয়া যাবেনা। সে পুরস্কার হয়ত কারও বরাতেই জুটবে না।
এখানে তবুও একজন সঙ্গিনী আছে। বিড়বিড় করে চার্লি বলে,—পালিয়ে গেলে অনেক রাত একলা কাটাতে হবে।
চলে গেলে তোমার কথা ও একবারও ভাববে না, বেশ্যা তো, আর কারও কাছে চলে যাবে। বাড়ির জন্য মনটা কেমন আনচান করে।
পথে খাবারের অভাব হবে না। আমি সাগ্রহে বলি,—যাবার পথে শস্যভরা একটা না একটা দেশ পড়বেই, ভাল ভাল খাবার আর শিকার পাওয়া যাবে।
টাকা কোথায় ? আমাদের মহাদেশীয় মুদ্রার হাজার ডলার দিলেও এক টুকরো রুটি পাওয়া যায় না কোথাও।
টাকার কি দরকার ? বন্দুক সঙ্গে থাকবে তো! বন্দুক থাকলে খাবারের অভাব হবে না।
দেখ চুরি ডাকাতি করতে পারব না। জোর দিয়ে বলে চার্লি,—নচ্ছার হতচ্ছাড়া হয়ে গেছি বটে, কিন্তু চোর বদনাম কিনতে পারব না।
আরে লুঠ করব কেন ? লুঠের কথা আমি বলিনি চার্লি। বলেছি, সাবেক সৈনিকদের সামান্য খাবারের অভাব কোথাও হবে না।
তিনজনেই আগুনের কুণ্ডর পাশে ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। মাঝে মাঝে ধোঁয়ায়-কালো ছোট্ট আস্তানার চারদিকে ফিরে ফিরে চাই। এলি পাহারা দিতে গেছে। তার কথা মন থেকে এখন মুছে ফেলবার চেষ্টা করি। শুধু মুক্তির উপায় চিন্তা করতে চাই। কি করে এই দুঃসহ একঘেয়েমি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তার কথাই ভাবি। গায়ে ক্লোক জড়িয়ে জেকব তার বিছানায় শুয়ে আছে। লাঠির মত দেখতে ছেঁড়া পট্টি জড়ান পা দুখানা বেরিয়ে আছে। চোখ বুজে অসাড়ে পড়ে আছে সে। স্মিথ আস্তে আস্তে কঁকাচ্ছে। হেনরি লেন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। আজ কয়েক সপ্তাহ হল

সে ভুগছে এবং নীরবে রোগ-যন্ত্রণা সয়ে জীবন্মৃতের মত নিজের বাঙ্কে চুপ করে পড়ে আছে।
আমরা তিনজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি এবং পরস্পরের মনোভাব বুঝতে চাই।
তারপর আমি বলি, আর কত সইব ? এখানে মরতে আমার ভয় করে। বাইরে যে কোথাও মরি না কেন, কোন দুঃখ নেই। বরফের উপর ঘুমিয়ে আর ঘুম যদি না ভাঙে তাহলেও কোন খেদ নেই। ঘুমিয়ে থাকব বরফের উপর! খুবই সহজ! মরবার সময় এডওয়ার্ডের মনে নিশ্চয় কোন দুঃখু ছিল না।
খালি পেটেই রওনা হতে হবে তো! চার্লি বলে।
বোকার মত হাসে কেনটন, সে তো বহুকাল গা-সওয়া হয়ে গেছে।
তোমরা তাহলে মোহকেই যাবে, ঠিক করলে ?
শীত শেষ না হওয়া অবধি বোস্টনেও থাকতে পারি।
কোন মেয়ে…
অপলক দৃষ্টিতে আমি তাদের দিকে তাকাই। তারাও তাকায় আমার দিকে। আমি ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বেস জেগে আছে কিনা।
না, কোন মেয়ে থাকবে না। কাটা কাটা ভাবে কেনটন বলে।
আমি উঠে পড়ি, বিছানায় যাই। বেস দুহাত দিয়ে আমায় জড়িয়ে ধরে। সে যে জেগে আছে আমি যেন তা টের পাইনি—এই ভান করে আগুনের দিকে চেয়ে থাকি। কোন রকম নড়া-চড়া না করে চুপটি করে পড়ে থাকি। অনেকক্ষণ কেটে যায়। শেষে মনে হয়, বেস হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।
এলি ফিরে আসে। অতি কষ্টে আস্তে আস্তে সে জামা কাপড় খুলে ফেলে। খুবই ক্লান্ত এলি। চোখ মুখ বসে গেছে। প্রতি পদে সে যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করছে। এক একবার মনে হচ্ছে যে এলিকে আমাদের সঙ্গে যেতে অনুরোধ করি। কিন্তু তার পায়ের যে অবস্থা তাতে দশ বারো মাইল পথও সে চলতে পারবে বলে মনে হয় না।
আগুনে খানকয়েক চেলা কাঠ ঠেসে দেয় এলি। সেইখানে খানিকটা দাঁড়িয়ে, চোখ রগড়ে সে জেকবের বিছানার কাছে যায়। জেকব আর সে আমাদের চাইতে বয়সে বড়, থাকেও আলাদা ভাবে। ঘুমন্ত জেকবের দিকে চেয়ে সে তার গলা অবধি ক্লোকটা টেনে দেয়। স্মিথ কঁকিয়ে ওঠে। খাবার যখন পাওয়া গেছিল সেই সময় ভুট্টার খানিকটা পাতলা জাউ বানিয়ে আমরা আগুনের কাছে রেখে দিয়েছি। এক কাপ নিয়ে এলি স্মিথের মুখে ধরে। লোকটি সামান্য দু এক ঢোক খায়। তারপর এলি পকেট থেকে কি একটা জিনিস বার করে। স্মিথকে বলে, এক টুকরো পেঁয়াজ। খানকয়েক মহাদেশীয় নোট দিয়ে মাসাচুসেটসের একটা লোকের কাছ থেকে এনেছি। জিনিসটা দুর্লভ, কাউর রোগে উপকার দেয়।
তারপর সে আগুনের পাশে বসে পা ছড়িয়ে দেয় এবং উরুতে হাত রেখে চোখ বুজে ঠেসান দিয়ে বসার ভঙ্গীতে পিঠ বাঁকায়। আমি একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকি। চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। তারপর ডাকি, এলি!
সে মুখ ফেরায়। আলেন ? তুমি জেগে আছ টের পাইনি তো!
তখন আর কিছু বলতে পারি না।

কিছু চাইছিলে কি ?
না তো !
আমি পাশ ফিরি। বেসের ঘুম ভেঙেছে। কালো চোখ টান করে চেয়ে আছে। কানে কানে বলে, কখন তোমরা যাবে আলেন ?
যাব মানে ? কোথায় যাব ?
আলেন, সেদিন রাতে প্রথম যখন তোমার কাছে এলাম, আমার পা দিয়ে রক্ত ঝরছিল। সারা গা ব্যথায় টনটন করছিল। তখন তুমিই আমার পা বেঁধে দিয়েছিলে আর বলেছিলে, আমি তোমার সঙ্গিনী।
অন্যেরা যাতে তোমার দিকে হাত না বাড়ায় সেই জন্যই বলেছিলাম।
যাই হোক, বলেছিলে তো ! আমিও হলপ করেছিলাম যে তোমার কাছ থেকে কিছু চাইব না। বলেছিলাম, যতদিন বাঁচব তোমাকেই ভালবাসব ; কিন্তু কোন দাবী জানাব না। ওরা সবাই ভাবত যে আমি খারাপ মেয়ে—খানকি। কিন্তু ভার্জিনিয়ার লোকেদের কথায় কিছুই আসে যায় না আলেন। আমাকে তারা কিছু দিনের জন্য পেয়েছিল, সেটাও বড় কথা নয়। কিন্তু তোমার পরে আর কেউ নেই আলেন ! তুমি চলে গেলে আমি বাঁচব না।
আমি কি করতে পারি বল ! হেঁড়ে গলায় খেঁকিয়ে উঠি আমি। আমরা যদি বিবাহিত স্বামী-স্ত্রী হতাম তো তুমি দাবী করতে পারতে। কিন্তু আমি তো আর স্ত্রীকে ফেলে যাচ্ছি না।
সেরকম কোন দাবীই আমি করছি না আলেন।
আর কিছুদিন এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যেতে পারি—আমার ভেতরটা একদম পচে যাবে।
আমিও এখানে আর থাকতে চাইনা আলেন। তোমাকেও এখানে থাকতে বলছি না। আজ দুবছর জোর লড়াই চলেছে, তবু বুঝতে পারছি না কেন লড়াই করছি। কিন্তু যুদ্ধকে আমি মন প্রাণ দিয়ে ঘৃণা করি। পুরুষদের জীবন বলি দিয়ে আর মেয়েদের জীবনে স্থায়ী দুঃখের ছাপ এঁকে কি লাভ হয় আলেন ?
আমি এর উত্তর জানি না। বিমর্ষভাবে বলি।
তুমি উত্তুরে লোক আলেন তাই তোমার মনটাও উত্তুরেদের মত দরদহীন।
কিন্তু সঙ্গে কোন মেয়ে নিয়ে আমি যেতে পারব না।
বেশ, কোন অনুযোগ করব না। কিন্তু আজকের রাতটা আমায় জড়িয়ে ধর—অন্তত আজকের রাতটায় যতটা পার ভালবাস।
বিছানায় পড়ে থাকি কিন্তু চোখে ঘুম নেই। আদ্ধেক রাত ঘুম আসে না অবশেষে বেসকে ঘুম ভাঙিয়ে বলি, তোমায় না নিয়ে যাব না।
পরদিন রাতে আমরা প্রস্তুত হই। কেনটনকে যখন জানাই যে বেস আমাদের সঙ্গে যাবে, মাথা ঝাঁকিয়ে সে আপত্তি করে। আমি তার সঙ্গে তর্ক করি। বলি, সঙ্গে একটা মেয়ে থাকলে খাবার পাওয়া সহজ হবে।
ও এতটা হাঁটতেই পারবে না।
না না দেখতে কাহিল হলেও ও বেশ পোক্ত আছে। আমি বলি।

তুমি কিন্তু নেহাৎ বুদ্ধু আলেন। স্ত্রী হবার যোগ্য ও নয়। ও তো খানকি। কিসের জন্য একটা খানকির সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছ তুমি ?

তা হলে যে চুলোয় খুশি যাও। আমি যাচ্ছি নে।

বেশ, একটা মেয়ের ব্যাপার নিয়ে তো আর ঝগড়া করা যায় না। একান্তই যদি খানকি-টাকে সঙ্গে নিতে চাও তো নিয়ে চল।

তারপর আমরা রওনা হবার উদ্যোগ করি। কেনটন ও গ্রীনের সঙ্গিনীরা উঠে বসে আমাদের লক্ষ্য করে কিন্তু কোন কথা বলে না। কেনটনের সঙ্গিনী ইতিমধ্যেই জেকবের দিকে নজর দিতে শুরু করেছে। মেয়ে নিয়ে থাকবার মত মরদের অভাব কি ?

জেকব কোন কথা বলেনি। আগেই সে টের পেয়েছে যে আমরা চলে যাচ্ছি; তবু কিছু বলেনি। জীর্ণ পোষাক, একগাল দাড়ি ও চুলে পাকধরা লোকটা বিছানায় বসে আমাদের একমনে লক্ষ্য করতে থাকে। তার চোখের দিকে তাকাবার সাহস আমার নেই।

হেনরি লেনও সাগ্রহে লক্ষ্য করছে। বলে, মোহক অঞ্চলে পৌঁছে আমার কোন আত্মীয়ের সঙ্গে যদি দেখা হয় তো আমার অসুখের কথা বলো না। বলো স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হয়েছে আমার।

কেনটন বলে, তোমার মরবার এখনই কি হয়েছে হেনরি ? ক্রমে ক্রমে খানিকটা দুর্বল হয়ে পড়ছ এই যা।

তোমরা কিন্তু বলবে, দুম করে মারা গেছি আমি।

তার দিকে চেয়ে আমরা হাসবার চেষ্টা করি। তারপর আমাদের পায়ের পট্টি বেঁধে নিই। বেশ বুঝতে পারি, সবাই চেয়ে আছে আমাদের দিকে। এলি এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না।

আমাদের উপর রাগ করছো না তো এলি ? আমি জিজ্ঞাসা করি।

সে জবাব দেয় না। আমরা তোড়জোর করতে থাকি। সযত্নে বন্দুকে গুলি ভরে নিই। প্রত্যেকের দশ রাউণ্ডের মত গুলি আছে। কিন্তু খাদ্য নেই একটুও। মনে মনে যদি মুহূর্তের জন্যও এই চিন্তা করি তো গোটা প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ব্যর্থতা অভিভূত করে ফেলে। তৈরী হয়ে আমরা জটলা করে দাঁড়াই এবং পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। কেউ দরজার দিকে পা বাড়াচ্ছে না। এতদিন যে আস্তানায় কেটেছে শেষবারের মত তার ধোঁয়ায় কালো কাঠ, দেয়ালের গায়ে বানান বিছানা এবং পাথরের তৈরী মেঝে দেখে নিই। আমাদের নিজেদের হাতেই এ সব তৈরী করেছি।

কোথায় চলেছি আমরা ?

কেনটন বলে, যাবার সময় হল।

শেষ অবধি আমি বলে উঠি, চলে এস এলি। কোন অন্যায় কাজ করছি না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ কোন মাইনে পাইনি, রামের বরাদ্দ পাইনি কিম্বা কোন খাবারও জোটেনি। বছর দুয়েক তো পরের হয়ে লড়লাম! চলে এস।

এলি মাথা ঝাঁকায় কিন্তু জবাব করে না।

তারস্বরে জেকব বলে, হায় যীশু! দাঁড়িয়ে আছ কিসের জন্য ? যে নরকে খুশি চলে যাও। তোমাদের মত মেরুদণ্ডহীন ভীরুর সঙ্গ থেকে অব্যাহতি পাওয়াও আশীর্বাদ। একবার

মনে হয়েছিল আলেন যে, তোমার মধ্যে সাচ্চা মানুষ হবার উপাদান আছে। কিন্তু এখন দেখছি, বোস্টনের এই মদ্রাকর আর তুমি একই। কেনটনের কথা ছেড়ে দাও। মন বা বুদ্ধির বালাই ওর নেই। কিন্তু কোনদিন ভাবিনি যে তুমি বোস্টনওয়ালাদের পথ ধরবে। জেকব!

কোন কথার দরকার নেই। এখনও বেরিয়ে যাচ্ছ না কেন?

যাচ্ছি! বিষণ্ণভাবে আমি বলি।

চার্লি দরজার দিকে এগোয় এবং দরজা খুলে ফেলে। হু হু করে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকে। হাত নেড়ে চার্লি তার সঙ্গিনীর কাছ থেকে বিদায় নেয়। কেনটন তার পেছনে যায়। তারপর বেসের হাত ধরে আমিও বেরিয়ে পড়ি এবং দরজা বন্ধ করে দিই।

রাত্রির অন্ধকারে কয়েক পা এগিয়ে আমরা আস্তানার দিকে ফিরে তাকাই। মনে হয় যেন কোন স্পন্দন, জীবনের কোন চিহ্ন কোথাও নেই। লম্বা সার বেঁধে পরিখার আশ্রয়গুলো তৈরী করা হয়েছে। ক্রমে আমরা আস্তানার লাইন ছাড়িয়ে যাই।

বেসের মুখের দিকে ফিরে তাকাই। প্রসন্নতায় উজ্জ্বল তার মুখ। খানিকটা দূরে দূরে হাঁটছে। যেন বুঝিয়ে দিতে চায় যে এখনও তার গায়ে জোর আছে। বলে, আমি হাঁটতে পারি আলেন। আমার জন্য ভেব না। পাকা হাঁটিয়ে আমি।

মনে মনে খুশি হবার চেষ্টা করি। আমরা এখন মুক্ত। আর পেছন ফেরা নয়।

যদি কেউ রোখে? কেনটন বলে। তখন কি হবে?

দৃঢ়ভাবে আমরা বন্দুক চেপে ধরি। পেনসিলভানিয়ানদের ছাউনি পেরিয়ে এসেছি। আমাদের ডাইনে জেনারেল পুয়োরের লোকজনের ঘাঁটি। পাতলা জঙ্গলা জায়গাটির মধ্য দিয়ে আমরা খোলা জায়গায় বেরিয়ে পড়ি। পাহাড়ের উপর দাঁড়ান একটি পাহারাদার আমাদের দেখতে পায়।

জায়গাটা দৌড়ে পার হবে? গ্রীন জিজ্ঞাসা করে।

দৌড় দিলে গুলি করবে। কেনটন বলে। ও তো অফিসার নয়। সোজা কথায় বলব।

ও নিশ্চয়ই অবুঝ হবে না। আশায় বুক বেঁধে বলি।

বেস আমার গা ঘেঁষে চলতে থাকে। আরও আস্তে আস্তে হাঁটি। শান্ত্রীটির কাছে যেয়ে দাঁড়াই। কি বলব বুঝে উঠতে পারি না।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ? জানতে চায় সে।

পেনসিলভানিয়ার লোক আমরা।

তখন সে বুঝতে পারে যে বেস মেয়ে। তার চোখ টান হয়ে ওঠে। তার চেহারাও আমাদের মত দাড়িওলা উসকো-খুসকো। আসলে আমরা যা, তা বুঝতে তার ভুল হয় না।

আমি মরিয়া হয়ে বলি, আমরা দল ছেড়ে চলে যাচ্ছি। আর ফিরব না। যদি মরতে চাও তো আমরাও মরতে প্রস্তুত। গ্রীন তার দিকে বন্দুক উঁচিয়ে ধরে।

ওঃ, দলত্যাগী! খাপছাড়াভাবে লোকটি বলে।

কি, জবাব দাও। কেনটন জানতে চায়।

এগিয়ে যাও! হায় যীশু, কোন লোককে আমি আটকাতে চাই না।

আমরা এগিয়ে চলি। পেছন ফিরে দেখি শান্ত্রীটি তখনও সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে।

গালফ্‌ রোড পার হয়ে আমরা প্যারেডের মাঠে পড়ি। আকাশে চাঁদ উঠেছে। বরফের উপর লম্বা লম্বা ছায়া পড়ে।
বেস খোঁড়াতে শুরু করেছে। তার পায়ের একটা পট্টি খুলে যায়। আমি বেঁধে দিই। গ্রীন গজ গজ করে বলে, আগেই বলেছিলাম সঙ্গে মেয়েছেলে এনো না।
হাতটা খুলেবার সঙ্গে সঙ্গে অবশ হয়ে যায়। বাতাস নেই কিন্তু দুরন্ত শীত। পায়ের পট্টি ধরে আমি হাতড়াতে থাকি এবং কোনমতে বেঁধে দিই। আবার এগিয়ে যাই। সামনে একখানা ধূসর পাথুরে বাড়ি পড়ে।
বোধহয় ভারনামের বাসা। কেনটন বলে, পাশ কাটিয়ে চলে যাব।
পেছন ফিরে আমরা বাড়িটি এড়িয়ে যাই। আর এক লাইন আস্তানার পাশ দিয়ে চলতে থাকি। লাইনটির প্রান্তে আর একজন শান্ত্রীর সঙ্গে দেখা। সে আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায় কিন্তু আমাদের দিকে এগোয় না।
এগিয়ে চল। কেনটন বলে।
আমরা তার পাশ কাটিয়ে যাই। ঘাড় ফিরে সে আমাদের লক্ষ্য করে, কিন্তু থামাবার চেষ্টা করে না। আমরা দৌড়োতে শুরু করি এবং হাঁপাতে হাঁপাতে বনের মধ্যে ঢুকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই। বেস ডুকরে কেঁদে ওঠে—আমায় জড়িয়ে ধরে।
নদীটা কি করে পার হবো ? কেনটনকে জিজ্ঞাসা করি।
সে বিস্ময়ে ঘাড় ঝাঁকায়। বলে, এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভাল। অনেক ভাল গুলিতে মরা। এখন নদীতে নামলে জমে মারা যাব।
আমিই তোমাকে পালাবার যুক্তি দিয়েছি আলেন। ফুঁপিয়ে কাঁদে বেস। আমায় তুমি দোষ দেবে যে আমিই তোমাকে এই বুদ্ধি দিয়েছি।
আঃ খ্রীস্ট—চুপ কর ! একটু চুপ কর। ফিসফিস করে গ্রীন বলে।
আবার চলতে শুরু করি। হুমড়ি খেয়ে গড়াগড়ি খেয়ে গাছ জড়িয়ে ধরে, জামা কাপড় ছিঁড়ে এগিয়ে চলি। বরফ জড়িয়ে বন্দুক গুলো অকেজো হয়ে যায়—বারুদ যায় ভিজে। আমাদের গায়ের জোর ইতিমধ্যেই খতম হয়ে এসেছে। তবু টলতে টলতে কোনমতে বনের মধ্য দিয়ে শুয়েলকিলের পারে নামি। নদীর পারে এসে বরফের উপর শুয়ে পড়ি, জোরে জোরে নিশ্বাস নেই। কারও একবিন্দু নড়বার ক্ষমতা নেই।
পুলে পাহারা আছে। আমি বিড়বিড় করে বলি, পুল দিয়ে পার হবার জো নেই।
হায়রে গাধা, নদীটা জমে গেছে যে !
যে করেই হোক, কথাটা কারো মনে পড়েনি। বোকার মত হেসে উঠি। বেস আমায় আদর করে। বলে, আমি আর ভয় করিনা আলেন। ওখান থেকে তো বেরিয়েছি !
প্রচণ্ড শীত। এখানে শুয়ে মনে হয়, শরীর অবশ হয়ে আসছে। ঝিম আসে। চোখ বুজবার সঙ্গে সঙ্গে অবসাদ শরীর আচ্ছন্ন করে ফেলে। ঘুমোতে ইচ্ছে হয়। বেসকে কোলের মধ্যে টেনে নিই।
কেনটন আমার ঘাড় ধরে। বলে, এখুনি সরে পড়তে হবে আলেন। শান্ত্রীরা নদীর পারে পাহারা দেয়।
টলতে টলতে আবার উঠে দাঁড়াই। নদীর পারে বিরাট বরফের স্তূপ। হোঁচট খেতে খেতে

এগোই। বেস প্রায় হারিয়ে যায়। তার পর নদীর বুকে নামি। বাতাসের ঝাপটায় কোথাও বরফ সমতল হয়ে গেছে। আমরা তখন হামাগুড়ি দিয়ে এগোই। পথ ঠিক করে চলবার মত শক্তি কারো অবশিষ্ট নেই। গ্রীন বন্দুক ফেলে তাই ধরে ধরে এগোয়। এই সময় প্রচণ্ড ভয় হয় যে পেছনে নদীর পার থেকে হয়ত আমাদের দেখা যাবে।
অবশেষে নদীর কিনারে পৌঁছোই। পাড়ে উঠতে প্রাণান্ত কষ্ট হয়। সন্তর্পণে আস্তে আস্তে হাঁপাতে হাঁপাতে এগিয়ে চলি। সামনে আবার একটা বন পড়ে। বনের মধ্যে গভীর অন্ধকার। আমরা হোঁচট খাই, হুমড়ি খেয়ে পড়ি। গা হাত পা কেটে যায়। এই ভাবে আবার এক ফালি মাঠে এসে পড়ি।
কেনটন বলে, আঃ আর পারছিনা। দম ফুরিয়ে গেছে আমার। আজ রাতে আর বেশী দূর যাওয়া যাবে না।
কিন্তু থামাও চলবে না। হাঁপাতে হাঁপাতে বলি।
বেস আমার দিকে তাকায়। তার মুখে অবসাদের ছায়া। খুব আস্তে আস্তে চলছি আমরা, তবু সে পেছনে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। মাঝে মাঝে দৌড়ে এসে আমাদের ধরে, আবার পেছনে পড়ে।
আগেই মানা করেছিলাম মেয়েছেলে সঙ্গে এনো না। চার্লি বলে।
ছাউনিতে ছিল, সেইখানেই থাকত। ছাউনি ছেড়ে পালান কি সহজ ব্যাপার ?
বেস বলে, আমি তোমার সঙ্গেই থাকব আলেন। কোন কষ্ট হচ্ছে না।
আবার পড়ে যায় সে। নেতিয়ে থাকে বরফের উপর। পেছন ফিরে দেখি, প্রাণপণে উঠবার চেষ্টা করছে সে।
আগেই বোঝা উচিত ছিল। কেনটন ঘাড় নেড়ে বলে।
ফিরে গিয়ে তাকে তুলে ধরি। সে আমার হাত ধরে। বলে, আমায় ক্ষমা কর আলেন। সত্যিই আমি যোগ্য মেয়ে নই।
আবার আমরা হেঁটে চলি। ক্রমেই টের পাই যে বেস আমার উপর ভর দিয়ে হাঁটছে। সপ্তাহের পর সপ্তাহ আধপেটা খেয়ে কাটাতে হয়েছে আমাদের। তায় আবার অসুস্থ। কারও পায়ে জুতো নেই। পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। প্রথমে কাপড় দিয়ে জড়ান, তার উপরে হাঁটু অবধি ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমাদের ব্রিচেসও ছেঁড়া। কোটগুলো কাগজের মত পাতলা। কেনটনের মাথায় পরিত্যক্ত একটা টুপি। আমার ও গ্রীনের মাথায় টুপি নেই। আমাদের মাথায় মোরগের মত ঝুঁটি বাঁধা।
তার পর আমরা একটা নোংরা সরু রাস্তায় পড়ি, পথ ধরে চলতে থাকি। হাঁটতে হাঁটতে যেন ঘুমোচ্ছি বলে মনে হয়। সহসা ঘোর কেটে যায়। কেনটন সামনে হাঁটছে। চার্লি থেমেছে। আমার দিকে তাকাচ্ছে সে। ফিরে দেখি, বেস একটা দলার মত বরফের উপর নেতিয়ে পড়ে আছে। তার কাছে ফিরে যাই।
এগিয়ে চল আলেন। সে বলে।
আমি তাকে কাছে টেনে তুলি। আমায় জড়িয়ে ধরে সে কোটে মুখ চেপে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। আবার আমরা চলতে শুরু করি। কেনটন ও গ্রীন আগে আগে চলে।
রাত কাটাবার জন্য আমরা থেমে পড়ি। শুয়েলাকিল থেকে দুই-এক মাইলের বেশী এগোতে

পারিনি। কতটা এগিয়েছি বলতে পারব না। আদ্ধেকটা সময় তো দুঃস্বপ্নের ঘোরেই কেটেছে। কিন্তু নদী থেকে খুব বেশী দূর এসেছি বলে মনে হয় না। শীতে প্রায় অসাড় অবস্থায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করি।

এখন শুধু এডওয়ার্ড ফ্লাগের কথাই মনে পড়ছে। মনে পড়ছে তার বরফ চাপা ঠোঁট ও চোখের কথা। বেশ গাট্টাগোট্টা জোয়ান লোক ছিল এডওয়ার্ড। তবু সে কাঠের গুঁড়ির মত শক্ত হয়ে গিয়েছিল।

ডাল ভেঙে আর কাঠ কুড়িয়ে জ্বালানি জড়ো করি। ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বেস গুটিসুটি মেরে বসে আছে। চার্লি আগুন ধরাবার চেষ্টা করে। চকমকি দিয়ে মিনিট কয়েক ধরে সে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করে চলে কিন্তু কোন লাভ হয় না। অসাড় হাত থেকে চকমকিখানা পড়ে যায়। হাত রগড়ে সে অসাড়তা কাটাবার চেষ্টা করে।

তখন পায়ের পট্টি থেকে এক টুকরো নেকড়া ছিঁড়ে আমি তার উপর খানিকটা বারুদের গুঁড়ো দিই। কেনটন চকমকিখানা তুলে নেয় এবং একটি ফুলকিতে আগুন জ্বলে ওঠে। সযত্নে আমরা আগুনটি জ্বালিয়ে রাখার চেষ্টা করি—ফুঁ দিই। ক্রমে আগুনটি বড় হয়ে ওঠে, শেষে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

দূর থেকে কিন্তু দেখা যাবে। কেনটন বলে।

কিন্তু আগুন তো চাই। আগুন না হলে আজকের রাত কাটাবে কি করে?

আগুনটি বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার চারপাশে এগিয়ে আসি এবং সর্বাঙ্গ দিয়ে তাপ গ্রহণ করি। বেস একদম আগুনের কাছে এগিয়ে যায়। তার মুখে প্রসন্নতার ঝিলিক। বোকার মত হাসে কেনটন। বলে, এডওয়ার্ড একলা এসে ভারি ভুল করেছিল। একলা কোন লোক কি করে যে উত্তরে যেতে পারে, এ আমি ভেবেই পাই না।

আর এডওয়ার্ডের কথায় কাজ নেই।

কেন, বললে দোষ কি? পরিহাসচ্ছলে সে বলে।

আমার পেটটা খিঁচে ধরেছে। কিছু নেই। চার্লি বলে, একটুকরো মাংস যদি এখন পাই তো দশ বছর বেগার খাটতে রাজী আছি।

খাবারের অভাব হবে না; কাল পর্যন্ত খাবার মিলবে।

আগুনের কাছেকাছেই থাকি। আগুনটা জ্বালিয়ে রাখবার জন্য পালা করা হয়। ভাল করে সাফ সাফাই করে আমরা বন্দুকে নতুন করে গুলি ভরে রাখি।

কেনটন প্রথম পাহারা দেয়। আমি বেসকে কোলে নিয়ে শুয়ে পড়ি। চার্লি খানিকটা দূরে সরে আছে। বেশ বুঝতে পারি যে, আমি মেয়ে নিয়ে শুয়ে আছি বলে কেনটনের হিংসে হচ্ছে।

আমার বুকের মধ্যেও ঠকঠক করে কাঁপছে বেস। আমি তাকে গরম করতে পারিনি। তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি। নিজেকে প্রবোধ দেবার ছলে বলি, আমরা শীতে জমে যাব না। কিন্তু কেনটন যদি ঘুমিয়ে পড়ে আর আগুন নিভে যায়?

আমি যোগ্য স্ত্রী নই আলেন। আমাকে সঙ্গে এনে ভুল করেছো। আমি তোমার বোঝা বই আর কিছুই নয়। মনে হয় বেস মুখস্থ পড়া বলছে।

এক সঙ্গেই যাব। আমি বলি, বিশ্রাম করবার মত একটা জায়গা খুঁজে নেওয়া যাবে।

তারপর আবার একসাথে চলব। আজকের রাতের মত এত কষ্ট আর হবে না।
তুমি ভাল লোক আলেন। জোয়ান সাচ্চা লোক বলেই আমার উপর এত দরদ দেখাচ্ছো।
আমিই তো তোমায় আসতে বলেছি। বলেছি যখন, আমিই দেখাশোনা করব! প্রচ্ছন্ন গর্বে ভরসা দিয়ে বলি।
তোমার যত্ন আমি চাইব না আলেন। আমার নিজেরটা আমি নিজেই দেখে নিতে পারব।
আর আমি তোমার দেখ ভাল করব। নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর মত দেখব। বুঝলে ?
সত্যিই একদিন আমার বিয়ে করবে আলেন ?
হ্যাঁ, অনেক কিছুই তো করব বলে ভাবছি।
তারপর সে ঘুমিয়ে পড়ে। আমি তাকে বুকে করে রাখি আর একদৃষ্টে চেয়ে থাকি নক্ষত্রের দিকে। লক্ষ্য করি অন্ধকার আকাশের বুকে ফুলকির মত তাদের উদয় ও আলো বিকিরণের রহস্য। এলি ও জেকবের কথা মনে পড়ে। ভাবি, আর তাদের সাথে একসঙ্গে থাকা বা দেখা হওয়ার উপায় নেই। আমরা চলে আসবার সময় এলির অবস্থার কথা এই প্রথম আমার মনে পড়ে।
নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কেনটন আমায় জাগাচ্ছে।
এবার তোমার পালা আলেন। সে বলে।
আমি উঠে পড়ি। বেসকে ছেড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গে হি হি করে কাঁপতে থাকি! ঘুমের ঘোরে সে আমার নাম ধরে ডাকে।
কিছু কি দেখতে পেয়েছ ?
কিছুই না কেনটন বলে।
তারপর সে গুটিসুটি মেরে আগুনের পাশে কাত হয়। আমি বন্দুকে ভর করে আগুনের শিখার দিকে চেয়ে থাকি।

ভোরবেলায় ছার্ডনির বিউগলের আওয়াজে আমার ঘুম ভেঙ্গে যায়। খুব দূরে আসতে পারিনি তো! বিউগলের আওয়াজ ক্ষীণ, তবু প্রভাতী হাওয়ায় বেশ স্পষ্ট শোনা যায়।
বেস চোখ মেলে আমার দিকে তাকায় এবং প্রশান্ত হাসিতে তার মুখ ভরে যায়। আমি পাশে আছি বলে তার হাসির মধ্যে একটা গভীর সন্তোষের ভাব ফুটে ওঠে। প্রবল মমতায় আমার মুখ স্পর্শ করে সে দাড়িতে হাত বুলোয়।
এখন খানিকটা ভাল লাগছে ? জিজ্ঞাসা করি।
হাঁ। পেটে ক্ষিদে আছে বেশ; কিন্তু আমি খিদে সইতে পারি আলেন। খিদের ভয় করি না।
চার্লি আগুনটা জ্বালিয়ে রাখছে। একটু বাদেই গোটা কয়েক ভুট্টা নিয়ে কেনটন মাঠ থেকে ফিরে আসে। ডেকে বলে, আজ এই দিয়েই উপোস ভাঙব।
আমি উপোস ভাঙার কথা ভাবছি না। ভাবছি এখান থেকে সরে পড়বার কথা। চার্লি বলে, এখনও ছার্ডনির বেশ কাছাকাছিই আছি, এখনও এলাকা ছাড়তে পেরেছি বলা যায় না।

আর আমাদের কেউ বুখতে পারবে না। আমি বলি, কালকের রাতই যখন কেটেছে, তখন আর থামাতে পারবে না।
আমরা উত্তর-পূর্বে যাব। কেনটন গম্ভীরভাবে বলে, জার্সির নীচের দিকে ভাল ভাল রাস্তা আছে।
এখন যদি একটা ঘোড়া থাকত!
চার্লি আমাদের দিকে তাকায়।
হয় ঘোড়া যোগাড় করতে হবে, না হয় বরফের মধ্যে মরণ নিশ্চিত। আমি বলি।
ভুট্টাকটা আগুনে সেঁকে নিই। শুয়োরের খাদ্য, তবু হাভাতের মত তাই খেয়ে ফেলি।
এগুলো বরফের তলা থেকে খুঁড়ে বার করেছি। কেনটন বলে, এতকাল ধরে যে এখানে ছিল এই তো আশ্চর্য। ঝেঁটিয়ে সব ভুট্টা কেটে নিয়ে গেছে।
আমরা পূবমুখো নোরিস টাউনেও যেতে পারি। ওদিকে ভাল খাবার পাওয়া যেতে পারে।
নি শেষে ভুট্টাকটি শেষ করে বন্দুকগুলো আর গুলিবারুদ দেখে নিয়ে আবার রওনা হই। আস্তে আস্তে চলেছি কিং অফ প্রুশিয়া রোডের দিকে। গত রাত্রে বেশ শিক্ষা হয়েছে। বেশ বুঝতে পারছি খুব সামান্যই শক্তি অবশিষ্ট আছে আমাদের এবং তা বাঁচিয়ে চলা কত দরকার। এই সকালেও শীত দুরন্ত, তবু কালকের রাতের মত অতটা নয়। আকাশে সূর্য দেখা যাচ্ছে। পরিস্কার উজ্জ্বল সূর্য। লম্বা লম্বা নীল ছায়া পড়েছে বরফের বুকে। ঝিকমিক করে বরফ। প্রতিটি দানা আমাদের চোখে ধারালো আলোর বাণ হানে।
বেসের মুখে সহাস্য দীপ্তি। আমার দিকে মুখ ঘুরিয়ে সে দেখায় যে কতটা লম্বা লম্বা পা ফেলে সে চলেছে।
আমি পাকা হাঁটিয়ে আলেন। বেশ পাকা হাঁটিয়ে কিনা বল?
তা বটে। আমি সায় দিই।
সবাই উৎসুক। কেনটন সামনে যাচ্ছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে বন্দুক দুলিয়ে বেশ আত্মঃপ্রত্যয়ের সাথে হাঁটছে। কেনটন পথ দেখাচ্ছে বলে সবাই খুশি। আমার থেকে চার বছরের বড় সে—বেশ জোয়ান লোক। বেস দেখতে অনেকটা বালকের মত। লিকলিকে পাতলা শরীর। মাথায় লম্বা কালো চুলের কোঁকড়ান গোছা। চার্লি একটা গানের দু একটা কলি গাইছে।
বেস বারবার আমার দিকে তাকায়। বলে, কোন অনুশোচনা হচ্ছে না তো আলেন?
না।
এলির কথা মনে পড়ছে। চার্লি বলে, এলির মত লোকেদের আমি কোনদিনই বুঝতে পারি না। অদ্ভুত সহ্যগুণ ওর।
সেও এলে পারত।
জেকবকে ছেড়ে সে কিছুতেই আসবে না। জেকব যতই বদ মেজাজি হক না কেন, ওদের দুজনের মধ্যে একটা সমঝোতা আছে। ইহুদিটিকে বাদ দিলে, অত ভাল আর কাউকে বাসে না জেকব। ঠিক বুঝতে পারি না, তবে ইহুদিটি মারা গেলে জেকব যত দুঃখ প্রকাশ করেছে, তাকে অমন দুঃখ প্রকাশ করতে আমি আগে কখনও দেখিনি।
ইহুদিদের ভয় করে আমার। বেস বলে, পনেরো বছরের আগে কোনদিন ইহুদি

দেখিনি। মা বলতেন যে একদিন একজনকে দেখিয়ে দেবেন ; তাহলেই নাকি ভালভাবে বাইবেল বুঝতে পারব।

বোস্টনে অনেক ইহুদি আছে। চার্লি বলে—স্যাম আডমস তাদের নিঙড়ে পয়সা আদায় করতে ভারি ওস্তাদ। বিপ্লবের কথা বলে সে ওদের শেষ শিলিংটি পর্যন্ত আদায় করে নিত। আর ওই গাল-গপ্পের চাইতে ইহুদিদের নিঙড়াবার কায়দার জন্য লোকে তাকে বেশী শ্রদ্ধা করত।

শুনছি হ্যামিলটনও নাকি ইহুদি ?

চোখের ভাব দেখে তো তাই মনে হয়।

ততক্ষণে আমরা রাস্তার কাছে এসে পড়ি। কেনটন আমাদের জন্য অপেক্ষা করে। সেখানে দাঁড়িয়ে সে কান পেতে শোনে।

কি শুনছ ? আমি জিজ্ঞাসা করি।

শিবিরের খুব কাছাকাছিই আছি আমরা। ভাবছি, বনের পথে আরও খানিকটা ঘুরে গেলেই বোধহয় ভাল হয়। গাছের আড়াল অনেক নিরাপদ।

চারদিকে কোয়েকারদের বাস। ও ব্যাটাদের আমি বিশ্বাস করি না।

ভয় করবারও কিছু নেই। আমি দৃঢ়ভাবে বলি।

রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলি আমরা। বেস আমার পাশে। আবার খোলা রাস্তায় পড়ে নতুন করে দূরত্ব অনুভব করি। বুঝতে পারি, বরফে ঢাকা পাহাড়-ঘেরা মোহক অঞ্চল শত শত মাইল দূরে। বেস আমার গা ঘেঁষে আবার মুখের দিকে তাকায়। বেশ বুঝতে পারি, আমার মত সেও মনে মনে বুঝছে যে এত দূর পথ অতিক্রম করা তার সাধ্যাতীত। অতটা শক্তি তার নেই। ছোট্ট ভীতু বালকের মত সে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, মাঝে মাঝে আমার বেজায় ভয় করছে আলেন। আমায় একটু ধর।

কিছু শুনতে পাচ্ছ কি ? কেনটন জিজ্ঞাসা করে।

আমি মাথা নাড়ি। পথ ধরে আমরা নোরিস টাউনের দিকে এগিয়ে চলি। খুবই আস্তে হাঁটছি। ঠাণ্ডাটা ক্রমেই যেন বেশী লাগছে। শ'খানেক পা এগিয়েই থমকে দাঁড়াই।

ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনছি। কেনটন বলে।

ও পল্টনের নয়। শব্দটা আমিও তখন শুনছি। বরফের পর অস্পষ্ট ঠকঠক আওয়াজ।

বেস আমার দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকায়।

না, পল্টনের না। চার্লি চীৎকার করে বলে, মনে হয় পথ দিয়ে যাচ্ছে।

একটার বেশী ঘোড়া। কদমে চলেছে।

চাষীরা তো এমন ভাবে চলে না !

শিগগির গাছের আড়ালে লুকোও। কেনটন চেঁচিয়ে ওঠে।

কিন্তু রাস্তার দুই দিকেই মাঠ। যেদিক থেকে শব্দটা আসছে, শুধু সেই দিকেই গাছ আছে। বরফের একটা ঢিবি দেখে বোঝা যায় যে নীচে পাথুরে দেয়াল আছে। রাস্তার উপর লম্বা ছায়া এবং বরফের ঝিকিমিকি এমন এক অদ্ভুত দৃশ্যপট সৃষ্টি করে যে অনেকদিন পরেও সে দৃশ্য আমার মনে ছিল।

জড়পিণ্ডের মত আমরা দাঁড়িয়ে পড়ি। বেস বলে, আমিই তোমাকে বিপাকে ফেলেছি

আলেন। ভগবান আমায় ক্ষমা করুন।

পথ ছেড়ে কেনটন আবার সামনে ছোটে। চার্লি তার পেছনে। কেনটন হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় আর চার্লি তাকে তুলে ধরে। বেসের হাত ধরে আমি তাকে পাথুরে দেয়ালের গায়ে জমাট বরফের মধ্য দিয়ে টেনে নিয়ে যাই। দেয়ালটা বেয়ে উঠি। গুলি খাওয়া মানুষের মত বারে বারে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে কেনটন। পেছন ফিরে দেখি জনা বারো ঘোড়-সওয়ার আমাদের দিকেই ছুটে আসছে।

ম্যাকলেনের হানাদার দল। কেনটন কেঁদে ফেলে।

সওয়ারদের একজন সামনে এগিয়ে আসে। শুনতে পাই সে আমাদের থামতে বলছে। জোর কদমে ছুটছে তারা। অশ্বখুরের আওয়াজ আমার কানে ড্রামের শব্দের মত বাজে। তবু বেসকে টানতে টানতে এগিয়ে চলি। কেনটন আর চার্লি আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা বেশ বুঝতে পারছে যে বেসকে নিয়ে সওয়ারদের আগে আমি বনে পৌঁছতে পারব না। তবু তারা অপেক্ষা করে এবং বন্দুক নিয়ে তাক করে।

আমি চেঁচিয়ে বলি, দোহাই ভগবানের, গুলি কোরো না। পালাও।

আমরা প্রায় গাছের কাছাকাছি এসে পড়ি। মনে হয়, ঢুকে পড়তে পারব। দৌড়োবার ব্যাথায় আমার কান্না পায়। কয়েকটা ঘোড়া বরফের মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়ে। সামনের লোকটা চেঁচিয়ে বলে, থাম, না হয় গুলি করব।

জাহান্নামে যাও। তারস্বরে খেঁকিয়ে ওঠে কেনটন, দৌড়োও আলেন। ওরা বরফের মধ্যে পথ হারিয়েছে।

আবার আমি ফিরে তাকাই। চার্লি ও কেনটনের কাছাকাছি এসে পড়েছি। বন্দুক তাক করে ওরা বনের দিকে ছুটছে। লোকগুলো ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে। আমাদেব পেছনে হঠাৎ গুলির আওয়াজ হয়। বেস আমার হাত থেকে ছিটকে পড়ে বরফের উপর, তীব্র আর্তনাদ করে ওঠে।

সবই দেখে কেনটন। গালাগাল দিতে দিতে সে আমার দিকে ছুটে আসে। চার্লিও আসে তার পেছু পেছু। আমি ঘুরে দাঁড়াই। অশ্বারোহীরা তখন আমাদের ঘিরে ফেলেছে। সব কিছুই আমার চোখে ঝাপসা লাগে। চোখের উপর সাদা বরফ লালচে দেখায়, আমি গুলি ছুঁড়ি। কেনটন আর চার্লিও ছোড়ে। যন্ত্রের মত আপনা থেকে তাদের বন্দুক থেকে গুলি ছুটে যায়। একজন ঘোড়সওয়ার ঘোড়া থেকে গড়িয়ে পড়ে। তার সেই পড়ে-যাওয়ার ছবি চিরকালের মত আমার মনে গেঁথে যায়। বেসের দিকে ফিরে তাকাই। কি হয়েছে, ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করি। বরফের পর কুঁকড়ে পড়ে আছে বেস।

ওরা আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। এখন লড়াই করা নিরর্থক। কেন যে গুলি করলাম ভেবে অবাক হয়ে যাই। ওরাও আমাদেরই মত দাড়িওয়ালা, জীর্ণ জামা-কাপড় পরা। আমাদের মতই ওদের পায়ে রক্তমাখা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। আমাদের মতই ওরা শীর্ণ ও ক্লান্ত।

অশ্বারোহীরা আমাদের পাকড়াও করে। জোর করে আমি বেসের কাছে যাবার চেষ্টা করি। বলি, ওর কাছে একবার যেতে দাও। যখন ধরেই ফেলেছো তখন আর কি। একবার যেতে দাও!

ম্যাকলেন আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। ছোট্ট এক চিলতে গোঁফ ছাড়া গাল কামান যুবক।

পরণে সাদা ব্রিচেস আর একটা চমৎকার নীল কোট…তরোয়াল পিস্তল আর একটা ভাল টুপি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে সে, মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে।
পল্টন ছেড়ে পালাচ্ছিলি? জিজ্ঞাসা করে সে। যাকে আমি ঘোড়া থেকে পড়ে যেতে দেখেছি, দুটি লোক তাকে ম্যাকলেনের পেছনে বয়ে নিয়ে আসে। বোঁ করে ঘুরে ম্যাকলেন জিজ্ঞাসা করে…নাম।
ডেভ সিলি।
আহত হয়েছে?
সবই দেখেছি। লোকটির মাথায় গুলি লেগেছে। বেসের কথা ভাবতে ভাবতে চট করে মনে হয়, কার গুলি লাগল? কার গুলি ওটা?
শালা শুয়োরের বাচ্চারা। ম্যাকলেন আমাদের বলে,—নচ্ছার ভীতু শূয়োরের দল কোথাকার! নিজের হাতে যদি তোদের ফাঁসিতে লটকাতে পারতাম তবে শান্তি হতো, অবশ্য এজন্য তোদের ঝুলতেই হবে।
বিমর্ষভাবে কেনটন চেয়ে থাকে। চার্লি বলে, ওকে ওর সঙ্গিনীর কাছে যেতে দাও। ওর সঙ্গিনীকে গুলি করেছ তোমরা।
আমি হাত ছাড়িয়ে যাবার চেস্টা করি। জনকয়েক মিলে বেসকে চিৎ করে দেয়। তারস্বরে আমি চেঁচিয়ে উঠি, এই কেউ হাত দেবে না। হা খ্রীস্ট, ওকে একটু একলা থাকতে দাও।
এটা একটা মেয়েছেলে। ওদের একজন বলে ওঠে।
আমি ওদের অনুনয় করিঃ ওর কাছে যেতে দাওনা একবারটি। তোমরা তো ওকে মেরেই ফেলেছ, এখন আর কি? যেতে দাও।
চুপ কর শালা!
যেতে দাও বলছি…। ধাক্কাধাক্কি করে আমি ওদের হাত ছাড়িয়ে ছুটে যাই। কেমন করে হাত ছাড়ালাম বলতে পারি না। কেউ আমাকে আটকায়নি। ছুটে গেলাম বেসের কাছে। যে-কটি লোক তার উপর ঝুঁকে দেখছিল, আমাকে দেখে তারা সরে দাঁড়াল। হাঁটু ভেঙে আমি তার পাশে বসে পড়ি। দেহের কোথাও গুলি লেগেছে। সামনের দিকের জামা কাপড় রক্তে চুপচুপ হয়ে গেছে। আমি তার গাল ঘষে দিই। বেস হঠাৎ চোখ মেলে। বারবার তার গাল ঘষতে থাকি।
আলেন। সে ডাকে।
কোন জবাব মুখে জোগায় না। দু বছর পল্টনে থেকে যুদ্ধ করে কোন আঘাত প্রাণান্তকর তা বুঝতে কষ্ট হয় না। চোখের চাহনি দেখেও বোঝা যায়। সেও বুঝতে পেরেছে! তারই গভীর উপলব্ধির ছাপ তার চোখে ফুটে উঠেছে। কি বলব আমি?
সে বলে, আমার জন্যই তোমরা এই ঝামেলায় জড়ালে আলেন। পুরুষের যোগ্য স্ত্রীলোক নই আমি।
মাথা নাড়িয়ে আমি তাকে প্রবোধ দিই। সে হয়ত বুঝতে পারে যে আমি চলে যাচ্ছি, তাই ফিস ফিস করে বলে, আর একটুখানি আমার কাছে থাক আলেন।
আস্তে আস্তে আমি উঠে দাঁড়াই। গলা ছেড়ে বলি, আমারই বোঝা উচিত ছিল যে একটা মেয়ের পক্ষে এতটা দূর হাঁটা সম্ভব নয়।

অশ্বারোহীরা আমাকে ধরে নিয়ে আসে। বাঁকা চোখে ম্যাকলেন লক্ষ্য করছে আমাকে। কেনটনের মুখে পরিপূর্ণ হতাশার ছবি। তাদের কাছাকাছি এলে চার্লি গ্রীন আমাকে ধরবার জন্য হাত বাড়ায়।
আলেন।
মনে ভাবি, এ গুলি তো আর-যে কারও গায়ে লাগতে পারত। অসম্ভব কিছুই নয়। মনে মনে ভাবি আবার ফিরে যেতে হবে।
এ ভাবে মরায় খুব কষ্ট হয় না। দরদী কণ্ঠে চার্লি বলে।
আমি দুঃখ করছি না। ওর জন্য আমি দুঃখ করছিনে। মরিয়া হয়ে বলে উঠি।
শান্ত হও আলেন।
হাঁ হে শান্ত হও! শিগগিরই ওর সঙ্গে মিলতে পারবে। ম্যাকলেন বলে।
চীৎকার করে ওঠে কেনটন, দোহাই ভগবানের, ওকে আর খোঁচা দিও না। ওকে না হয় বিদ্রুপ নাই করলে।
আবার আমাদের রাস্তায় নিয়ে আসে। আমি পেছনে ফিরে তাকাই। রোদে ঝলমল ঠাণ্ডা প্রভাতের রূপে চোখ ঝলসে যায়। রাস্তায় এসেই দেখি, একদল সৈন্য হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসছে। ছাউনিতে বসেই তারা গুলির আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। সৈনিকেরা আমাদের ঘিরে ধরে। ঘটনাটি নিয়ে তাদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়।
পেনসিলভানিয়ার দলত্যাগী।
দুটি লোক বেসকে নিয়ে আসছে। আমারই পাশাপাশি হাঁটছে তারা।
ওয়েন খুব গর্ব করে বলে বেড়ায় যে তার দলের কেউ ভেগে যায় নি।
এইবার খানিকটা দেমাক ভাঙবে ওর।
মোহকে চলেছি আমরা! কেনটন হেসে উঠে। ··হা ভগবান, খুব মোহকে যাচ্ছি।
ম্যাকলেন তখন ব্রিগেডের ফৌজদারটির হেপাজতে আমাদের দিয়ে দেয়। বলে, এদের ছাউনিতে নিয়ে যাও। আটকে রাখবে! আমার এক সওয়ারকে খুন করেছে। আমি নিজেই ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনব।
কিন্তু আমরা খুনী নই। গ্রীন চেঁচিয়ে ওঠে।—আপনার লোকজন গুলি করবার পরেই আমরা গুলি করেছি।
এই বেজন্মা শূয়োরদের নিয়ে যাও। ম্যাকলেন খেঁকিয়ে ওঠে।
সৈনিকেরা নিয়ে চলে আমাদের। সৈন্যদলের যুবক অফিসারটির নাম ক্যাপ্টেন কেনেডি। লোকটা খুব কড়া নয়। এরাও মাসাচুসেটসের লোক। কেনটন এদের জনকয়েককে চেনে। তাই পথে বিশেষ দুর্ভোগ ভুগতে হয়নি। অফিসারটি বুঝতে পারে কত দুর্বল আমরা। তাই আস্তে আস্তে মার্চ করিয়ে নিয়ে আসে। তবু দীর্ঘ পথ চলতে হবে। কেনটন এগিয়ে এসে আমার ঘাড়ে হাত দেয়। বলে, কাল রাতে খুব ফাঁকি দিয়েছিলাম কিন্তু এত শিগগির যে ফিরতে হবে তা ভাবিনি। সরাসরি কোন অশ্বারোহীর হাতে ধরা পড়ব, এ ভাবতেই পারিনি।
তোমায় দুষছি না কেনটন।
মেয়েটি মারা গেল! সেজন্য তুমি হয়ত আমাকে দোষ দেবে আলেন। ওর মৃত্যুর জন্য

আমিই দায়ী।

না, কেমটন কাউকেই দুষছি না আমি।

কিং অফ প্রুশিয়া রোড ধরে আমরা চৌমাথায় এসে পড়ি এবং ডাইনে মোড় ঘুরে ছাউনির দিকে চলতে থাকি। ভারনামের সৈন্যদলের আস্তানার পাশ দিয়ে যাবার সময় কেনেডি একজন ড্রাম বাজিয়েকে ডাকতে পাঠায়। পেনসিলভানিয়া আর নিউ জার্সির লাইনের কিছু কিছু লোক আমাদের দেখবার জন্য ভীড় করে। নিহত ও দণ্ডিতের স্মরণে ড্রাম বাজিয়েরা চাপা একঘেয়ে বাজনা বাজাতে শুরু করে। কেউ কেউ মাথা হেঁট করে। আমরা ধীরে ধীরে এগোই। শুনি একজন বলছে···বেচারী!

চলবার সময় ঠাণ্ডা বাতাস আমাদের অস্থির করে তোলে। রোদে ঝিকমিক-করা বরফে চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ও নিয়ে আমি বড় বেশী ভাবছি না। বুঝতে পারছি, বেস মারা গেছে এবং ইতিমধ্যেই সে আমার পল্টনের জীবনের স্মৃতির অংশ হয়ে পড়েছে। ওরা যায়-আসে, ডাক্তার বলেছিল একদিন। এমনি করেই মস ফুলারও মারা গেছে। আর ভাবতে পারি না। আমরা এক পরিখার আস্তানায় ঢুকে পড়ি। ঠাণ্ডা কাঠের ঘরে একখানা ক্যাম্প টেবিলের পাশে কর্ণেল ভারনাম আছেন। কেনেডি সেলাম করে। সৈনিকেরা 'এটেনশন' হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আমরা একেবারেই অবসন্ন হয়ে পড়েছি। কুঁজো হয়ে হাত ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

এরা দলত্যাগী স্যর। কেনেডি বলে, ক্যাপ্টেন ম্যাকলেন এদের পাকড়াও করেছেন। এরা গ্রেপ্তার করবার সময় বাধা দেয় এবং ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের একজন সঙ্গী মারা গেছে। এদের বন্দুক আমার কাছে থেকে জমা আছে। সবকটা থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে। ম্যাকলেনের লোকটির মাথায় গুলি লাগে। এদের সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। বুকে গুলি লেগে সেও মারা গেছে। ম্যাকলেনের লোকেরা একবার মাত্র গুলি ছোড়ে।

রেজিমেন্টের নাম কি? ছাড়া ছাড়া ভাবে বলে কর্ণেল। আমাদের ঘটনার মত এত ঘটনা ঘটে গেছে যে এখন আর এতে তেমন কোন্ চাঞ্চল্যর সৃষ্টি হয় না।

চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া।

ওয়েনের লোক?

আমরা ঘাড় নাড়ি।

নাম কি তোমাদের?

নাম বলি।

হতচ্ছাড়া জানোয়ারের দল, বুঝলে কেনেডি, জন কয়েককে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে। দেখি তাহলে যদি বশে আনা যায়!

কেনেডি কোন জবাব দেয় না।

এদের কয়েদখানায় রেখে দাও।

লম্বায় আড়ে চার হাত করে একটি কামরায় আমাদের নিয়ে আসে। খুপরিটির কোন জানালা নেই। গাছের গুড়ির ফাঁকে ফাঁকে ফুটো আছে। মেঝে নোংরা, চাল নীচু এবং আগুনের কোন ব্যবস্থা নেই ঘরে।

ওরা দরজা বন্ধ করে দেয়। শুনলাম কেনেডি বলছে···বেচারী!

নীরবে আমরা মেঝের বসে থাকি। ভাঙা কাঠের ফাঁক দিয়ে পাতলা আলোর ফালি ঢুকছে। কেনটনের হলদে দাড়িতে সোনার ছোপ লাগিয়ে দিচ্ছে সোনালী রোদ।
সবাই শীতে জমে যাচ্ছি। আপনা থেকেই আমরা পরস্পরের কাছে ঘেঁসে আসি। কিন্তু কেউ কথা বলি না।
আমার পা দুটো টনটন করছে। সামনে পা ছড়িয়ে বসি। থরথর করে আমার দেহ কাঁপছে। কি জানি বোধহয় ঠাণ্ডায়।
ফাঁসিতে ঝুলতে হবে এ কোনদিন কল্পনাও করিনি। শিশুর মত অবাক বিস্ময়ে বলে ওঠে চার্লি।

আলো নিভে আসে—মিলিয়ে যায় কয়েদখানার আলোর ঝিলিক। তার বদলে দেখা দেয় গভীর ছায়া। বিকেলটা দীর্ঘ ও মন্থর লাগে। তারপর চটপট নেমে আসে রাত্রির আঁধার। সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডাও বাড়তে থাকে। গাছের গুঁড়ির বেড়ার ফাঁক দিয়ে শিরশিরে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢোকে কয়েদখানায়। মেজে বরফের মত ঠাণ্ডা! আমাদের হাত পা জমে শক্ত হয়ে আসে। নড়াচড়া করে খানিকটা আরাম পাবার চেষ্টা করি।
তিন তিনবার বাইরের পাহারাওলা বদলী হল! ভাঙা দরজার ফুটো দিয়ে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি জীর্ণবাস শীর্ণ সৈনিকটির চেহারা।
এখনও পর্যন্ত কিছুই খেতে দেওয়া হয়নি আমাদের। ক্ষিদের জ্বালায় প্রথমে আধ পাগলা হয়ে পড়ি। প্রথম প্রথম ক্ষিদে এমনিই তীব্র হয়। তারপর গা-সওয়া পেটের জ্বালা ক্রমে ক্রমে কামনার রূপ নেয়, সব কিছুর জন্য, বাঁচার জন্য ছটফট করে মানুষ। তেষ্টার মত এ জ্বালা সহ্য করা আর তত কঠিন নয়।
আমরা দরজায় ধাক্কাধাক্কি করি।…পাহারাওলা ও পাহারাওলা! দোহাই খ্রীস্টের, আমাদের কিছু খাবার আর একটু জল দাও।
দরজার কাছাকাছি এসে সে উৎসুক দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকায়।
একটু জল দাও!
ভাল খাবারের কিছু অপচয় করতে বলছ! সে বলে।
যা হোক কিছু, খানিকটা জল হলেও চলবে।
ভাবছ বুঝি আমিই খুব মজা মেরে খেয়েছি। তোমরা কি মনে কর, এক পক্ষের মধ্যে মাংস জুটেছে আমার? সে জিজ্ঞাসা করে?
আমাদের খানিকটা জল এনে দাও।
সে এক পাত্র জল এনে দেয় এবং আমরা ঢকঢক করে খাবার সময় সে আমাদের লক্ষ্য করতে থাকে! বলে, সত্যিই তোমরা হতভাগা। ওয়েনের লোকজনদের যে এত দুরবস্থা তা আগে শুনিনি তো!
কয়েদখানায় আমাদের রাখছে কেন?
জিজ্ঞেস করিনি তো!
রাত্রি নেমে আসে। বরফঠাণ্ডা মেজেতেই শুয়ে পড়ি। গরম হবার জন্যে কেনটন আমার

গা ঘেঁসে শুয়ে পড়ে। দরজায় ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চার্লি। কালো ছায়ামূর্তির মত দেখায় তাকে। চোখ বুজে ঝিমুতে ঝিমুতে পাশে-শোওয়া দেহটিকে বেস বলে মনে হয়। কয়েদখানাকে মনে হয় আমাদের সাবেক আস্তানা। ভাবি, বেস এখুনি হয়ত নড়ে উঠবে, আমাকে স্পর্শ করবে—আমার দাড়িতে হাত বুলিয়ে দেবে। বেসের কথা বলবার জন্য অপেক্ষা করি। ঘুমের ঘোরেও হয়ত তার কণ্ঠস্বর শুনতে পাব। প্রথমে তার কথার টুকরো কানে আসে···ক্রমে খানিকটা বেশী···তারপর আরও বেশী।

কেনটনকে ঝাঁকানি দিয়ে বলি, বেস? তুমি বেস?

তোমার কি মাথা খারাপ হল নাকি আলেন?

না-না, স্বপ্ন দেখছিলাম। বড্ড খিদে পেয়েছে কেনটন। তোমার কি মনে হয় ওরা আমাদের খাবার দেবে? খেতে না পেলে আর কতদিন বাঁচতে পারে মানুষ? আমাদের যদি ফাঁসিও দিতে চায় তাহলেও তো খেতে দেওয়া উচিত, বাঁচিয়ে রাখা দরকার।

চার্লি গজ গজ করে ওঠে ঃ আমি ফাঁসি কাঠে ঝুলছিনে। ঈশ্বরের দিব্যি আলেন, ফাঁস গলায় পড়বার আগেই আত্মহত্যা করব।

গুলি করে ভাল করিনি। কেনটন অনুশোচনা করে, যখন ধরেই ফেল্ল, তখন গুলি করা উচিত হয়নি।

বেসকে ওরা প্রথমে গুলি করেছে। বিড়বিড় করে বলি।

আরে বোকা, তুমি কি ভাবছ তুষার ও বরফের মধ্য দিয়ে পাঁচশো মাইল ও হেঁটে যেতে পারত? মোহকের মত অত দূরে হেঁটে যাবার মত মেয়ে সে নয়। কেন যে তাকে সঙ্গে নিয়েছিলে তাই ভেবেই আমি অবাক হয়ে যাই।

দিনরাত কোন মেয়ের সঙ্গে কাটালে তার উপর একটা আসক্তি, মায়া জন্মায়। মেয়ে ছাড়া এমনি ভয়ানক ঠাণ্ডা রাত কাটান যায়?

সঙ্গিনী আমারও ছিল। কেনটন বলে, কিন্তু সে তো বিবাহিতা স্ত্রী নয়। বরফের উপর দিয়ে দীর্ঘ পথ চলব বলে মনস্থ করে কিছুতেই আমি মেয়ের বোঝা সঙ্গে নিতাম না।

থাক্, আলেনকে একলা থাকতে দাও। চার্লি বলে ওঠে, বেচারী অনেক দুঃখ পেয়েছে। মেয়েটিতো মারা গেছে, তাই না?

হাঁ, মারা গেছে।

তাহলে আলেনকে খানিকটা আনমনা থাকতে দাও।

কেনটনের উপর কোন বিদ্বেষ নেই আমার। শান্তভাবে বলি, সঙ্গিনীর জন্যও কোন শোক করব না। সে তো আর আমার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। তাছাড়া পুরুষের যোগ্যও সে নয়···। আর বলতে পারিনা। দুহাতে মুখ চেপে ধরি। আমি জানি, সেই গভীর থমথমে নিস্তব্ধতার মধ্যে ওরা আমার ফোঁপানি শুনছে।

তারপর অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ করে থাকে। শান্ত্রী যেখানে পায়চারি করছে, সেদিক থেকে বরফের চুরমুর শব্দ কানে আসে। কয়েদখানার চালে বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ। শুয়েলকিল নদীর দিক থেকে বাঘের ডাক শোনা যায়।

ছাউনি ফেলবার আগেকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে। এণ্ডিওয়াইনে এক যুদ্ধ হয়। সে যুদ্ধে চার নম্বর নিউইয়র্ক রেজিমেন্টের তিনজন মারা যায়। তারপর থাকে নয়জন।

এরপর মস ফুলার, এডওয়ার্ড ক্লগ আর ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার মরে। থাকে দুজন। এইবার যাচ্ছে আলেন হেল, চার্লস গ্রীন আর কেনটন ব্রেমার। হেনরি লেনও মুমুর্ষু। ক্লার্ক মারা গেছে, কিন্তু মরবার সময় আমায় অভিশাপ দিয়ে গেছে। এডওয়ার্ডও পুড়ে যাচ্ছে আগুনের মত। ইহুদিটি সজ্ঞানে শান্তিতে মারা গেছে। সহসা তার উপর আমার হিংসে হয়। বেজায় রাগ হয়। ইহুদিটির বিছানার পাশে হাঁটু ভেঙে বসা জেকবের ছবি কল্পনা করবার চেষ্টা করি! বাকী থকে এলি—একমাত্র এলি। জোরে কঁকিয়ে উঠি।
চার্লি বলে, শান্ত হও আলেন। আমরা যা দেখেছি, এতটা দেখলে কোন মানুষের ভয় থাকে না।
হাঁ কোন ভয় থাকে না। আমি পুনরাবৃত্তি করি।
কেনটন বলে, মরতে ভয় করি না, কিন্তু ফাঁসিতে মরতে ভয় হয়। জয় পাহাড়ে একটা লোকের ফাঁসি হয়। মাথা খারাপ হয়ে লোকটা তার লেফটন্যান্ট অফিসারকে খুন করে। এজন্য তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, পাহারা দেবার সময় দেখেছি, নেকড়েগুলো তার দেহের জন্য লাফালাফি করেছে!
চার্লি হা হা করে হেসে ওঠে। এতসবও তোমার চোখে পড়ে কেনটন।
ভগবান সাক্ষী, সত্যিই দেখেছি। দেখলাম চাঁদের আলোয় নেকড়েগুলো লাফিয়ে অনেক উঁচুতে উঠছে।
থাক, আর বলবার দরকার নেই। আমি চেঁচিয়ে উঠি, ওসব কথা আর বলতে হবে না। এর পরেকার নিস্তব্ধতা উত্তেজনা সৃষ্টি করে! আমি যে ভাবে চিন্তা করছি ওরাও যদি সেই-ভাবে চিন্তা করে, মানে আস্তানা ছেড়ে আসবার পর প্রতিটি সিদ্ধান্তের কথা ভাবে, তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায় বলতে পারি। কেনটন ভাবছে, বেস না থাকলে আমরা অনেক দূর চলে যেতে পারতাম। তাহলে বেসের মৃত্যুর পাপ যদি কেনটনের হয় তবে তার মৃত্যুর পাপ আমার।
হঠাৎ আমার মনে হয় যে আজকের রাতে বেস যদি এখানে থাকত তাহলে সে ভড়কাত না। কোন ভয় পেত না। শুধু আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাইত। তার মুখ প্রশান্ত থাকত এবং হাত দিলেই সেই প্রশান্তি আমি অনুভব করতে পারতাম।
কেনটনকে বল্লাম, মরবার সময় বেস খুব যন্ত্রণা পেয়েছিল কি? তুমি তো তাকে পড়ে যেতে দেখেছিলে কেনটন। মুখে কি কোন যন্ত্রণার চিহ্ন ছিল?
এখন আর কোন যন্ত্রণাই নেই। কেনটন বলে।
বুকে ব্যথা নিয়ে সে মরেছে, একথা যদি ভাবি তো আর কোনদিন মনে শান্তি পাব না।
চার্লি বলে, আমার এক ভাই মারা গেছে। আমার বয়স তখন এগারো। বসন্তে মারা যায়। তাকে বলতে শুনেছি যে মরতে কোন যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। বারবার সে বলেছে একথা।
কিন্তু ফাঁসিতে মরা আলাদা জিনিস। বিমর্ষভাবে কেনটন বলে।
দরজার কাছে নড়াচড়ার শব্দ হয়। কবাট খুলে যায়। বাইরের পাতলা অন্ধকারে শান্ত্রী এবং অপর একটি লোকের ছায়ামূর্তি দেখা যায়। একদৃষ্টে আমরা চেয়ে থাকি। অবাক হয়ে ভাবি, কে এল? তারপর বুঝতে পারি যে এলি এসেছে। আর কোন শঙ্কা থাকে না।

আস্তানা ছেড়ে যাবার পর এমন শান্তি আর পাইনি। আমার পেশীগুলো ঢিলে হয়ে পড়ে। অবশভাবে দুপাশে হাত ঝুলিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা মেজেতে উঠে বসি। চোখ ফেটে জল আসে আমার।

কেনটন জানত। মনে হয় আমরা সবাই জানতাম। কেনটন বলে, একবার ভেতরে এসনা এলি। তার কণ্ঠস্বর অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে।

সামান্য একটু সময় থাকতে পার। শাস্ত্রী বলে।

ভেতরে ঢুকে এলি দরজার পাশে দাঁড়ায়। জিজ্ঞাসা করে, আলেন আছে এখানে ?

সবাই আছি এলি। কেনটন বলে।

আমি যেখানে বসে আছি সে জায়গাটা বেশ অন্ধকার। উঠে দাঁড়িয়ে এলির কাছে যাই। তার কাছাকাছি গিয়ে আমি তার মুখ দেখবার চেষ্টা করি। হাত বাড়িয়ে তার কোট ধরি।

আঃ, তোমায় দেখে ভারি খুশি হলাম এলি। আমাদের ঘেন্না করছ না তো ?

ভেবেছিলাম হয়ত তোমাদের ফিরিয়ে আনবে না। আস্তে আস্তে বলে সে।

তোমার হাতখানা দাও এলি ! তুমি আমাদের উপর রাগ করো না।

সে হাত বাড়িয়ে দেয় এবং দুই হাতে আমি তার হাত চেপে ধরি। দস্তানা-পরা হাতের স্পর্শ অনুভব করতে চাই।

এসে খুবই ভাল করেছ। চার্লি বলে, বরফের মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ হাঁটতে হয়েছে। তবু এসে খুবই ভাল করেছ এলি !

ভাবলাম, কেমন আছ দেখে যাই। এটুকু হাঁটতে আর কি এসে যায়।

কি করে খবর জানলে ?

ওরাই খবর দিল যে তোমাদের ধরে এনেছে আর একজন গুলিতে মরেছে।

ওরা বেসকে গুলি করেছে।

মারা গেছে ?

সেইখানেই মারা যায়। কি হবে সে জানত না। আমার হাতের মধ্যেই তার প্রাণ গেছে এলি।

বেচারি ! যাক এখন ভালভাবে বিশ্রাম করতে পারবে।

কেনটন এতক্ষণ দূরে দূরে রয়েছে। এইবার সে পেছনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়ায়। বলে, এলি, তুমি কি রাগ বা ঘৃণা নিয়ে এসেছ ?

না।

যদি তাই এসে থাক তো বলছি শোন। আমিই এর নেতা ছিলাম। আমিই আলেনকে পালাবার মতলব দিই। মেয়েটি জানায়, আলেন যদি তাকে না নিয়ে যায় তো সে মরবে। আলেন তখন আমাকে কথা দেয় ! অতএব মেয়েটির মৃত্যুর দায়িত্ব আমারই এলি।

নিজেকে আর অনর্থক কষ্ট দিয়ো না কেনটন। মেয়েটি এখন যে শান্তিতে আছে সে শান্তি বেচারী পেত না। মোলায়েম কণ্ঠে বলে এলি।

আমরা একজনকে গুলি করেছি এলি। ওরা হয়ত আমাদের ফাঁসি দেবে।

এলি, কোন জবাব দেয় না।

ওরা বলছে, আমরা নাকি একজন সৈনিককে হত্যা করেছি ! একটানা কেনটন বলে চলে।

তার গলায় কোন উত্তাপ বা আবেগ নেই।—একে, ঠিক হত্যা করা বলা চলে না। আমরা মাঠ দিয়ে পালাচ্ছিলাম ; তখন ম্যাকলেনের লোকজন আমাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ল। চার্লি আর আমি অপেক্ষা করছিলাম আলেন ও মেয়েটির জন্য। দেখলাম, আচমকা গুলি খেয়ে মেয়েটি পড়ে গেল। তখন আমি বন্দুক তুলে ম্যাকলেনের একটা লোককে গুলি করে সাবাড় করি।

আমি চীৎকার করে বলি, না না ও হত্যা করেনি। কার গুলিতে মরেছে তা ঠিক বলা যায় না !

আমার কথা যেন শোনেনি এই ভাবে কেনটন বলে যেতে থাকে, জান এলি, আমার বন্দুকের লক্ষ্য অব্যর্থ। গোটা মোহকে কোনদিন কেউ আমায় হারাতে পারেনি। কেমন করে যে লক্ষ্য ভেদ করি তাতো তুমিও দেখেছ এলি। আমিই লোকটাকে গুলি করেছি। কথাটা কিন্তু মনে রেখ। আমি হলপ করে বলছি !

না, না, ও মিথ্যে কথা বলছে। ফিসফিস করে চার্লি বলে ওঠে।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে এলি। কোন কথা বলে না। আমি জানি, কি হচ্ছে তার মনের মধ্যে। বুঝতে পারছি তার পক্ষে কোনো কথা বলা কত শক্ত। আমাদের দিকে সে কয়েক পা এগিয়ে আসে। তারপর ধীরে ধীরে বলে, তোমাদের জন্য কয়েক টুকরো নুন দেওয়া মাংস এনেছি আর কিছুই আনতে পারি নি। কেনটন যে হরিণটা শিকার করেছিল, এ তারই মাংস। মনে আছে ?

আছে। যন্ত্রচালিতের মত নিস্প্রান কণ্ঠে কেনটন বলে।

মাংসের টুকরো কটি এলি আমার হাতে দেয়। পলকের জন্য থমকে দাঁড়ায় আমার সামনে। যেন অন্ধকারে আমার মুখ চোখ দেখতে চায়। তার পরে সে পেছন ফিরে একছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

মাংসটুকু ভাগাভাগি করে আস্তে আস্তে চিবোই আমরা। কাঠের বেড়ায় ঠেস দিয়ে আবার বসে পড়ি তিনজনে।

চার্লি বলে, খুন করব বলে তো আমরা তাক করিনি কেনটন। তুমি তো কোমরের কাছে বন্দুক ধরেছিলে। কোমরে বন্দুক রেখে কেউ গুলি করে লক্ষ্য ভেদ করতে পারে না।

কেনটন জবাব দেয় না। আমি হাত বাড়িয়ে তার হাঁটু স্পর্শ করি। নীরবে সে আমার হাত চেপে ধরে।

যে করেই হোক ধীরে ধীরে রাতটা কেটে যায়। যন্ত্রণা সইবার ক্ষমতার চাইতেও একমাত্র বোধহয় বিস্মৃতির ক্ষমতাই মানুষের বেশী। পাত্রে খানিকটা জল ছিল, তাও জমে বরফ হয়ে গেছে। কয়েদখানার বেড়া কাগজের মত পাতলা। এই ঠাণ্ডা মেঝেয় শুয়ে রাত কাটিয়েছি আমরা। গরম হবার জন্য গা ঘেঁষাঘেঁষি করে থেকেছি। ক্রমে ভোরের আলো দেখা দেয়। আমাদের অবস্থা তখন জীবন্মৃতের মত। মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করি কিন্তু সাধ্য নেই। হাত পা নাড়াচাড়া করতে পারি না। সারা দেহ মরার মত শক্ত হয়ে গেছে। হামাগুড়ি দিয়ে কোনমতে দরজার কাছে এসে ধাক্কাতে শুরু করি। কেউ সাড়া দেয় না।

ক্লান্ত হয়ে নিজেরাই থেমে যাই। দৈহিক যন্ত্রণা সম্পর্কে বোধ যেন নষ্ট হয়ে গেছে। কোন রকম অনুযোগ বা কাতরোক্তি না করে পড়ে থাকি।

চার্লি বলে, এমনিভাবে আর একটা রাত কাটাতে হলে আর ফাঁসির দরকার হবে না।

অবশেষে দরজা খুলে যায়! দেখি, দরজার সামনে প্রহরী আর এক অচেনা অফিসার। সে আমাদের উঠতে বলে।

শরীর কাঠ হয়ে গেছে। দুদিনে মাত্র এক টুকরো মাংস জুটেছে।

চার হাত পায়ে কোন মতে দাঁড়ান গেল। গতকাল ভারনামের সঙ্গে যে ঘরে কথা হয়, সেই কাঠের বাড়িতেই নিয়ে যায় আমাদের। কথা বলবার ক্ষমতা আমাদের নেই বললেই চলে। খানকয়েক চেয়ার আছে ঘরে। ধপ করে আমরা বসে পড়ি। আগুন জ্বলছে ঘরের মধ্যে। আগুনের এমনি মধুর উত্তাপ কোনদিন উপভোগ করিনি। তাতটা বেশ নতুন আর বিস্ময়কর লাগে! প্রথমে আগুনের কাছাকাছি যেতে ভয়-ভয় করে! তারপর আস্তে আস্তে এগিয়ে যাই।

ফাঁসি দেওয়া পর্যন্ত এরা টিকবে বলে মনে হচ্ছে না তো। অফিসার বলে। হা ভগবান, কি বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানাই যে হচ্ছে! তারপর আমাদের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, খাওয়া জুটেছে কত কাল আগে?

সামান্য কিছু মাংস আছে। দাঁড়াও, খানিকটা ঝোল আনাচ্ছি।

ভুট্টা ও আলু দিয়ে ঝোল বানান হয়েছে! কাঠের পাত্র করে আমাদের দেওয়া হল। তা-ই হাভাতের মত গব গব করে খেয়ে ফেলি।

আঃ। অনেকদিন এমন খাবার মুখে যায়নি। চার্লি বলে,—এখানে তো বেশ ভাল খাবারের বন্দোবস্ত দেখছি! খেয়ে শরীরটা বেশ চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

আগুনের পাশে ভীড় করে আমরা পা সেঁকে নিই। কোটের বোতামও খুলে ফেলি।

চমৎকার আগুন! এমন আগুন মেলা ভার। ঘরের মধ্যে বেশ উষ্ণ আবহাওয়া, কেনটন বলে। তার অবস্থা এখন অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছে। বিন্দুমাত্র উদ্বিগ্ন বলে মনে হয় না।

আজকেই হয়ত ফাঁসি দেবে, কি বল কেনটন।

ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে সে বিস্ময় প্রকাশ করে। চার্লি একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে আছে। কবাট না খোলা পর্যন্ত এমনিভাবেই কথা না বলে বসে থাকি। তরুণ এক অফিসার ঘরে ঢোকে। এক রকম বালক বল্লেই চলে। মনে হয় যেন চিনি-চিনি। কিন্তু মনটা এমন ভোঁতা হয়ে গেছে বলে নামটা মনে আসে না। ভেতরে ঢুকে সে টেবিলের পাশে দাঁড়ায়। ভালভাবে লক্ষ্য করে আমাদের। অফিসারদের কারও কারও পরণে আমাদের মতই ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড়। কিন্তু এ লোকটির পরণে চোস্ত পোশাক: গায়ে নীল উর্দি'র গ্রেট কোট। মিশমিশে কালো কলার…গলায় রেশমী রুমাল…মাথায় কালো ঝুঁটিওলা টুপি…পরণে বাদামি চামড়ার ব্রিচেস এবং পায়ে উঁচু গোড়ালির কালো বুট। হাতে একটা চাবুকের বাঁট। টেবিলের উপর একখানা পা ভেঙ্গে দিয়ে সে চাবুকের বাঁট দিয়ে আস্তে আস্তে নিজের উরুতে বাড়ি মারছে।

বেশ একহারা চেহারার লম্বা লোকটি। চোখ দুটি গাঢ় কালো। চোখের পাতা নীচু করে চাওয়ার মধ্যে একটা বিশিষ্টতা আছে।

তোমরা পেনসিলভানিয়ার লোক ? সে জিজ্ঞাসা করে।

কেনটন ক্রুদ্ধভাবে তার দিকে তাকায়। বেশ বুঝতে পারি, তরুন ক্যাপ্টেনটিকে তার মোটেই ভাল লাগেনি। আমারও বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। জোর করে কোন কিছু না-ভাববার চেষ্টা করছি। চিন্তা-ভাবনার বালাই চুকিয়ে দিতে চাইছি। মন থেকে মুছে ফেলতে চাইছি জয় পাহাড়ের ফাঁসির মঞ্চের ছবি। চার্লি গ্রীন একটা সুর ভাজছে।

আবার সে আমাদের জিজ্ঞাসা করে, তোমরা এই তিনজনেই দল ছেড়ে ভেগেছিলে ?

কর্ণেল হ্যামিলটন নাকি ? চার্লি জিজ্ঞাসা করে। অফিসারদের যেভাবে সে ঘৃণা করে, তা শুধু বোস্টনওয়ালাদের পক্ষেই সম্ভব ! কথা বলবার সময় সে মুচকি মুচকি হাসছে। কোন কিছু হারাবার ভয় তার নেই। এমন কি জীবন হারাবার ভয়ও না। কেনটন ও চার্লির ভয়লেশহীন ভাব দেখে আমার নিজের উপর ঘেন্না হয়। মনে হয় যত সব মানবীয় গুণ আমাকে তাদের সঙ্গে একত্রে গেঁথেছে, তার সব কিছুই তারা হারিয়ে বসে আছে। আমি যেন একলা পড়ে গেছি।

তেমনি কৌতূহলী চোখে আমাদের দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ে ছেলেটি। এতক্ষণে ওয়াশিংটনের প্রিয়পাত্র আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটনকে চিনতে পারি। অন্য যে কোন অবস্থায় দেখা হলে হয়ত তাকে ঘৃণা করতাম না। কিন্তু আজকের এই অবস্থায় তার সাজপোশাকের পরিপাটি ও প্রসন্নভাব দেখে গা জ্বলে ওঠে। তার দামী কালো বুটের দিকে চেয়ে মনে পড়ে, মৃত মস ফুলারের পা থেকে আমরা কেমন করে জুতো খুলে নিয়েছি।

রিপোর্ট যদি সত্যি হয় তো তোমরা তিনজন চৌদ্দনম্বর পেনসিলভানিয়ার দলত্যাগী, হ্যামিলটন বলে। হাতিয়ার সঙ্গে নিয়ে ভাগছিলে এবং ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের দলের একজনকে খুন করেছ। হা ভগবান, তোমাদের দেখে পুরোদস্তুর নোংরা ভিখিরী বলে মনে হচ্ছে। আমি হলে তোমাদের পালিয়ে যেতে দিতাম। পল্টনে এমন লোক না রেখে জাহান্নামে পাঠাবার ব্যবস্থা করতাম।

আপনি নিজেই তো জাহান্নামে যেতে পারেন স্যার ! চার্লি বলে।

এতেও তার উরুতে চাবুকের বাড়ি থামে না। যেমন চলছিল তেমনি ভাবেই চলতে থাকে। মনে হয় যেন গ্রীনের কথা সে শোনেনি। আমাদের মাথার উপরকার চিমনিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে সে। বলে, আজ বিকেলে সামরিক আদালতে তোমাদের বিচার হবে। বিচ্ছিরি গোলমাল বাধিয়েছ। জয় পাহাড়ের ফাঁসির মঞ্চে তোমাদের দুষ্কৃতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হবে।

বেশ তো যখন হবে তখন…! কেনটন বলে।…এখন বেরিয়ে যান।

হ্যামিলটন টেবিল থেকে সরে আসে। সরাসরি এগিয়ে যায় কেনটনের কাছে। মনে হয় এখুনি হয়ত কেনটনের মুখে সপাং করে বাড়ি পড়বে। কিন্তু না তো ! ছেলেটির ধৈর্য আছে। ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে সে বলে, আদালতে তোমাদের পক্ষ সমর্থন করতে হবে আমাকে।

চার্লি হেসে ওঠে বীভৎসভাবে। তার সেই হাসির তুলনায় কথা তুচ্ছ।

আমাদের পক্ষ সমর্থন করার কোন দরকার নেই। কেনটন বলে।

কিন্তু আমার উপর আদেশ এসেছে।

চার্লি তখনও হাসছে। আমি উঠে দাঁড়িয়ে একটা জানালার কাছে সরে যাই। আস্তানার প্রাচীরের ওধারে শুয়েলকিলের পারে সার-বাঁধা গাছ অবধি বরফের বিস্তৃত চত্বর দেখতে পাচ্ছি। প্রভাতী রোদ তুষারের বুকে যেন নানা রঙের তুলি বুলিয়েছে। নরম হলদে ও বেগনি ছোপের সঙ্গে মিলেছে বাদামি আমেজ আর মাঝে মাঝে একটু সবজে আভা। এই রঙের খেলা নতুন জীবন ও বসন্তের প্রতীক। ইহুদিটির মরবার আগেকার কথাগুলো মনে পড়ে। বসন্ত যেন এক জাগরণের মত। ধরণীর বুকে ভগবানের কল্যাণ-স্পর্শ। তার প্রসারিত হাতের আদর যেন ফুটে ওঠে বসন্তের রূপ রসে। মাটি সরস ও নরম হয়ে যায়। মানুষ মরেও অনায়াসে ধরণীর কোলে শুয়ে থাকতে পারে।

ফিরে দেখি, হ্যামিলটন পাইপ ধরাচ্ছে। লম্বা নলের ওলন্দাজ মাটির পাইপ। আলবেনিতে দোকানের সামনে বসে শহুরে লোকে এমনি পাইপ টানে। উত্তরে যে কোন গ্রাম্য শুঁড়িখানার দেয়ালে এমনি পাইপ টাঙান থাকে। আগুন থেকে একখানা জ্বলন্ত কাঠকয়লা তুলবার জন্য সে নীচু হয় এবং তারপর জোরসে টান মেরে চালের দিকে নীলচে তামাকের ধোঁয়া ছাড়ে।

আমার চোখে মুখে ধোঁয়া লাগে। প্রাণটা তামাক টানবার জন্য আই ঢাই করে ওঠে। বহু সপ্তাহ তামাক খেতে পাইনি। তামাকের ধোঁয়ার গন্ধও নাকে যায়নি অনেকদিন।

সে আমার দিকে তাকায়। তার মুখে রহস্যময় হাসি খেলে বেড়ায়। ঝোঁকের মাথায় সে আমার দিকে পাইপটি বাড়িয়ে ধরে। আমি হাত বাড়াই। চার্লি ও কেনটন আমার দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে। আমি পাইপটি ওর হাত থেকে নিয়ে নিই। তারপর দু এক পা এগিয়ে কেনটনের দিকে বাড়িয়ে ধরি। সে নড়ে না।

চার্লি ফিসফিস করে বলে, হা খ্রীস্ট! জোরে ঘরঘরে ভাঙা গলায় বলে ওঠে। পাইপটা নিয়ে সে টানতে শুরু করে। এক দৃষ্টে ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে থাকে চার্লি। তারপর সহসা ধোঁয়ার মধ্যে হাত দিয়ে শিশুর মত ফিক করে হেসে ওঠে। আবার সে পাইপটা আমাকে ঘুরিয়ে দেয়।

আস্তে আস্তে আমি টানতে শুরু করি। মাত্র দু'একটা টান দিতেই কেনটন ইশারা করে। পাইপটা তার হাতে দিই। সে দু'একটা টান মারে। তারপর আচমকা পাইপটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মেজেয় পড়ে মাটির পাইপটি টুকরো হয়ে যায়।

হ্যামিলটন তখনও আমাদের দিকে চেয়ে হাসছে। কেনটন দুহাতে মুখ চেপে ধরে। গ্রীন পায়চারি শুরু করে। আমি হ্যামিলটনকে বলি, আজকেই কি আমাদের ফাঁসি দেবে?

ঘাড় ঝাঁকানি দেয় হ্যামিলটন।

না, কোন করুণা আমরা চাই না। কেনটন চেঁচিয়ে ওঠে,—হা ভগবান! ভাল ঘরে থাকেন, ভাল ভাল জিনিস খান…কতটা খোঁজ রাখেন আপনারা?

হ্যামিলটন আস্তে আস্তে বলে, আজ সকালে মাত্র দু'টুকরো শুকনো রুটি খেয়েছি। কালকে সামান্য একটু মাংস জুটেছিল। জেনারেলের ডিনারেও এ-ই একই জুটেছে। তিনি জোর করে আমায় খাইয়েছেন।

চার্লি হেসে ওঠে।

বিশ্বাস হল না তো!

কেনটন বলে ওঠে, কেন এখনই ফাঁসি দিচ্ছেন না ? ফাঁসি দিয়ে সব চুকিয়ে দিলেই তো পারেন !
ফাঁসি নিশ্চয় দেবে। হ্যামিলটন বলে,—বেশ ভাল করেই ঝোলাবে তোমাদের।
টেবিলের কাছে গিয়ে আবার সে পা ভেঙে দাঁড়ায় এবং আমাদের একমনে লক্ষ্য করতে থাকে। আমি জানালার পাশে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে বিচ্ছিরি ভাবে উঠে দাঁড়ায় কেনটন এবং খানিকটা এগিয়ে ভাঙা পাইপটা লক্ষ্য করতে থাকে।
হ্যামিলটন বলে, ঘটনাটা কি হয়েছিল বল তো !
আমরা ভেগে গিয়েছিলাম। আমি বলি,—মোহকের লোক আমরা। ভেবেছিলাম হাঁটতে হাঁটতে ভ্যালি অঞ্চলে চলে যাব।
সে আমার কেনটন ও চার্লি'র দিকে তাকায়। মানুষের পক্ষে যতটা শীর্ণ হয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব, তা আমরা এখন হয়েছি। আমাদের অস্থিসার চেহারা, খোঁচা খোঁচা দাড়িওলা মুখ, ছেঁড়া জামা-কাপড় এবং খালি পায়ের দিকে তাকায় সে। চোখ নামিয়ে আমাদের পা দেখতে থাকে।
তাহলে অতটা পথ হেঁটে যাবে বলেই বেরিয়েছিলে ?
আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। দু'চার পা এগিয়ে বসে পড়ি। তার দৃষ্টি থেকে পা দুটো লুকোতে চাই।
সঙ্গে নিশ্চয়ই কোন খাবার ছিল না ! ছিল ?
না-খাওয়া তো অনেকদিন গা-সওয়া হয়ে গেছে।
আর কেউ ছিল ? না শুধু তোমরা তিনজনেই ছিলে ?
একটি মেয়েও ছিল। ম্যাকলেনের লোকজন তাকে গুলি করে মেরে ফেলেছে।
একটি মেয়ে ! চাপা গলায় বলে সে,—এটা ঐ বাহাদুর ক্যাপ্টেনের বিরুদ্ধে একটা উল্লেক-যোগ্য কাজ বটে। মনে রাখবার মত যুক্তি। আচ্ছা, এই মেয়েটি কে ? তোমাদের কারও স্ত্রী কি ?
না কারও স্ত্রী সে নয়। আমি বলি,—সে একজন শিবিরসঙ্গিনী।
কার সঙ্গিনী ? হ্যামিলটন জিজ্ঞাসা করে।
আমার।
সে কি তৎক্ষণাত মারা যায় ?
হ্যাঁ, আমারই কোলে।
কেনটন চেঁচিয়ে ওঠে, ওর মুখ দেখেও কি বুঝতে পারছেন না ? আমাদের এখন একটু একলা থাকতে দিন।
ম্যাকলেনের এক সঙ্গীকে তোমরা হত্যা করেছ। কেনটনের কথা গ্রাহ্য না করে হ্যামিলটন জিজ্ঞাস করে,—কারা আগে গুলি করে ? তোমরা না তারা ?
ওরা মেয়েটিকে খুন করবার পর আমরা গুলি চালিয়েছি।
কে ওকে গুলি করেছ ?
আমি। কেনটন বলে।
চার্লি বাধা দেয়। বলে, কারও দিকে তাক না করে আমাদের দিক থেকে গুলি ছোড়া

হয়। কার গুলিতে মরেছে জানি না।
একদৃষ্টে কেনটনের দিকে তাকিয়ে থাকে হ্যামিলটন। আবার তাকে অপরিণত বালকের মত দেখায়। তার মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। কেনটনের কাছে গিয়ে সে তার হাত বাড়িয়ে দেয়, বলে আমার হাতে একবার হাত রাখবে ?
কেনটন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। নড়ে না। হ্যামিলটন তখন বেরিয়ে যায়।

অপেক্ষা করে চলেছি আমরা। জানিনা কিসের জন্য। প্রাণহীন দৃষ্টিতে আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই। আগুনের পাশে বসে থাকি কিন্তু কথা বলিনা। মনে হয় যেন ফুরিয়ে গেছি—আমাদের কথাও ফুরিয়েছে।
কেনেডি ভেতরে ঢোকে। তার পেছনে দরজার ফাঁক দিয়ে জনা আষ্টেক পাহারাওলা দেখা যায়। কেনেডির হাতে বগলস ঝুলান লম্বা একটা চামড়ার রশি। সে আমাদের দিকে তাকায় না। টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে জানালার দিকে চেয়ে থাকে।
বলে, উঠে দাঁড়াও।
আমাদের কাছে এসে সে বগলস দিয়ে গলায় গলায় বেঁধে দেয়। আমার কাছে আসতেই আমি সরে যাই। চেঁচিয়ে বলি, আমাদের কি জানোয়ারের মত বাঁধবে নাকি ?
আমার আদেশ ··
হা খ্রীস্ট ! না, জানোয়ারের মত কিছুতেই গলায় বগলস পরাতে দেব না। তার চাইতে তরোয়াল দিয়ে এক কোপে খতম করে দাওনা কেন ! সেও বরং ভাল। নচ্ছার হতচ্ছাড়া শূয়োর কোথাকার ; এর চাইতে তরোয়াল দিয়ে সাবাড় করে দিলেই তো একবারে চুকে যায় !
কেনটন আমার হাত চেপে ধরে। বলে, আর ঝামেলা কোরো না আলেন। দোহাই !
আমি দুঃখিত। কেনেডি বলে।
হাত দিয়ে আমি মুখ ঢাকবার চেষ্টা করি। বাইরে হাড় কাঁপান শীত কিন্তু আবহাওয়া পরিষ্কার। ঠাণ্ডা রোদে জমাট বরফ ঝিকমিক করছে। প্রহরীরা অস্বস্তিভরে চলছে। আড়মোড়া ভেঙে গা গরম করবার চেষ্টা করছে। তাদের ঠিক পেছনে দুটি ড্রাম বাজিয়ে। আমরা বাইরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডিতের জন্য তারা বাজাতে শুরু করে।
সঙিন উঁচিয়ে প্রহরীরা আমাদের পেছু পেছু হাঁটে। মানুষ বলে এদের পরিচয় দেওয়া যায় না। জনা আটেক ভিখারীর একটি দল। মরচেপরা বেয়নেটগুলো দুমড়ান। ড্রাম বাজিয়েরা বাজাতে বাজাতে আগে আগে চলে। একবার চার্লি পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হুমড়ি খেয়ে পড়ি। চামড়ার ব্যাণ্ডে গলা ছড়ে যায়। শ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।
প্রহরীরা আমাদের ধরে দাঁড় করিয়ে দেয়। তাদের একজন পাকা দাড়িওলা বৃদ্ধ। সে বলে, আস্তে সুস্থে চল বাছারা। সময় আছে।
কেনেডি চলেছে আগে আগে। ভুলেও সে পেছনে তাকায়নি। এমনকি আমরা পড়ে গেলেও না। মাথা হেঁট করে আস্তে আস্তে হাঁটছে সে। রাইফেলখানার পাশ দিয়ে যাবার বেলা প্রহরীরা একদৃষ্টে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে। কিন্তু তাদের চাহনিতে বিশেষ

কোন কৌতূহল ধরা পড়ে না।

পরিখার আস্তানার পাশ দিয়ে যাবার বেলা কিছু কিছু সৈনিক আমাদের দেখতে বেরিয়ে আসে। কে যেন ডেকে বলে, আজকে তোমাদের ভাল খাবার জুটবে হে!

হাঁটতে হাঁটতে আমরা পাথুরে বাড়িটির সামনে এসে পড়ি। ওয়াশিংটনের দপ্তর এই বাড়িতে। চমৎকার লম্বা দোতলা বাড়ি। পাশে লম্বা একটা আস্তাবল। ঘুরে আমরা সদরে যাই। দরজার সামনে এসে প্রহরীরা থেমে দাঁড়ায়। ড্রাম বাজিয়েরা জোরসে একবার বাজিয়ে কাঠি দিয়ে মৃদু শব্দ করতে করতে থেমে যায়। তখন কেনেডি আমাদের ভেতরে নিয়ে যায়।

বাড়ির ভেতর দিয়ে সে আমাদের দোতলার ডানদিকে পেছনের একটা ঘরে নিয়ে আসে। ভেতরে আগুনের কুণ্ডর কাছাকাছি মস্তবড় একখানা গোল টেবিল, চারপাশে ছয়জন অফিসার বসে আছেন। জানালার পাশে একখানা ক্যাম্প টেবিলের পাশে বসে হ্যামিলটন একমনে লিখে যাচ্ছেন। আমরা ভেতরে ঢুকতেই মুখ তুলে সে আমাদের স্বাগত জানাল আর একজন অফিসার মস্ত একটা ঘড়ির পাশে দাঁড়িয়ে। দরজার পাশে আমাদের জন্য চেয়ার পাতা রয়েছে। কেনেডি আমাদের বসতে ইশারা করে। বিচ্ছিরিভাবে আমরা বসে পড়ি। গলায় জড়ানো ব্যাণ্ড তিনজনকেই টানছে।

অফিসারদের মধ্যে একজন উঠে দাঁড়ায়। অ্যান্থনি ওয়েনকে চিনতে পারি। তিনি বলেন, আমার এই লোকদের একসঙ্গে বাঁধা হয়েছে কেন?

কর্ণেল ভারনামের আদেশ স্যার। কেনেডি জবাব দেয়।

গোল্লায় যাক ভারনাম, সে এই আদেশ দেবার কে? এরা পেন্সিলভানিয়ার লোক। তোমার ওই ভারনামকে জানিয়ো সে যেন আমার লোকজনের ব্যাপারে ওর খাঁদা নাক গলাতে না আসে।

কিন্তু এটা নিয়ম। টেবিলে বসা একজন অফিসার বাধা দিয়ে বলে ওঠেন।

চুলোয় যাক নিয়মকানুন। ওদের বাঁধন খুলে দাও।

আমাদের বাঁধন খুলে দিয়ে কেনেডি বেরিয়ে যায়। আমি পাশ ফিরে হ্যামিলটনের দিকে তাকাই। আঁটসাট পোষাক পরে জানালার পাশে বসে আছে সে, মৃদু মৃদু হাসছে। ওয়েন একদৃষ্টে টেবিলের দিকে চেয়ে আছেন। আমি তখন অন্যান্য সেনানীদের দিকে তাকাই। কয়েকজনকে চিনি। গ্রীন, লর্ড স্টার্লিং, কর্ণেল কনওয়ে এবং জেনারেল স্কটকে চিনতে পারি। মাঝখানে একখানা চেয়ার খালি রয়েছে। মনে হয় এরা আর একজনের জন্য অপেক্ষা করছেন। আঙুল দিয়ে টেবিলের উপর টুকটাক শব্দ করছে সকলে। ওয়েন হাতের কাগজখানা নাড়াচাড়া করছেন। এদের কেউ আমাদের দিকে তাকাচ্ছে না।

আগুন জ্বলছে তবুও ঘরটা বেশ ঠাণ্ডা। ঘড়ির একঘেয়ে টিকটিকানি মিশে যাচ্ছে আগুনের সাঁইসাঁই শব্দের সঙ্গে। কান পেতে কিছুক্ষণ আমি ঘড়িটার টিক টিক শব্দ শুনি। তারপর অপলক দৃষ্টিতে ঘড়িটার দিকে থাকি। দেড়টা বাজে। ঘড়িটা দেখে ভারি কৌতূহল হয়। সময়ের হিসেব আমাদের বহুদিন লোপ পেয়েছে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সময়ের গতি লক্ষ্য করবার সুযোগ বহুদিন হয়নি। কেমন ছোট্ট ছোট্ট অস্থির ঝাঁকানি দিয়ে কাঁটা এগিয়ে যাচ্ছে! আবার যেন আমার সময় জ্ঞান ফিরে আসে। একমনে কাঁটার মিনিটে মিনিটে

এগোন লক্ষ্য করতে থাকি।

তুষারকণা মাখা জানালার বাইরে ছেঁড়া জামাকাপড় পরা একটি শাস্ত্রী পায়চারি করছে। এরিমধ্যে টিকটিক করে ঘড়িটা আধঘণ্টা এগিয়ে যায়।

আমি চার্লি ও কেনটনের মুখের দিকে তাকাই। শক্ত হয়ে নাক বরাবর চেয়ে আছে তারা। কয়েদখানা থেকে বেরিয়ে আসবার পর তাদের কারও মুখে কোন শব্দ শোনা যায়নি। কেমন একটা ছেলেমানুষি খেয়াল আমাকে পেয়ে বসে। চলমান ঘড়িটা, চকচকে টেবিল-খানা আর অফিসারদের গলার সাদা চকচকে লেসের টুকরো দেখে মশগুল হয়ে যাই। হটাৎ ঘরের এক কোনে সেনানীদের টুপি রাখার আলনার দিকে চোখ পড়ে। পালক লাগান টুপিতে গোটা তাক ভরতি। একটা টুপির একখানা পালক আলগা। অবাক হয়ে হয়ে ভাবি, কার টুপি হতে পারে এটা ?

দস্তার ঘড়া ভর্ত্তি জল এবং গোটাকয়েক দস্তার কাপ নিয়ে আরদালি ঘরে ঢোকে। সবাই তার দিকে ফিরে তাকায়। টেবিলের উপর সেগুলো রেখে সেলাম করে সে বেরিয়ে যায়।

ঘড়িতে আরও পনেরো মিনিট চলে যাবার পর ওয়াশিংটন ঘরে ঢোকেন। লম্বা ঢিলে একটা নীল ক্লোক পরে টুপি হাতে নিয়ে ঢোকেন তিনি। সেনানীরা সবাই উঠে দাঁড়ায়। তিনি তাদের ইঙ্গিতে বসতে বলেন। কোণের দিকে গিয়ে তিনি টুপিটা আলনায় রেখে দেন। তারপর ক্লোকের কলার খুলতে থাকেন। হ্যামিলটন তাঁর পাশেই আছেন। তিনি তাঁকে ক্লোক খুলতে সাহায্য করেন। জেনারেল মুচকি হাসেন। হ্যামিলটন তখন তাঁর কানে কানে কি যেন বলেন। মাথা নেড়ে সায় দেন জেনারেল। তারপর টেবিলে এসে বসেন।

ওয়াশিংটনের উপস্থিতিতে ঘরখানা যেন ভর্তি হয়ে যায়। বেশ লম্বা চওড়া লোকটি। মস্ত বড় মুখ। প্যারেডের মাঠে বক্তৃতা করবার সময় তাঁকে শেষবার যেমন দেখেছি তার চাইতেও যেন অনেক বুড়িয়ে গেছেন। মুখ ভেঙে গেছে।

তিনি টেবিলে বসবার পর হ্যামিলটন তাঁর সামনে এক তাড়া কাগজ বারিয়ে দেন। আঙুল দিয়ে সেগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে ওয়াশিংটন চশমা বার করেন এবং আস্তে করে মুছে নিয়ে চোখে লাগান। খানিকটা পড়ার পর তিনি আমাদের দিকে তাকান।

জেনারেল গ্রীন বলেন, জায়গাটা বেজায় ঠাণ্ডা স্যার ! আমরা যদি এই কাজটা চটপট······

হাঁ, ঠাণ্ডার কথা আমারও মনে আছে জেনারেল। সংক্ষেপে বলেন তিনি।

একদৃষ্টে তিনি আমাদের দিকে চেয়ে থাকেন। তিনি ঘরে ঢুকতেই আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি। এখনও ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। বেশ ভাল করে তিনি আমাদের লক্ষ্য করেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন আমাদের পায়ের দিকে। যখন তিনি কথা বলেন, গলাটা ভারি চাপা গম্ভীর লাগে। নীচু গলায় তিনি বলেন, দলত্যাগ এবং খুনের অভিযোগে উর্ধ্বতন অফিসারদের সামরিক আদালতের সমক্ষে তোমাদের হাজির করা হয়েছে। যদি দোষী সাব্যস্ত হও, সমবেত সৈনিকদের সামনে প্রকাশ্যে তোমাদের ফাঁসি দেওয়া হবে। আশা করি অভিযোগ এবং যে দণ্ড তোমাদের দেওয়া হতে পারে তার গুরুত্ব তোমরা উপলব্ধি করতে পারছ।

আমরা ঘাড় নাড়ি।

তখন ঘড়ির পাশে দাঁড়ান সেনানীটির দিকে ফিরে বলেন, এবার আপনার অভিযোগ পড়ে শোনান কর্ণেল মার্কার।
লম্বা দাড়িওলা লোক মার্কার। ছোট চোখ দুটি কটা। টেবিলের কাছে এগিয়ে এসে তিনি পড়তে শুরু করেন ঃ
চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া রেজিমেন্টের ক্যাপ্টেন জন মুলার অভিযোগ করেছেন যে সতেরো শো আটাত্তর সালের ষোলোই ফেব্রুয়ারী রাত্রে তার ব্রিগেডের তিনজন লোক দলত্যাগ করে পালায়। সে তিনজনের নাম যথা ক্রমে ঃ চার্লস গ্রীন, কেনটন ব্রেন্নার এবং আলান হেল। তারা যে স্বেচ্ছায় দলত্যাগ করেছে তা ঘটনার পারম্পর্য দ্বারা প্রমাণিত। কোন রূপ সংবাদ না দিয়ে এরা ছাউনির চৌহদ্দি পার হয়ে যায় এবং যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র, গোলাগুলি, বেয়নেট এবং বন্দুক সঙ্গে নিয়ে যায়। তাছাড়া বাহিনীর উর্দি…
কেনটন হাঃ হাঃ করে হেসে ওঠে। জোর গলায় হেসে চলে সে এবং সামনে পেছনে দুলতে থাকে। আমি তার হাত চেপে ধরি।
ওয়েন উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে কটমট করে তাকায়। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে জেনারেলও আমাদের দিকে অবাক চোখে চেয়ে থাকেন।
হ্যামিলটন উঠে টেবিলের কাছে যায়। বলে, ইওর একসেলেনসি, আমার প্রার্থনা, এই ব্যাপারটা আপনি উপেক্ষা করবেন। বেচারীরা আধা উপোসী। তাছাড়া নিশ্চয়ই উর্দিপরা নয়।
পেটভরে খাওয়া আমাদের কারও জন্যেই জোটে না। ওয়াশিংটন বলেন।
আদালত ওদের ক্ষমা করবে কি ?
কয়েক ঘা কষে চাবুক মারলেই হাসি বেরিয়ে যাবে। কনওয়ে বলেন।
না হয় ফাঁসির দড়ি গলায় পড়লে। লর্ড স্টার্লিং পাদপূরণ করেন।
জেনারেল ঘাড় নাড়েন। তারপর মার্কারকে বলেন, আপনি পড়ে যান।
এরা যে দলত্যাগ করেছে একথা যথাক্রমে ক্যাপ্টেন কেনেডি এবং কর্নেল ভারনামের এর কাছে স্বীকার করেছে।
ওয়াশিংটন হ্যামিলটনকে বলেন, আপনার এ বিষয়ে কিছু বলবার আছে মিঃ হ্যামিলটন ?
না।
আপনি যদি ইচ্ছা করেন তবে যে ক'জন অফিসারের নাম উল্লেখ করছি তাদের হাজির করতে পারি। কর্নেল মার্কার বলেন,—আমার হেপাজতেই আছে।
তার দরকার হবে না। আপনি কোন সাক্ষী ডাকতে চান মিঃ হ্যামিলটন ?
হ্যামিলটন মাথা নাড়ান।
তখন আমাদের দিকে ফিরে বলেন, তোমরা কি এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার কর ?
যেমন ভাবে ছিলাম সেই ভাবেই আমরা নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। কোন কিছু বলবার মত আগ্রহ নেই।
আদালতের প্রশ্নের জবাব বন্দীদের দিতে হবে।
কেনটন তখন কর্কশ গলায় বলে, বন্দুক আমাদের নিজেদের। আমার বন্দুকটা আমার বাবার, আর আলেনেরটাও তার বাবা দিয়েছেন। উর্দি আমাদের কোনকালে ছিল না। গা

ঢাকবার মত কোন জামা-কাপড় বা পয়সাও ছিল না আমাদের কাছে। কোন দিক থেকেই আমরা অন্যায় করিনি। বাহিনীর কোন কিছু সাথে নিয়ে আমরা যাই নি। বহুদিন যুদ্ধ বিগ্রহও ছিল না ; হঠাৎ তাই ভ্যালি অঞ্চলের কথা মনে পড়ে গেল। সহসা তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে যায়।

চার্লি বলে,—এঁদের অসম্মান করবার অভিপ্রায় ওর নেই মিঃ হ্যামিলটন!

ওয়েন ঠাণ্ডা মেজাজে বলেন,—তোমাদের উকিলকে কর্নেল হ্যামিলটন বলে ডাকবে।

আবার আমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কারও মুখে কোন কথা নেই। নিজেদের কেমন অসহায় মনে হয়। অস্বস্তিভরে পা নাড়া-চাড়া করতে থাকি। বার বার নিজেদের পায়ে জড়ান রক্ত মাখা নোংরা নেকড়ার দিকে তাকাই।

ওয়াশিংটন বলেন,—এদের সমর্থনে আপনার কিছু বলবার আছে মিঃ ওয়েন ? ওরা আপনার অধীন।

না কিছুই না।

তখন হ্যামিলটন উঠে বলেন, মাননীয়গণ, আমার একান্ত অনুরোধ যে আদালত যেন এদের মার্জনা করেন।

ওয়াশিংটন তখন পালকের কলম দিয়ে টেবিলের পর ঠুক ঠুক শব্দ করতে থাকেন। গ্রীন তার কানে কানে কি যেন বলেন। তখন তিমি চাপা গলায় ওয়েনকে দুচারটে কথা বলেন। ওয়েন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানান। অবশেষে ওয়াশিংটন বলেন, অস্ত্র নিয়ে বাহিনী ত্যাগ করবার অভিযোগে আদালত তোমাদের দোষী সাব্যস্ত করেছে। কিন্তু মিঃ হ্যামিলটনের অনুরোধের সম্মানার্থে শত্রুর কথা বিবেচনা করে আদালত দলত্যাগের অভিযোগ প্রত্যাহার করছে। কিন্তু আদালত তোমাদের প্রত্যেককে বিশ ঘা চাবুক মারার দণ্ডে দণ্ডিত করছে এবং পেনসিলভানিয়ার সৈনিকদের সামনে তোমাদের এই শাস্তি দেওয়া হবে!

হ্যামিলটন কয়েক পা এগিয়ে এসে বলেন, আপনার এই অনুকম্পার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার!

আমরা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। এতক্ষণ এক নাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকবার জন্য পা দুটো টনটন করতে থাকে। কেনটন ও চার্লি'র মুখের দিকে তাকাই। মনে হয় তাদের দুজনের মুখেই যেন মুখোস পড়ান রয়েছে। আমার মুখের ভাব কেমন হয়েছে তাই ভেবে অবাক হই। হাত দিয়ে তখন নিজের দাড়ি ধরি। আবার তাকাই কেনটনের দিকে। সে তখনও ধৈর্য হারায়নি। তার হলদে দাড়ি থুতনি থেকে অনেকটা নীচে নেমেছে—গোঁফটা ঝুলে পড়ছে। মনে মনে বলি, মাত্র পঁচিশ বছর তো বয়স! কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে তার বয়সের যেন গাছপাথর নেই। বেশ বুড়ো বলেই মনে হয়। চোখের চারপাশে ছোট ছোট রেখার আঁচড় ভীড় করেছে।

তবু আমরা নিশ্চল হয়ে অপেক্ষা করি। প্রথম দণ্ডাদেশের অর্থ ঠিক মালুম হয় না। মনের মধ্যে যদিও আশার সঞ্চার হয়। চাবুকের ভয় করি না। যা যন্ত্রণা ভুগছি তাতে আর ব্যথার ভয় থাকে না। কিন্তু যখন জয় পাহাড়ে ফাঁসির মঞ্চের কথা ভাবি, মনে পড়ে আমাকে ছিঁড়ে খাবার জন্য নেকড়ে বাঘের লাফালাফির কথা, গা-টা কেমন ছমছম করে ওঠে, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে আসে। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য যত মায়া অনুভূত হচ্ছে এত মমতা

কোনদিন অনুভব করিনি। এমন করে প্রবল ভাবে কোন দিন বাঁচতে চাইনি।
ওরা এখন নিজেদের মধ্যে জোর আলোচনা চালাচ্ছেন। সশব্দে চেয়ারটা পেছনে ঠেলে দিয়ে ওয়েন উঠে দাঁড়ান। কর্নেল কনওয়ে টেবিলের বিপরীত দিকে তার মুখোমুখি দাঁড়ান।
আমার লোকজনের উপর কোন রকম কলঙ্ক আরোপ করার চেষ্টা আমি বরদাস্ত করব না স্যার! ওয়েন বলেন।
সে উদ্দেশ্যও আমার নয়!
ওয়াশিংটন শান্ত ভাবে বলেন, ভদ্রমহোদয়গণ! আমরা এই লোক কটিকে প্রাণদণ্ডের অভিযোগে বিচার করছি। মার্কারকে বলেন, আপনি পড়ে যান!
মার্কার পড়ে যান ঃ এক নম্বর মহাদেশীয় হালকা অশ্বারোহীদের ক্যাপ্টেন আলেন ম্যাকলেন অভিযোগ করেছেন যে সতেরোশো আটাত্তর সালের সতেরোই ফেব্রুয়ারি সকালবেলা তার দল হানাদারী অভিযান থেকে ফিরবার পথে তিনজন দলত্যাগীর দেখা পায় এবং তাদের বাধা দেয়। পরে এরা চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়ার লোক বলে নিজেদের পরিচয় দেয়। এদের নাম যথাক্রমে আলেন হেল, কেনটন ব্রেন্নার এবং চার্লি গ্রীন। এই তিনজন অস্ত্রসজ্জিত এবং উর্দি পরিহিত অবস্থায় ছিল। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বারবার থামবার আদেশ দেওয়া সত্ত্বেও এরা সে আদেশ অগ্রাহ্য করে এবং গ্রেফতার করবার মুখে গুলি চালিয়ে ডেভিড সিলি নামে ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের একজন অশ্বারোহী অনুচরকে হত্যা করে। শুয়েলকিল নদী থেকে দেড় মাইল উপরে কিং অফ প্রুশিয়া রোড়ের উপর এদের গ্রেফতার করা হয়। এদের সঙ্গে আর একজন সঙ্গীও ছিল। সে স্ত্রীলোক। অশ্বারোহী সৈনিকদের গুলিতে সে মারা যায়।
পড়া শেষ করে কাগজপত্র তিনি টেবিলের উপর রাখলেন। অফিসাররা সেগুলো হাতে হাতে দেখতে লাগলেন। ওয়াশিংটন কাগজপত্রের দিকে নজর দেন নি। তিনি চেয়ে থাকেন আমাদের দিকে। তারপর বলেন, মিঃ হ্যামিলটন, আপনি এর কোন অভিযোগ কি অস্বীকার করতে চান?
হ্যামিলটন বলেন, ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনকে আমি জেরা করতে চাই স্যার। সেদিন সকাল বেলা ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের সঙ্গে যারা ছিল তাদের মধ্যে জন দুয়েককেও আমি আদালতে ডাকতে চাই।
শেষেরটার কোন দরকার হবে না। কর্নেল মার্কার, আপনি ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনকে ভেতরে ডাকুন!
তখন হ্যামিলটন বলেন, স্যার, ন্যায়বিচারের দিক থেকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি যে ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের সঙ্গে তার আরও দুজন অনুচরকে সাক্ষ্য দেবার জন্য আদালতে ডাকান হক।
আদালত আপনার এই অনুরোধ মেনে নিতে পারে না। ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের কথাই যথেষ্ট।
এ আমার দাবী স্যার। ম্যাকলেন সংস্কারাচ্ছন্ন। অশ্বারোহীদের যে কেউ পদাতিকদের বিরোধী।

আপনি নিজের কথা ভুলে যাচ্ছেন মিঃ হ্যামিলটন্।
আমি মার্জনা চাইছি। আদালত এদের বক্তব্য জিজ্ঞাসা না করা অবধি এরা বসতে পারে কি ?
পারে।
আদালতকে অনেক ধন্যবাদ।
সকৃতজ্ঞভাবে আমরা চেয়ারে বসে পড়ি। নিজেদের পায়ের দিকে তাকাই। তারপর চেয়ে থাকি খোলা জানালার দিকে। বোবা জন্তুর মত চেয়ারে বসে আমরা জানালার দিকে চেয়ে থাকি।
এই সমস্ত ব্যাপারটার উপর আমার বেদম রাগ হয়। রাগ হয় বিচারের ব্যবস্থার উপর, অভিযোগ পড়বার প্রহসনের উপর ; আর রাগ হয় টেবিলের পাশে বসা সাজ-পোশাক পরা গরমে মৌতাতে সুখী অফিসারদের উপর। তারা কে ? কি সম্পর্ক আছে আমাদের সঙ্গে ? রুগ্ন জন্তুর মত সপ্তাহের পর সপ্তাহ যখন আমরা পরিখায় পড়ে থেকেছি, কে খোঁজ করেছে তখন ? কি করে এরা আমাদের বিচার করবার…খুনী ও চোরের মত ফাঁসি দেবার অধিকার পেতে পারে ? জানি, আমাদের ফাঁসি দেবে। সে বিষয়ে কোন সংশয় আমার নেই। শুধু সেই ব্যাপারটাকে টেনে বাড়াবার জন্য…ন্যায়বিচারের নামে এটাকে নিয়ে খেলা করবার জন্য আর দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে এসব করা হচ্ছে।
আমরা অস্ত্র নিয়ে পালিয়েছি। কিন্তু কার অস্ত্র ? উর্দি পরে ভাগতে চেয়েছি আমরা ! কেনটনের উর্দির দিকে তাকাই। কম্বল কেটে তার কোট তৈরী করা হয়েছে ! মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো কাপড়ের তালি লাগানো। নীচের দিকটা সব ছিঁড়ে গেছে। ব্রিচেসের ফুটো দিয়ে তার হাঁটুর নীলচে চামড়া দেখা যায়। এক টুকরো কম্বল দিয়ে সে দস্তানা বানিয়েছে। তার গলায় আমাদের সাবেক রেজিমেণ্টের ঝাণ্ডার একটা টুকরো জড়ানো। তবু আমরা উর্দি পরে পালাবার চেষ্টা করেছি !
ম্যাকলেন ভেতরে ঢোকে। এই বাহাদুর ক্যাপ্টেনের কোনদিন খাবারের অভাব হয়নি। কোয়েকার চাষীরা ফিলাডেলফিয়ার বাজারে যখন খাদ্য নিয়ে যায়, তার লোকজন ব্রিটিশদের সেই খাদ্যের ট্রেন লুঠ করে। তারা শুধু ভালই খায় না—সবাইর আগেও খায়। গটমট করে ঘরে ঢুকে সে সেলাম করে। বুকের উপর লাল পটি লাগান ফেণ্টের বাদামী শিকারের কোট তার গায়ে। পরনে হরিণের চামড়ার ব্রিচেস। পায়ে পালিশকরা উঁচু গোড়ালির জ্যাকবুট আর মাথায় পালক-লাগানো ছাগলের চামড়ার টুপি।
ম্যাকলেনের কোমরে অস্ত্র আছে, একখানা তরোয়াল আর একটা পিস্তল। টেবিল অবধি এগিয়ে গিয়ে সেলাম করে সে এটেনশনে দাঁড়ায়। হ্যামিলটন তখন জানালার পাশের চেয়ারে বসে পড়েছেন। জানালার উপর কনুই রেখে অলসভাবে কাঁচেলাগা নীহারকণা ঘষছেন। কাঁচের ফাঁক দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি চেয়ে থাকি ঃ একটি শান্ত্রী পায়চারি করছে। বরফের ঢিবির মধ্যে একটি পাহারায় ঘাঁটির বেড়া চোখে পড়ছে। দুটি মেয়ে হেঁটে চলেছে পথ দিয়ে। হ্যামিলটন তখন আমাদের দিকে ফিরে হাসেন। তার হাসি অভয় দেয়। মেয়েদের মত ফিনফিনে চেহারা হ্যামিলটনের। কিন্তু লোকে বলে তিনি নাকি অকুতোভয়। ম্যাকলেনকে তিনি দেখতে পারেন না। এই হাসি

তাই ম্যাকলেনের প্রতি ঘৃণার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতও বটে।
প্রসন্নদৃষ্টিতে ওয়াশিংটন ম্যাকলেনের দিকে তাকান। বলেন, এবার বসুন ক্যাপ্টেন ম্যাকলেন।
হ্যামিলটন উঠে দাঁড়ান—হাতের খানকয়েক কাগজের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ধীরে ধীরে ঘর পেরিয়ে যান। ম্যাকলেনের দিকে তিনি কোন নজরই দেননা। হেঁটে তিনি দূরের দেয়ালের কাছে যান এবং দেয়ালে ঠেস দিয়ে ঘুরে দাঁড়ান। সরাসরি মাকলেনের দিকে তিনি তাকান নি। মেয়েদের মত লম্বা পল্লবে আধবোজা তার চোখ।
তিনি বলেন, ক্যাপ্টেন ম্যাকলেন, এই লোকটিকে গ্রেফতার করা অবধি যাবতীয় ঘটনা আদালতের সামনে বর্ণনা করুন। ঠিক ঐ সময়ে কিং অফ প্রুশিয়া রোডে কি করে আপনি হাজির হলেন সেই কথাটাই জানান। মনে হয় সময়টা ভোর বেলাই ছিল।
ম্যাকলেন বলে, মাননীয়গণ, কর্নেল হ্যামিলটনের অভিসন্ধি আরোপ করার বিরুদ্ধে আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমি আমার কর্তব্য করতে যাচ্ছিলাম।
হ্যামিলটন ঃ অভিসন্ধি আরোপের কোন অভিপ্রায় আমার নেই।
আদালত ঃ ওর প্রশ্নের জবাব আপনাকে দিতে হবে মিঃ ম্যাকলেন।
ম্যাকলেন ঃ মাননীয়গণ, আপনারা জানেন পণ্টনের জন্য রসদ যোগাড় করতে কি কাজ আমাকে করতে হয়। ইদানীং আমি সংবাদ পাই যে কোয়েকাররা রাত্রে চলাফেরা শুরু করেছে। ট্রেনের মত সারবেধে তারা ফসলের গাড়ি নিয়ে যায়। প্রত্যূষে ফিলাডেলফিয়ার কাছাকাছি ব্রিটিশ ঘাঁটিতে পৌছোবার আশায় সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গেই তারা রওনা হয়। কাজেই আমি ভোর রাত্রে ঘোরাফেরা করবার নিয়ম করে নিয়েছি। সতেরোই ফেব্রুয়ারি সকাল বেলাটা ভারি ভ্রূপয়া ছিল। নোরিসটাউন থেকে চল্লিশজন অশ্বারোহী নিয়ে ফিরবার পথে সশস্ত্র চারজন লোককে দেখতে পাই। খোঁজখবর নেবার জন্য আমি এগিয়ে যাই এবং চেঁচিয়ে তাদের থামতে বলি। তারা তখন মাঠের মধ্য দিয়ে দৌড়তে থাকে এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ আমরা বরফের মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলি। তবু আমার লোকজন তাদের পেছনে ধাওয়া করে। পরিশেষে যখন তারা বুঝতে পারে যে পালাবার পথ নেই, তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করে গুলি করে আমার এক সঙ্গীকে হত্যা করে।
হ্যামিলটন বলেন, ধন্যবাদ মিঃ ম্যাকলেন। তিনি তখন আমাদের কাছে এগিয়ে আসেন এবং ম্যাকলেনের দিকে পেছন ফিরে চাপাগলায় জিজ্ঞানা করেন, মেয়েটির হাতে অস্ত্র ছিল?
না স্যার!
তখন আবার তিনি টেবিলের কাছে হেঁটে যান এবং টেবিলের উপর হাত রেখে ম্যাকলেনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা মিঃ ম্যাকলেন, আপনি চারজন দলত্যাগীর কথা বলেছেন। তারা সবাই পুরুষ ছিল কি?
না স্যার। একজন মেয়ে ছিল!
তাহলে তিনজন দলত্যাগী ছিল বলুন। আমি যতদূর জানি, আমাদের পণ্টনে তো কোন মেয়ে নাম লেখায়নি।
হ্যাঁ স্যার—তিনজন লোক।

আচ্ছা, আপনি চারজন লোকের হেঁটে যাবার কথা বলেছেন। মেয়েটির হাতেও অস্ত্র ছিল কি ?
ম্যাকলেন ইতস্ততঃ করতে থাকে।
জবাব দিন মিঃ ম্যাকলেন। ছিল মেয়েটির হাতে অস্ত্র ?
আমার মনে নেই।
আচ্ছা মিঃ ম্যাকলেন, গড়ে একটা বন্দুকের ওজন কত ?
আদালত ঃ মিঃ হ্যামিলটন, আপনি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা না করলেই ভাল হয়। ঘটনাটির নাটকীয় রূপ দেবার জন্য আপনি এখানে উপস্থিত হননি। ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে সাহায্য করাই আপনার কর্তব্য।
হ্যামিলটন ঃ আদালতের অনুমতি পেলেই আমি প্রমাণ করতে পারব যে এর সব কিছুই প্রাসঙ্গিক। আমার প্রশ্নের জবাব দিন মিঃ ম্যাকলেন।
ম্যাকলেন ঃ স্টোন খানেকের মত হতে পারে।
অর্থাৎ পনেরো কি ষোল পাউণ্ডের মতো। কেমন তো ! আচ্ছা, একটা বন্দুকের ওজন যে অনায়াসেই বিশ পাউণ্ডও হতে পারে এ কি আপনি অস্বীকার করবেন ?
বন্দুক ওজন করার অভ্যাস আমার নেই।
কিন্তু আমি মনে করি, এই যে অনশনক্লিষ্ট স্ত্রীলোকটির কথা হচ্ছে, তার ওজন বড় জোর আশি কি নব্বই পাউণ্ড। তবু আপনি বলতে পারছেন না যে তার কাছে অস্ত্র ছিল কি ছিল না ?
ম্যাকলেন বলে, মাননীয়গণ, কর্নেল হ্যামিলটনের খোঁচা আমি আপত্তিজনক বলে মনে করি। এখানে আমার বিচার হচ্ছে না।
তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে মেয়েটির হাতে অস্ত্র ছিল না। হ্যামিলটন বলেন।
মাননীয়গণ…
মিঃ হ্যামিলটনের প্রশ্নের জবাব দিন।
পুরুষেরা সশস্ত্র ছিল।
আর মেয়েটি ছিল না। কেমন তো ! মেয়েটি মারা গেছে—আপনার লোকই গুলি করে মেরেছে। কথাটা আপনার বিবরণ থেকে বাদ পড়েছে মিঃ ম্যাকলেন। এখন বলুন তো ঘটনাটা কেন আপনি বাদ দিলেন, আর কেনইবা আপনার লোক এই নিরস্ত্র মেয়েটিকে গুলি করল ? তাকে নিশ্চয়ই দলত্যাগী বলতে পারেন না।
সে যে মেয়ে তা আমরা বুঝতে পারিনি। পুরুষের মতই পোশাক পরা ছিল।
কিন্তু নিরস্ত্র ছিল। আপনার কত জন লোক গুলি চালায় মিঃ ম্যাকলেন ?
বলতে পারি না—জনা বারো হতে পারে।
আপনিই গুলি করবার আদেশ দিয়েছিলেন তো !
হাঁ। আমরা তখন কর্তব্যরত ছিলাম। আর সশস্ত্র লোককটি গ্রেফতারে বাধা দেয়।
তবু যে গুলিটা লক্ষ্য ভেদ করল তাতে শুধু একটি নিরস্ত্র স্ত্রীলোক খুন হলো। এর কারণ কি বলতে পারেন ?
সঙ্গীদের হাতের টিপ সম্পর্কে জবাবদিহি করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তারা ঘোড়ার পিঠে

ছিল এবং চলমান লোকের উপর গুলি করে ছিল।
মিঃ ম্যাকলেন, আপনি বলেছেন যে আপনারা গুলি ছুঁড়বার আগেই আপনার দলের লোকটি পলাতকদের গুলিতে মারা যায়। নিশ্চয়ই আপনি স্বীকার করবেন যে চলমান বারো জন লোক যখন চঞ্চল লক্ষ্যের দিকে গুলি চালায় তখন বারোটা গুলির মধ্যে অন্তত একটা লাগা, মোটামুটি ভাল লক্ষ্যভেদ বলতে হবে। তা তারা অশ্বপৃষ্ঠে থাক কি পায়ে হেঁটে এগোক তাতে বিশেষ কিছু এসে যায় না। এ-ও আপনি বলেছেন যে দলত্যাগীরা গুলি করবার পরক্ষণেই আপনি গুলি চালাবার আদেশ দিয়েছিলেন এবং দলত্যাগীরা তখনও চলছে। আচ্ছা ব্যাপারটা এইবার ভাল করে আমায় বুঝতে দিন ঃ তিনজন চলমান লোক আপনার ব্রিগেড লক্ষ্য করে গুলি করে এবং তার একটা গুলি লাগে। এ থেকে আপনার কিছু মনে হয় ?
তার মানে জেনারেল ওয়েনের লোকজনের হাতের টিপ আমাদের চাইতে ভাল কি না ? আমার লোকজন অশ্বারোহী—হাতের টিপ তাদের নির্ভুল নয়।
আবার এও হতে পারে যে আপনার লোকজন গুলি করে মেয়েটিকে হত্যা করে এবং তখন লোক তিনটি দাঁড়িয়ে আপনাদের দিকে গুলি করে!
আদালত ঃ মিঃ হ্যামিলটন, অনুমান দ্বারা আদালতকে প্রভাবিত করবার চেষ্টা করা উচিত নয়।
হ্যামিলটন তখন ম্যাকলেনের দিকে ফিরে শান্তভাবে বলেন, মিঃ ম্যাকলেন, কারা আগে গুলি করেছে বলুন তো! দলত্যাগীরা না আপনারা ?
ম্যাকলেন বলে, মাননীয়গণ, আমাকে এ প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে কি ?
দিতে হবে।
লোক কটি বনের মধ্যে পালিয়ে যাচ্ছে দেখে আমি গুলি করবার আদেশ দিই।
বেশ তো, প্রথম গুলি করে কারা ?
আমার লোকজন।
তবু আপনি বলেছেন যে গ্রেফতার এড়াবার জন্য এরা পালটা গুলি করে। তাছাড়া, ইঙ্গিতে আপনি এ কথাও বোঝাতে চেয়েছেন যে প্রথমে ওরাই গুলি করে। ইচ্ছে করে আপনি এদের রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত বলে বর্ণনা করেছেন মিঃ ম্যাকলেন।
মাননীয়গণ, সাধারণ অপরাধীর মত এইভাবে আমার উপর দোষারোপ করা উচিত কি ?
ওয়াশিংটন বলেন, মিঃ ম্যাকলেনের প্রতি কোন অভিসন্ধি আরোপ করার অধিকার আপনার নেই মিঃ হ্যামিলটন। এখানে তার বিচার হচ্ছে না।
কিন্তু এমন অভিযোগে এই লোক তিনটির বিচার হচ্ছে যে দোষী সাব্যস্ত হলে তাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।
তখন ওয়েন বলে ওঠেন, ইওর একসেলেনসি ; আমার দলের উপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার দোষারোপ করা হয়েছে। আমি দাবী করছি যে এ অভিযোগ প্রমান করতে হবে।
হ্যামিলটন ঃ আচ্ছা মিঃ ম্যাকলেন, এই লোক তিনটি কি ইচ্ছে করে গুলি ছোড়ে, না স্ত্রীলোকটি খুন হওয়ায় রাগের মাথায় গুলি ছুঁড়েছে।
তারা আমার এক অনুচরকে হত্যা করেছে। এরা দলত্যাগী।

কনওয়ে তখন কাত হয়ে বলেন, আপনি কি বোঝাতে চাইছেন কর্নেল হ্যামিলটন ? আমরা কোন অফিসার বা ভদ্রলোকের বিচার করছি না। বিচার করছি তিনজন পলাতকের। ওদের দিকে একবার তাকান তো! এদের সৈনিক বল্লে সৈনিক নাম অপবিত্র করা হয়।

ওয়েন তখন চেঁচিয়ে ওঠেন, আমার সৈনিকদের নাম করে কর্নেল কনওয়ে যদি কোন ব্যক্তিকে আঘাত করতে চান তো তিনি আমার সঙ্গে মোকাবিলা করতে পারেন। এরা সৈনিক কিনা···

ভদ্রমহোদয়গণ! ওয়াশিংটন শান্তভাবে বলে ওঠেন।

কনওয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওয়েন কাঁপতে থাকেন। ওয়াশিংটন বলেন, বসুন জেনারেল ওয়েন। আত্মবিস্মৃত হবেন না।

হ্যামিলটন বলেন, কর্নেল কনওয়ে যদি কোন মন্তব্য করতে চান তো ব্যক্তিগতভাবে আমি তার সবকটির জবাব দিতে পারব। এমনি পাঁচ হাজার লোক আছে এই ছাউনিতে। তাদের যদি আমি সৈনিক নামে ডাকতে না পারি তো আমি আমার সামরিক পদ ত্যাগ করব।

ওয়াশিংটনের কণ্ঠস্বর হিম শীতল। তিনি বলেন, মিঃ হ্যামিলটন, ব্যক্তিগত আলোচনার জন্য আপনি আদালতে উপস্থিত হননি। আপনার যদি হয়ে গিয়ে থাকে বলে মনে করেন তো আদালত আপনাকে চলে যাবার অনুমতি দিচ্ছে।

হ্যামিলটন ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। আমার একবার মনে হয় তিনি বেরিয়ে যাবেন। তারপর তিনি বলেন, বিনীতভাবে আমি আপনার কাছে মার্জনা চাইছি স্যার! এই লোক-কটির ব্যাপারে আমার বিশেষ কোন স্বার্থ নেই। আমাকে এদের অধিকার রক্ষার জন্য বলা হয়েছে। আমার বিশ্বাস, সেইটেই আদালতের কর্তব্য।

ওয়েন বলেন, ইওর একসেলেনসি, আমিও মিঃ হ্যামিলটনের সুরে সুর মেলাচ্ছি। আমিও মার্জনা চাইছি।

বলে যান মিঃ হ্যামিলটন। ওয়াশিংটন সংক্ষেপে বলেন।

হ্যামিলটন বলেন, মিঃ ম্যাকলেন, কেউ যদি আপনার স্ত্রীকে গুলি করে এবং আপনার হাতে যদি গুলিভরা বন্দুক থাকে আর অপরাধীকে যদি সামনে দেখতে পান—কি করবেন আপনি ?

ম্যাকলেন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওয়াশিংটন বল্লেন, এ প্রশ্নের জবাব ক্যাপ্টেন ম্যাকলেন দেবে না। আপনি যদি প্রাসঙ্গিক ঘটনার মধ্যে থাকতে না পারেন তো আমি সাক্ষীকে বিদায় করে দেব মিঃ হ্যামিলটন।

কিন্তু ইওর একসেলেনসি, আসল ঘটনাটা কি ? আমি প্রমাণ করেছি যে ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের লোকজন প্রথমে গুলি করেছে। এ লোকগুলো পালিয়ে যেতে পারত। মিঃ ম্যাকলেনও স্বীকার করেছেন একথা। কিন্তু মেয়েটিকে গুলিবিদ্ধ দেখেই···

লর্ড স্টার্লিং তখন বিরক্তভাবে বলেন, আপনি কি সাধারণ এক শিবির-সঙ্গিনীকে অফিসারদের স্ত্রীর সঙ্গে তুলনার যোগ্য বলে মনে করেন ? তা যদি হয় স্যার, তাহলে এ টেবিলে একলা আমিই অসম্মান বোধ করব না।

এমন কোন তুলনা আমি করিনি স্যার। তবে লর্ড স্টার্লিং যদি ঝগড়া করতে চান তো···
আর আমি আপনাকে সাবধান করে দেব না মিঃ হ্যামিলটন। ওয়াশিংটন সংক্ষেপে জানান।
আমি দুঃখিত স্যার। আমাকে জেরা করবার অনুমতি দিন।
বেশ!
মিঃ ম্যাকলেন, মেয়েটির মৃত্যুতে পলাতকদের মধ্যে কেউ কি শোকের লক্ষণ প্রকাশ করেছিল?
মনে হয় একজন করেছিল।
কি কি করেছিল বলুন তো!
যারা তাকে ধরেছিল তাদের হাত ছাড়িয়ে সে স্ত্রীলোকটির কাছে ছুটে যায়।
কে সে বলতে পারেন?
না।
আচ্ছা, এই লোককটির দিকে একবার তাকান তো মিঃ ম্যাকলেন। কর্নেল কনওয়ে বলেছেন যে এরা সৈনিক নাম কলঙ্কিত করেছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে এরা অর্ধ-ভুক্ত এবং অর্ধনগ্ন। দু-তিন জনের হাত ছাড়িয়ে যেতে পারে এমন জোর এদের কারও আছে বলে মনে হয় না। প্রবল উত্তেজনার বশেই এদের পক্ষে এমন জোরের কাজ করতে যাওয়ার চেষ্টা করা সম্ভব। আচ্ছা মিঃ ম্যাকলেন, আপনি কি স্বীকার করবেন যে এদের উত্তেজনা খুবই প্রবল ছিল?
জানি না।
কিন্তু জানতে হবে আপনাকে। নিজের চোখে আপনি সব কিছু দেখেছেন!
তাহলে আমি মেনে নিচ্ছি।
ধন্যবাদ। ব্যস এই পর্যন্তই মিঃ ম্যাকলেন।
আদালত আমাকে যাবার অনুমতি দিচ্ছেন কি? ম্যাকলেন জিজ্ঞাসা করে।
তখন ওয়াশিংটন জিজ্ঞাসা করেন, আর কেউ মিঃ ম্যাকলেনকে কোন জেরা করবেন? কোন জবাব পাওয়া গেল না।—আপনি যেতে পারেন। আবার তিনি বলেন।
ম্যাকলেন লম্বা লম্বা পা ফেলে বেড়িয়ে যায়। ধীরে ধীরে হেঁটে আবার জানালার কাছে যান হ্যামিলটন। গোটা ঘরখানা নীরব। ঘড়ির টিকটিক শব্দ ড্রাম বাজনার মত লাগছে।
ওয়াশিংটন বলে ওঠেন, আপনার কোন সাক্ষী আছে মিঃ হ্যামিলটন?
আদালত আসামীদের জেরা করবার অনুমতি দেবেন কি? আমাদের দেখিয়ে হ্যামিলটন জিজ্ঞাসা করেন।
বেশ!
হ্যামিলটন তখন আমার নাম ধরে ডাকেন। আমি উঠে দাঁড়াই। কেনটন ও চার্লি কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকায়।
এগিয়ে এস। মার্কার বলেন।
আমি টেবিলের কাছে এগিয়ে যাই।
তোমার নাম আলেন হেল?

হাঁ স্যার।
রেজিমেন্টের নাম।
চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া।
তুমি পেনসিলভানিয়ার লোক ?
না স্যার ! আমার জন্ম নিউ ইয়র্কে।
নিউ ইয়র্কের কোথায় ?
মোহক উপত্যকায়।
সেইখানেই বরাবর বাস করতে ?
সেখানে এবং হ্রদ অঞ্চলে।
হ্রদ অঞ্চলটা কোথায় ?
পশ্চিমে—ফিঙ্গার হ্রদের কাছাকাছি। আমরা তাকে ভ্যালি বলে থাকি।
তোমার বয়স কত ?
একুশ বছর।
পল্টনে কখন ভর্তি হয়েছ ?
সতেরোশো পচাত্তর সালের মে মাসের শেষের দিকে।
আড়াই বছরের মত কাজ করেছো তাহলে। আচ্ছা নাম লিখিয়েছিলে কতদিন আগে ?
প্রায় তিন বছর আগে।
পল্টনের চাকুরীর মেয়াদের যখন আর মাস কয়েক বাকী আছে তখন পালালে কেন ?
আমি মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিই। কেমন জমাটবাঁধা ভারী ভারী লাগে। আমি যে এইখানে দাঁড়িয়ে আছি…অফিসাররা রয়েছেন গোল টেবিলের চারপাশে এবং হ্যামিলটন যে বেগনি চোখের লম্বা পাতার আড়াল থেকে আমাকে লক্ষ্য করেছেন—এ সব কিছু আস্তানার বাঙ্কে শুয়ে স্বপ্ন দেখার মত মনে হয়।
ভেবেছিলাম ফৌজ ছেড়ে বাড়ি চলে যাব। আমি বলি।
কিন্তু কেন ?
ভাবলাম এ শীত আর কাটাতে পারব না, তাই পালাবো বলে মতলব করি। এই নরকের মধ্যে আর ভাল লাগছিল না, তাই ভ্যালি অঞ্চলের জন্য মনটা আনচান করছিল। ভাবলাম ওখানে চলে যাব। অনেক লোকই তো ছেড়ে যাচ্ছিল এবং গুজব রটে যায় যে বসন্তকালে পল্টনের অস্তিত্ব আর থাকবে না।
মোহক উপত্যকায় পৌঁছোতে পারবে বলে আশা ছিল ?
আমি মাথা নেড়ে সায় দিই।
অর্থপূর্ণভাবে হ্যামিলটন আমার পায়ের দিকে, আমার ছেড়াখোড়া জামা-কাপড়ের দিকে তাকান। বলেন, যখন তুমি পল্টনে ভর্তি হও তখনই কি পেনসিলভানিয়ার রেজিমেন্টে ঢুকেছিলে ?
না স্যার। বোস্টনের বাইরে খুব সামান্যই পেনসিলভানিয়ার লোক আছে। আমি চার নম্বর নিউ ইয়র্ক রেজিমেন্টে ভর্তি হয়েছিলাম।
সে রেজিমেন্ট এখন কোথায় ?

মারা গেছে। আমি জবাব করি।
তুমি কি বলতে চাও যে তুমি ছাড়া আর একজনও বেঁচে নেই!
আরও পাঁচজন আছে।
চার নম্বর নিউ ইয়র্ক রেজিমেন্ট থেকে কেউ ভেগেছে?
সামান্য জনকয়েক। বাকী আর সবাই কোন না কোন যুদ্ধে মারা গেছে!
বুঝলাম। আচ্ছা তোমরা তিনজন যখন পালালে তখন সঙ্গে একজন মেয়ে নেবার সিদ্ধান্ত করলে কেন? তোমরা কি একথা ভেবেছিলে, যে দীর্ঘপথ তোমরা চলবে বলে স্থির করেছিলে মেয়েটিও অতটা পথ যেতে পারবে?
কোন মেয়ে যে অতটা পথ যেতে পারবে, এ কথা আমি বিশ্বাস করিনি। তাছাড়া ইদানীং তার গায়ে তেমন জোরও ছিল না।
তাহলে তাকে সঙ্গে নিলে কেন?
সে যেতে চাইল বলে। বল্লে, যদি তাকে না নিয়ে যাই তো সে আত্মহত্যা করবে।
সে কি তোমার স্ত্রী?
না সে আমার স্ত্রী নয়। ছাড়াছাড়া ভাবে বলি। মেয়েটি শিবির-সঙ্গিনী।
তবু সে তোমায় এত ভালবাসত সে তুমি ছেড়ে গেলে সে আত্মহত্যা করতো।
হাঁ।
আচ্ছা, যেদিন সকালবেলা তোমাদের গ্রেফতার করা হয়, তখন কোথায় ছিলে তোমরা?
নোরিসটাউনের পথ ধরে যাচ্ছিলাম।
যেতে যেতে ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের লোকজন আসতে দেখলে, কেমন তো! আচ্ছা, প্রথম এদের চিনতে পেরেছিলে?
তাদের নম্বর দেখে বুঝেছিলাম যে তারা পল্টনেরই লোক।
তখন কি করলে?
বনের আড়ালে ঢুকব বলে মাঠ দিয়ে দৌড়োতে লাগলাম।
মাঠ পার হবার সময় তোমরা এক সাথে ছিল?
বেস পড়ে যায়। আমি তাকে ধরে তুলছিলাম। চার্লি ও কেনটন দশ বারো পা সামনে ছিল।
তারা এড়িয়ে যেতে পারত?
দেরি না করলে পারত।
কি হল তখন?
অশ্বারোহীদের জন কয়েক মাটিতে নেমে পড়ে। তারপর এক ঝাঁক গুলি ছোঁড়ে আমাদের দিকে। বেসের গায়ে বুলেট লাগে এবং সে আমার হাত থেকে পড়ে যায়।
গুলি করবার আগে অশ্বারোহীদের কেউ কেউ মাটিতে নেমেছিল? তাক করে গুলি ছোড়ে।
বলতে পারব না। গুলির টিপ ওদের ভাল নয়।
হ্যামিলটন হাসেন। তারপর ইচ্ছে করেই মুখ গম্ভীর করেন। বলেন, তোমরা কি করলে তখন?

বেসের গায়ে গুলি লেগেছে দেখে আমি বোধহয় ক্ষেপে যাই। মনে হয়, তখন আর কোন জিনিসের পরোয়া ছিল না ; তাই বন্দুক তুলে গুলি করি। কেনটন আর চার্লি'ও করে। মনে হয় সবাই আমরা পাগলা হয়ে গিয়েছিলাম···ফিরে যাবার কথা ভেবে মাথা বিগড়ে গিয়েছিল।

গুলি করবার সময় তোমরা তাক করেছিলে ?

যতদূর মনে পড়ে, না। যেমন বন্দুক ধরেছিলাম সেই ভাবেই গুলি করেছিলাম। ওরাও তাই করেছিল।

কারা—তোমার বন্ধুরা ?

হাঁ।

ধন্যবাদ। ব্যস, আর বলতে হবে না।

আমি আমার চেয়ারে ফিরে আসি এবং ধপ করে বসে পড়ি। কেনটন ও চার্লি' পাথরের মূর্তির মতো বসে আছে। নাক সোজা চেয়ে আছে এবং কোন দিকেই তাকাচ্ছে না। আমার দিকেও তাকায়নি।

হ্যামিলটন তখন চেয়ারের দিকে ফেরেন। বল্লেন, মাননীয়গণ, আর আমার বেশী কিছু বলবার নেই। এরা দলত্যাগী বটে কিন্তু খুনী নয়। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ এরা করেনি। ক্ষেপে গিয়ে গুলি করেছে। এদের অপরাধ পূর্বকল্পিত বা স্বেচ্ছাকৃত নয়। কি দুর্ভোগ এরা ভুগছে, আপনাদের কাছে তা বলাই বাহুল্য। ভগবান সাক্ষী, আপনারা সকলেই তা জানেন। এবারকার শীত সত্যিই নরক সৃষ্টি করেছে। আমরা পাথুরে বাড়িতে থাকি, খাই, মদ্যপান করি, ঘুমোতে পারি এবং ভাল জামা-কাপড় পরি। কিন্তু আপনারা দেখেছেন, কেমন করে জানোয়ারের মত এরা নিজেদের আস্তানায় ঘাড় গুঁজে থাকে। সবই জানেন আপনারা।

ওয়াশিংটন বলেন, মিঃ হ্যামিলটন, এটা অসামরিক আদালত নয় সামরিক অপরাধের জন্য আমরা এদের বিচার করছি। এদের পক্ষে গুলি করে হত্যা করা বিদ্রোহের সামিল।

কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সে কাজ এদের করতে হয়েছে। মানবতার বিধানে এরা নির্দোষ। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এরা উপোস করেছে। কারও মাথা ঠিক ছিল না।

তাহলেও এরা খুন করেছে।

মাননীয়গণ, আমি আদালত নই। আমি শুধু ওকালতি করতে পারি। তবে এটুকু বলতে পারি যে এদের অবস্থায় পড়লে, আমিও এই-ই করতাম।

জানালার পাশে গিয়ে তিনি চেয়ারে বসে পড়েন এবং বাইরের দিকে চেয়ে থাকেন। টেবিলে বসা সেনানীরা তখন চাপা গলায় আলোচনা শুরু করেন। ওয়েনের কথা কানে আসে। বলছেন, সৈনিক নিয়ে আপনি কারবার করছেন না স্যার। আস্ত জানোয়ার ! কোন শৃঙ্খলা নেই। এ বাবুদের পিপে নিয়ে খেলা করার সামিল।

যদি এই অবস্থাও হয় তাহলেও আমি একই বিচার করব। যদি একজন সৈনিকও থাকে তো তাকে আমার অধীনে থাকতে হবে।

লর্ড স্টার্লিং। আমি হলে কাউকেই রেহাই দিতাম না। আচ্ছা করে হিজ ম্যাজেস্টির বাহিনীর মত শিক্ষা দিয়ে দিতাম।

সেই মহামান্য রাজা কিন্তু আমার পল্টন পরিচালনা করছেন না লর্ড স্টার্লিং। ওয়াশিংটন ফোড়ন কাটেন।

স্বপ্নাবিষ্টের মত নিশ্চল হয়ে বসে আছে কেনটন আর চার্লি। এই সামরিক বিচার সম্পর্কে তাদের কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হয় না। দুজনেরই দৃষ্টি শূন্য। আমি ঘড়িটার টিকটিক শুনছি—চেয়ে আছি দোলকটার দিকে। প্রতিটি মুহূর্তের শব্দ শুনছি। কেমন ক্লান্ত—ঝিমুঝিমু লাগছে। ঘুমোবার জন্য মন আইঢাই করছে। ক্রমে ঘরটা গরম হয়ে উঠেছে। মেঝেয় একখানা কম্বল বিছান। ইচ্ছা হয় কম্বলের উপর হাত পা ছাড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। চোখের অর্দ্ধেকটা বুজে থাকি। মৌমাছির গুনগুনানির মত চাপা কথার গুঞ্জন আসে কানে।

হঠাৎ ওয়াশিংটনের ভরাট গলা শুনে চমকে উঠি। তিনি বলেন,—মিঃ হ্যামিলটন, তিন জনের মধ্যে কে ম্যাকলেনের সৈনিকটিকে খুন করেছে খোঁজ নিয়ে দেখুন তো।

হ্যামিলটন আমাদের দিকে ফেরেন। কেনটন উঠে দাঁড়ায়। হেড়ে গলায় বলে, আমি।

দূরাগত কণ্ঠের মত চার্লির গলা কানে আসে, মিথ্যে কথা।

আমিও চীৎকার করে বলে উঠি, মিথ্যে করে বলছে। হঠাৎ বুঝতে পারি আমিই চেঁচিয়ে বলছি, কি আসে যায় ? কে খুন করেছে জানতে চান ? আপনারাই আমাদের এই জানোয়ার বানিয়েছেন···জীবনটা প্রহসনে পরিণত করেছেন ! জীবনের কিছুই মানে নেই এখানে। আছে শুধু মৃত্যু—শুধু মৃত্যু ! কবর দেবার ব্যবস্থাও আপনারা করেন না। গাছের গুঁড়ির মত বরফের উপর পাঁজা করে রাখেন। হঠাৎ সম্বিত ফেরে, বুঝতে পারি, সেখানে বসে বসে নির্বোধের মত হি হি করে হেসে চলেছি।

কেনটন আমায় জড়িয়ে ধরে। ফিসফিস করে বলে, আলেন শান্ত হও, শান্ত হও !

চার্লি স্পষ্টভাবেই বলে, গোল্লায় যান ! আপনারা সবাই জাহান্নামে যেতে পারেন।

এখানে বসে বসে মনে হয়, আমি যেন তাদের থেকে অনেক দূরে···কোন ব্যথা বা তার অনুভূতির অনেক বাইরে চলে গেছি। ওরা খানিকটা অবাক হয়ে পড়ে। পুতুলের মত টেবিলের পাশে নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকে। হ্যামিলটন মুখ কোঁচকায়—লোপ পায় তার বালকের মত মুখের ভাব।

ওদের বাইরে নিয়ে যান মিঃ হ্যামিলটন। নিরুত্তেজ ক্লান্ত স্বরে ওয়াশিংটন বলেন।

আমরা উঠে দাঁড়াই। হ্যামিলটন দরজা দিয়ে আমাদের নিয়ে বেরিয়ে আসেন। প্রহরীরা আমাদের ঘিরে ধরে এবং হ্যামিলটন আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে যান। বলেন, এখানে বস। আর দাঁড়িয়ে থাকবার দরকার হবে না। আমি ফিরে যাচ্ছি ; হয়ত আমাকে আরও কিছু বলতে দেবেন। ঠিক বলতে পারি না ! পকেট থেকে একটা পাইপ এবং একটি ছোট্ট তামাকের থলি বার করে টেবিলের পর রেখে বলেন, ইচ্ছে করলে খেতে পার।

হ্যামিলটন বেরিয়ে যান। বসে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া চাওয়ি করি। চার্লি বলে, অনেক বকর বকর···

আমার ভয় হচ্ছে। আমি বলি।···হা ঈশ্বর !

ফাঁসিতে মরা বড় কষ্টের ! কেনটন বলে,—ফাঁসিতে মরতে হবে এ কথা কোনদিন কল্পনাও করিনি। এই ভীষণ ঠাণ্ডায় ফাঁসিতে ঝুলে থাকা যে কি ভয়ানক !···

ফাঁসি না-ও হতে পারে।

নাঃ। মনে মনে ফাঁসি দেবে বলেই ঠিক করে রেখেছে।

হ্যামিলটন লোকটা আমাদের জন্য খুব বলেছে। এত সময় যে বলবে, এ আমি ভাবতেই পারিনি।

বোধ হয়, ম্যাকলেনকে ঘৃণা করে।

বেশ ভাল কথাই বলেছে।

আবার আমরা পরস্পরের দিকে তাকাই। নীরবে চেয়ে থাকি একদৃষ্টে। তারপর হঠাৎ চোখ ঘুরিয়ে যার যে দিকে খুশি তাকাই। পাশের ঘরে বসেও যেন ঘড়ির টিকটিক শুনতে পাচ্ছি বলে মনে হয়।

ঘড়িতে সময়ের চলা দেখতে ভারি মজা লাগে।

আমরা যে ঘরে বসেছি সেখানে গোধূলির ছায়া নেমেছে। বাইরে শীতের সন্ধ্যা নেমে আসছে। নিভু নিভু একটা আগুন জ্বলছে ঘরে। উৎসুক চোখে আমরা সৌখিন আসবাব পত্র ও মেঝেয় বিছান মোটা কম্বল খানার দিকে তাকাই। কেনটন বলে, কোয়েকার ব্যাটারা বেশ আরামেই থাকে।

আমি পাইপটার জন্য হাত বাড়াই। বলি, আমাদের খাবার জন্যই তো দিয়ে গেছে!

খাবারের জন্য প্রাণ আইঢাই করছে, খালি পেটে তামাক টানতে ভাল লাগে না। বিড়বিড় করে চার্লি বলে।

তামাকে দু'চার টান মারলে সময় তো কাটবে!

ওরা নিশ্চিত সাজা দেবে।

আমারও তাই মনে হয়।

পাইপে তামাক ভরে আমি আগুনের কাছে যাই এবং একখানা জ্বলন্ত কাঠকয়লা তামাকের উপর দিই। তামাকে টান দিয়ে মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। পাইপটা তখন চার্লির হাতে দিই।

পাইপটার দিকে চেয়ে চার্লি বলে, তামাক টানতে এলি ভারি ওস্তাদ। যখন তামাক পাওয়া গেছে, দিন রাত তার মুখে পাইপ থাকত। মনে পড়ে?

অনেক বছর আগের কথা বলে মনে হয়।

তামাক টানতে সে যেমন ওস্তাদ তেমনটি আর কাউকে দেখিনি।

তা বটে।

এলি আমাদের মরতে দেখবে, এ ভাবতেও কেমন লাগে! ছোটটি থেকে আমাকে সে বড় হতে দেখেছে। কেনটন বলে।

আমি বলি, আমাদের যদি ফাঁসিই হয় তবে তো আমি মানুষ থাকব না কেনটন। ভয়ে শক্ত কাঠ হয়ে যাব।

ফাঁসিতে মরা বড় ভয়ানক!

তিনজনেই বসে আছি আর তামাক টানছি। ঘরটা আরও অন্ধকার হয়। আগুনের শিখা দেওয়ালে আঁকাবাকা ছায়া ফেলে। মনে হয় আমরা যেন কাঁপছি আর উসখুশ করছি।

হা ভগবান, বড় ক্ষিদে পেয়েছে আমার। চার্লি ফিসফিস করে বলে।

আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়েছে। ভারি ইচ্ছে করছে পরিষ্কার এক গ্লাস জল খেতে।
এতক্ষণে তো ওদের কথাবার্তা হয়ে যাওয়া উচিত। ভয়ে ভয়ে আমি বলি।
নিশ্চয় ফাঁসি দেবার মতলব আঁটছে।
হা ভগবান, একটু থাম না কেনটন। বিড়বিড় করে চার্লি বলে।
পাইপটা কেনটনের হাতে। বিষণ্নভাবে সে বলে, আগের পাইপটা ভেঙে বোকার মত কাজ করেছি। পাইপটা ও আমাদের ঠাট্টা করবার মতলব দেয়নি।
বাইরে পায়ের শব্দ শোনা যায়। আমরা দরজার দিকে তাকাই। হ্যামিলটন ঘরে ঢোকেন। পেছনে প্রহরী। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলেন, আমার সঙ্গে এস।
ব্যাপারটা আমরা সবাই বুঝতে পারি। হ্যামিলটনের পেছু পেছু আমরা বিচার কক্ষে ঢুকি। টেবিলের উপর খান কয়েক মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতির পেছনে মুখ কখানা নড়ছে··· বারবার রঙ বদলাচ্ছে।
মার্কার বলে—এটেনশন্‌!
হ্যামিলটন জানালার কাছে যায়। ঘরের দিকে পেছনে ফিরে পেছনে হাত নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ওয়াশিংটনের বড় মুখখানা দেখতে পাচ্ছি। মনে হয় তাঁর পেশীগুলো ঢিলে হয়ে গেছে। প্রশান্ত ভাবের পরিবর্তে মুখে ফুটে উঠেছে বেদনার আঁকাবাঁকা রেখা। ওয়েন মাথা নীচু করে টেবিলের দিকে চেয়ে আছেন। গ্রীন চেয়ে আছে উপরের দিকে। লর্ড স্টার্লিং নখ কামড়াচ্ছেন! তার মুখেও কেমন একটা শূন্যতা। শুধু কনওয়ের মুখেই কেমন ধারা হাসি-হাসি ভাব।
এরপর মার্কার পড়ে যায়ঃ এই আদালতের বিচারে আলান হেল, কেনটন ব্রেন্নার এবং চার্লি গ্রীন রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং হত্যার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে! আদালত তাহাদের প্রতি এই দণ্ড বিধান করিতেছে যে, গোটা পেনসিলভানিয়ার লাইনের সামনে ড্রাম বাদ্য সহ তাহাদের প্যারেড করাইয়া রেজিমেণ্ট হইতে বহিষ্কার করিতে হইবে, সর্বসমক্ষে অস্ত্র ও পরিচয় চিহ্ন হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে এবং অতঃপর মৃত্যু পর্যন্ত গলায় ফাঁস পরাইয়া ফাঁসি দিতে হইবে।
কেনটন মুচকি হাসে। চার্লি গ্রীন আমার হাত চেপে ধরে···মাংসের মধ্যে আঙুল কেটে বসে। আপনা থেকেই আমি চীৎকার করে উঠি। তারপর আমার গলা আটকে যায়—আর কিছুই বলতে পারি না। প্রহরীরা চটপট ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেনানীরা সার বেঁধে বেরিয়ে পড়ার সময় তারা আমাদের ঘিরে থাকে!
হ্যামিলটন বলেন, ভগবান রক্ষা করুন, আমি দুঃখিত।

আমাদের মুখে কথা জোগায় না। তিনি বেরিয়ে যান। আমরাও প্রহরীদের পাহারায় চলতে থাকি।
হান্টিংডন কেল্লার কয়েদখানায় আছি। ঘরটিতে কোন জানালা বা আগুনের কুণ্ড নেই। চারটি কাঠের বেড়ার উপর চ্যাপটা একখানা চাল। চাল ও দেয়ালের মাঝখানে বাতাস ঢুকবার মত সামান্য একটু ফাঁক। হাওয়ার অভাব নেই। এবারকার অন্তহীন প্রচণ্ড শীতের

ঠাণ্ডা চুঁইয়ে ঘরে ঢুকছে।

কমাণ্ডাণ্ট ভেতরে আগুনের ব্যবস্থা করে দেয়। বলে, না হলে আজকের রাতে জমে যাবে যে! ফাঁসির আগে শীতে মরতে দেবার কোন মানে হয় না।

বাক্সের মত চুল্লীটি জ্বলন্ত কয়লার আভায় টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। বড় জোর ঘণ্টা তিনেক এর উত্তাপ থাকতে পারে! আমরা চুল্লীর চারপাশে ঘিরে বসে পড়ি! চালের ফুটো দিয়ে এক ফালি আকাশ দেখা যায়। সরু এক ফালি আকাশ আর একটি মাত্র তারা দেখতে পাচ্ছি। আমিই প্রথমে তারাটির দিকে তাকাই। তারপর ওরা দুজনে তাকায়—তিনজনে মিলে একদৃষ্টে চেয়ে থাকি! বসেই আছি। আমাদের মূক কামনায় ঘরখানি ভরে যায়। মহাশূন্যের হিমলোকের প্রতি অর্থহীন আকর্ষণ।

কালকে..। কেনটন বলতে শুরু করে! তারপর তার কণ্ঠস্বর ও চিন্তার খেই হারিয়ে যায়। এখন আমাদের বেশ চেষ্টা করে কথা বলতে হচ্ছে। প্রতিটি শব্দ যেন এক একটি স্বতন্ত্র ও সুস্পষ্ট চেষ্টার ফল। আগুনের কাছে বসেও কাঁপছি। তাপে সামনের দিক যেন পুড়ে যাচ্ছে কিন্তু পিঠ ঠাণ্ডা। কেনটন বলে, অনেক কথা হয়েছে···

আমি ভেবেছিলাম উত্তর দিকে ফিরে যেতে পারব। আমি বলি,—কোন সময় ভাবিনি যে ধরা পড়ব। ভেবেছিলাম, আমাদের যাবার পথেই বসন্ত আসবে!

আমিও তাই ভেবেছিলাম! কেনটন সায় দেয়।

ওদের সামনে ঐ ভাবে কথা বলে ভাল করিনি। বিড়বিড় করে বলে চার্লি,—কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম।

তাতে আর কি হয়েছে?

ফাঁসিতে ঝুলবার কথা ভেবেই আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ে, ছোটবেলায় মা আমাকে বলতেন যে ফাঁসিতে ঝুলবার জন্যই আমার জন্ম। অবশ্য কথাটা তিনি রহস্য করেই বলতেন।

তোমার মা বেঁচে আছেন? চার্লিকে জিজ্ঞাসা করে কেনটন।

যদি বেঁচে থাকেন তো বোস্টনে থুড়থুড়ি বুড়ী হয়ে আছেন। আর যদি মারা গিয়ে থাকেন তো ফাঁসির পর আমাকে ধমকাবেন। যুদ্ধের ঘোরতর বিরোধী তিনি। হা ঈশ্বর, যুদ্ধকে কি ঘৃনাই যে তিনি করতেন! ছাপার ব্যাপারে স্যাম আডমস একবার যখন আমার কাছে ঘ্যানঘ্যান করছিল, মা তাকে কাঠ নিয়ে তাড়া করেছিলেন। লাঠি দিয়ে আচ্ছা করে পিঠের ধুলো ঝেড়ে দিয়েছিলেন। তখন সে বলে, ঠিক আছে টোরি বুড়ী! মা বলেন, হাঁ ঠিকই আছে। বেজন্মা ভিখিরি কোথাকার। আমার ছেলের মাথা যদি খেতে চাস তো ভাল হবে না। আর কোন দিন এ বাড়িতে ঢুকবি না বলে দিলাম।

কেনটন হেসে ওঠে। ধীরে ধীরে বলে, মৃত্যুর পর কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করিনা। ভয় করবার মত কিছুই নেই। এই ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট শীতের কাঁপুনি বা উপোস—কোন কিছুই থাকবে না।

কিন্তু আমি না ভেবে থাকতে পারছি না। আমি বলি,—মরবার কথা কোন সময় মনে জাগেনি। এখন মনে হচ্ছে, আমার বয়স একুশ বছর এবং এই বয়সেই আমি যেন অনন্ত অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি।

চার্লি শান্তভাবে বলে, একলা তো আর যাচ্ছ না আলেন! একলা যাবার কোন প্রশ্নই ওঠে না ছোকরা। আমি আর কেনটন তো রইলাম। পথে আরও অনেক ভাল ভাল লোকের দেখা মিলবে।
হাত দিয়ে আমি মুখ চেপে ধরি। মনটা কেমন শিউরে ওঠে। এমন ভয় করে যে গলা ছেড়ে চেঁচাতে ইচ্ছে হয়। আবার যখন মুখ তুলি, আগুনের আভায় আমাদের মুখ চিকচিক করতে থাকে। কেনটন ও চার্লি অবাক চোখে চেয়ে থাকে আমার দিকে। আমি ফিসফিস করে বলি, ভাবছ বুঝি আমি ভয় পেয়েছি?
তারা মাথা নাড়ে। আবার হাতে মুখ ঢেকে আমি কান্না চাপবার চেষ্টা করি।
এর ঘণ্টাখানেক পরে হ্যামিলটন আসেন। নীল গ্রেটকোট জড়িয়ে তিনি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। আগুনের আভায় তার পাইপের ধোঁয়া লালচে দেখায়।
তোমাদের জন্য অল্প কিছু মাংস এনেছি। একটা কাঠের পাত্র বাড়িয়ে ধরে বলেন। কেনটন হাত বাড়িয়ে নেয়। বলে, আমাদের জন্য আপনি চমৎকার সওয়াল করেছেন। আমরা অকৃতজ্ঞ নই।
আমি দুঃখিত। জবাবে তিনি জানান।
সেনানায়করা আমাদের ছেড়ে দেবে, এ চিন্তা কোন সময় আমরা করিনি।
এখনও তোমাদের বাঁচবার আশা আছে। জেনারেল আর রাতে আমার সঙ্গে কথা বলবেন বলেছেন। বাঁকা চোখে তিনি আমাদের দিকে তাকান! একজন আমার সঙ্গে এস! জেনারেলের প্রাণটা কঠোর নয় তিনি সব বোঝেন।
তুমিই যাও আলেন। কেনটন বলে। চার্লিও সায় দেয়। আমি মাথা ঝাঁকাই।
যাও না। শান্তভাবে আবার বলে কেনটন।
কেনটনের কাঁধে ভর করে আমি উঠে দাঁড়াই। শীর্ণ ভাঁজপরা বুড়িয়ে যাওয়া মুখে সে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আগুনের আভায় তার দাড়ি লালচে দেখায়। চার্লি পাগলের মত মাথা নাড়ে।
বাইরে শান্ত্রী আমাদের থামায়,—এদের দেখাশোনার জন্য আমার উপর আদেশ দেওয়া হয়েছে কর্নেল হ্যামিলটন।
আমি এর জামিন রইলাম। হ্যামিলটন বলেন। অদ্ভুত তার কথা বলার ধরন। যেন তিনি সন্দেহের অতীত। তারপর আবার তিনি হেঁটে চলেন। আমি তার অনুসরণ করি। তার আরদালি আমাদের পেছনে আসে।
পাথুরে বাড়িটির দরজার সামনে তিনি আরদালিটিকে অপেক্ষা করতে বলেন। শান্ত্রীরা তাকে দেখে 'এটেনশন' হয়ে দাঁড়ায়। তিনি ভেতরে ঢুকে যান এবং আমাকে বলেন, ওঁকে ভয় করবার কিছু নেই। অদ্ভুত ধরনের কঠোর লোক, কিন্তু ওকে ভয় করবার কিছু নেই।
যে ঘরে আমাদের বিচার হয়েছে সেই ঘরের দরজায় টোকা মারেন হ্যামিলটন। তার পর ভেতরে ঢুকে যান। ওয়াশিংটন একলা রয়েছেন। টেবিলের পাশে বসে লিখছেন। আমরা ভেতরে ঢোকার পরেও তিনি মুখ তুলে চান না। তাঁর গায়ে পশমী জ্যাকেট, মাথায় ছোট্ট একটা টুপি। টেবিলের উপর খান কয়েক মোম জ্বলছে। বেশ দেখতে পাচ্ছি লেখার

সময় কত আস্তে আস্তে তার হাত নড়ছে।
কে? তিনি জিজ্ঞাসা করেন।
কর্নেল হ্যামিলটন।
ভেতরে এস ছোকরা। দরজাটা বন্ধ করে দাও। হাওয়া আসছে।
হ্যামিলটন বলেন, ধন্যবাদ ইওর একসেলেনসি! আস্তে তিনি দরজাটা বন্ধ করে দেন। আমরা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকি। বেশ বুঝতে পারছি যে হ্যামিলটনের ভয় করছে। নিজের হাতের দিকে চেয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছেন তিনি।
আনমনে লিখে যাচ্ছেন ওয়াশিংটন। চোখ কুঁচকে চেয়ে আছেন চশমার মধ্য দিয়ে। তাঁকে দেখে জ্যাকেট ও টুপি-পরা বৃদ্ধ বলেই মনে হয়। মুখের খাঁজগুলো ছায়ায় ঢাকা। অবশেষে পালকের কলমটা রেখে তিনি আধ হাসিভরা মুখে চোখ তোলেন। হাসি মিলিয়ে যায়। তার জায়গায় ফুটে ওঠে ক্ষুব্ধ কঠোর কাঠিন্য।
এর মানে কি মিঃ হ্যামিলটন? তিনি জিজ্ঞাসা করেন।
আমি ভেবেছি……
সত্যি বলছি, তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ কর্নেল হ্যামিলটন। এই লোকটাকে আমার কাছে নিয়ে আসবার অর্থ কি? কোথায় তোমার অনুমতিপত্র দেখি? সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়ান। আকস্মিক ক্রোধে তার সারা দেহ দৃঢ় হয়ে ওঠে।
কোন অনুমতি পত্র নেই স্যার।
এক্ষুনি নিয়ে যাও ওকে।
আমি যাবার উদ্যোগ করি, কিন্তু হ্যামিলটন যেখানে ছিলেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি মাথা হেঁট করেন। মোলায়েমভাবে বলেন, নিশ্চয়ই নিয়ে যাব ইওর একসেলেনসি। সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার কমিশনও ত্যাগ করতে চাই। এখানে আমার স্থান নেই।
চট করে আমার মনে হয় যে টেবিল উলটে ফেলে ওয়াশিংটন তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়বেন। ক্রোধে তিনি ফেটে পড়বেন বলে মনে হয়। তারপর হঠাৎ ফুটো ব্লাডারের মত তাঁর ক্রোধ চুপসে যায়। অবসন্নের মত ধপ করে চেয়ারে বসে পড়েন এবং শূন্য ক্লান্ত দৃষ্টিতে আমাদের দিকে চেয়ে থাকেন। টেবিলের উপর কনুই রেখে তিনি হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেন।
তোমার কমিশন ত্যাগ করবে? তিনি বলেন। কথাটা তার বিশ্বাস হয়েছে বলে মনে হয় না।
করতে আমি বাধ্য।
তাঁর মুখ ভেঙে পড়ে। চট করে যে মুখের এমন করুণ চেহারা হতে পারে তা এর আগে কোনদিন দেখিনি। অসহায়ের মত হাত প্রসারিত করে বিড়বিড় করে বলেন, শেষে তুমিও! আমার বোঝা উচিত ছিল। স্টার্লি নিজের কেরামতির গপ্প শোনায়, কনওয়ে ষড়যন্ত্র করে, ভারনাম বিদ্রূপ করে আর ওয়েনটা আধ পাগলা। শেষ পর্যন্ত তুমিও ছেড়ে যাবে! হা ভগবান! একলা, আমি একলা। এ সহ্য করা যায় না।
জানি না তিনি অভিনয় করছেন কিনা। যদি অভিনয় হয় তো তাঁকে অতুলনীয় অভিনেতা বলতে হবে। টেবিলের পর হাত ছড়িয়ে সামান্য হাঁ-করে তিনি শূন্য দৃষ্টিতে হ্যামিলটনের

দিকে চেয়ে থাকেন। মুখ কাঁপতে থাকে। ফিসফিস করে বলেন, যাও, তবে চলে যাও! আমায় একলা থাকতে দাও। ভগবান সাক্ষী, আমি একলা—বরাবর নিঃসঙ্গ। ভেবেছিলাম, আমার প্রতি তোমার আস্থা আছে। কিন্তু এখন দেখছি, তুমিও আলাদা নও, কোন বিশিষ্টতা নেই তোমার মধ্যে।

আড়চোখে আমি হ্যামিলটনের দিকে তাকাই। তার মুখেও জেনারেলের মুখের প্রতিচ্ছবি—আধ-বোজা বেগনি চোখ গভীর দুঃখে তেমনি ব্যাথাতুর। হাত খানিকটা সামনে ঝুলিয়ে দিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

চলে যাও! গাঢ়কণ্ঠে ওয়াশিংটন বলেন।

তবু কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকেন হ্যামিলটন; তারপর আস্তে দরজার দিকে পা বাড়ান।

দাঁড়াও! ওয়াশিংটনের মুখ শুকিয়ে যায়। বুড়ো মানুষ বেচারী! ছাড়া ছাড়া ভাবে জিজ্ঞাসা করেন, পদত্যাগ করছ কেন? কেন চাইছ আমাকে ছেড়ে যেতে?

আপনাকে ছেড়ে যেতে আমি চাইনে স্যার। বিশ্বাস করুন…মাথার উপরে ভগবান রয়েছেন… আপনাকে ছেড়ে গেলে আমার বাঁচবার কোন অর্থ হবে না স্যার। আমাদের আদর্শ আর আপনার জন্য ছাড়া আমার বাঁচবার কোন সাধ নেই স্যার।

ওয়াশিংটনের মুখে আশার ঝিলিক খেলে—হ্যামিলটনের জন্য ভালবাসা ও আকুলি ফুটে বেরোয়। তিনি একখানা হাত বাড়িয়ে দেন! বলেন ছেড়ে যেও না!

স্যার, অন্যায়ভাবে একটি জীবনও যদি নেওয়া হয়, ঈর্ষা-দ্বেষের জন্য একজনকেও যদি প্রাণ হারাতে হয় তবে তাতেই আদর্শ কলঙ্কিত হবে। আদর্শ আর বেঁচে নেই। তার জন্য লোকে আর দুঃখবরণ করতে পারছে না। এইখানেই সমস্ত দুঃখবরণের সীমা শেষ, সমস্ত…

ওয়াশিংটন উঠে দাঁড়ান—দড়াম করে ঘুষো মারেন টেবিলের উপর। তাঁর এই ভাবান্তর যেমন আকস্মিক তেমনি প্রচণ্ড। অনেকটা হঠাৎ-মাথা-খারাপ লোকের মত। আমরা ঘাবড়ে যাই—পেছনে সরে আসি। ঘরটা নেহাৎ ছোট ছোট লাগে। টেবিলের ওধার থেকে বেরিয়ে এসে তিনি হাঁপাতে থাকেন। চেঁচিয়ে বলেন, দুঃখবরনের কথা বলছ? হা ভগবান, তুমিও দুঃখ ভোগের কথা শোনাচ্ছ! কি জান তুমি? কতটা দুঃখ সয়েছ? কেউ বিশ্বাস করবে আমাকে? কাউকে বিশ্বাস করতে পারি আমি? সব সময় কোন মানুষকে যদি একলা থাকতে হয়, সবাই যদি তাকে ভয় করে, ঘৃণা করে—কি অবস্থা তার হয় বোঝ! কার কাছে আসে? আমার কাছে কাকুতি জানাতে আসে—কাঁদতে আসে। লোকে উপোস করছে! আজ খাবার ছুঁতে দেখেছ আমাকে? ঘুমোই আমি? বিশ্রাম করি? মরণের আগে পর্যন্ত কোন শান্তি আছে আমার? কোনদিন কি শান্তি পাব? ইংলণ্ডের জেলে গলায় একটা ফাঁস পরা ছাড়া আর কোন ভবিষ্যত আছে আমার? ওরা আমার উচ্চাশার কথা বলে—বলে রাজা ওয়াশিংটনের কথা। হা ঈশ্বর! অস্বীকার করি না। আমি অনুভূতিহীন… বরফের মত শীতল হয়ে সিংহাসনের আশায় আছি। ওই জানালা দিয়ে তাকাও, তাহলেই বরফ-ঢাকা জয় পাহাড়ের মাথায় আমার সিংহাসন দেখতে পাবে। ব্রিটিশ ফৌজের প্রধান সেনাপতি জেনারেল হাউ শপথ নিয়েছে ঐখানে আমাকে ফাঁসি দেবে। কে আমার পাশে থাকবে তখন। কাকে বিশ্বাস করতে পারি আমি? চিরকাল কোন লোক কি একলা চলতে পারে? পারে সবকিছু সইতে…

ক্ষোভের এমনি আকস্মিক প্রকাশের পর অবসন্নের মত সেইখানেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। তার বিরাট চেহারা বড়ই করুণ দেখায়! হাত দুটো অবশ ভাবে দুপাশে ঝুলে পড়েছে। টুপিটা আগেই খসে মেঝেয় পড়েছে। চশমা হাতড়ে তিনি টেবিলের উপর রেখে দেন। টলতে টলতে চেয়ারের পাশ দিয়ে তিনি ঘর পার হয়ে আগুনের দিকে এগিয়ে যান। কাঁপতে কাঁপতে আগুনের তাপে গা গরম করবার চেষ্টা করেন। আমরা যে ঘরের মধ্যেই রয়েছি এ খেয়ালও তাঁর আছে বলে মনে হয় না। হ্যামিলটন বিড়বিড় করে বলেন, আমি খুবই দুঃখিত স্যার!

তবুও আমরা শান্তভাবে সব সয়ে যাব। শান্ত ভাবে বলেন তিনি। হ্যাঁ সবকিছুই সইব আমরা। আবার তিনি নিজেকে সামলে নিয়েছেন। ফিরে এসে চেয়ারে বসে পড়েন। বলেন, আমি দুঃখিত কর্নেল হ্যামিলটন। তোমার কাছে আমার মাফ চাওয়া উচিত। অবশ্য যদি তুমি পদত্যাগ করতে চাও তা সে তোমার নিজের ব্যাপার। আমার কিছু করবার নেই।

আছে স্যার। শুধু একবার বলুন, আপনি আমাকে চান।

ঈশ্বর সাক্ষী, হ্যাঁ নিশ্চয়ই চাই।

আমার কথা কি তাহলে শুনবেন?

হ্যাঁ, বল।

স্যার, এই লোকটির মৃত্যুদণ্ড হয়েছে। ক্যাপ্টেন ম্যাকলেনের এক অনুচরকে হত্যার অভিযোগে এর এবং আর দুজন পলাতকের ফাঁসির হুকুম হয়েছে! এ কথা আপনি জানেন। আপনার সিদ্ধান্তকে তাচ্ছিল্য বা পরিহাস করবার জন্য একে আমি এখানে নিয়ে আসিনি স্যার! আমি এসেছি এদের জন্য আপনার করুণা ভিক্ষা করতে। আমি আপনাকে দেখাতে চাই যে যুদ্ধ, কষ্ট ও দুঃখ একুশ বছরের একটা ছেলেকে কি করেছে। আমি বলছি, ছেলেটি ইতিমধ্যেই তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছে…আর দুজনেও তাই করেছে।

কিন্তু পল্টনে তো দয়ামায়া আবেগের স্থান নেই।

কিন্তু ন্যায় বিচারের আছে।

ওরা তো ওদের অপরাধ স্বীকার করেছে।

কিন্তু স্যার, কাজটা ওরা উত্তেজনার মাথায় করে ফেলেছে…করেছে আত্মরক্ষার জন্য!

আমি তো তোমায় পূর্বেই বলেছি কর্নেল হ্যামিলটন যে অসামরিক আইন রণক্ষেত্রে খাটে না। তুমি নিশ্চয়ই জান ব্রিটিশরাও দলত্যাগীদের ফাঁসি দেয়।

কিন্তু স্যার আমরা তো ব্রিটিশ নই।

নিশ্চয়ই নয়। যদিও আমরা এক শৃংখলাহীন জনতা—পল্টনের প্রহসন। কিন্তু যতদিন একটি লোকও থাকবে, তাকে আমার অধীনে শৃঙ্খলা মেনে থাকতে হবে। তার যদি পোষাক না থাকে এমন কি সে যদি নিরস্ত্রও হয়, তবু তাকে আমার অধীনে থাকতে হবে!

তাহলে একজনকে শাস্তি দিন, শুধু একজনের ফাঁসি হোক। একজনই যথেষ্ট। ম্যাকলেনের দলেরও একজনই মরেছে।

জেনারেল ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকান। বলেন, যে শৃঙ্খলাবোধ ও ন্যায়বিচার তিন বছর পল্টনকে একসাথে রেখেছে, আমি শুধু সেই ন্যায়বিচারই জানি কর্নেল হ্যামিলটন! জানি

আমরা নরকে আছি, আমাদের খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, এও সত্য, কিন্তু এ বড় কঠিন ঠাঁই।
স্যার, এ নরক হলেও আমরা মানুষ। একবার যদি আমরা মনুষ্যত্ব হারাই তো আর সামনে এগোবার বা বাঁচবার কি সার্থকতা থাকে?

মোম পুড়ে আলো কমে আসে। ক্লান্ত পদে আমি দাঁড়িয়ে থাকি—মনে মনে কোন আশা না করবার চেষ্টা করি। চেষ্টা করি পায়ের যন্ত্রণা ভুলে থাকবার। মোমের স্বল্প আলোয় জেনারেলের মুখ ঝাপসা হয়ে আসে। অনেকক্ষণ কেউ কথা বলে না। চেয়ারে নিস্পন্দ হয়ে বসে থাকেন তিনি। যেন দুনিয়ার সব কিছুর বাইরে তিনি···কিছুতেই যেন নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারছেন না দুনিয়ার হাল-চালের সঙ্গে। সোজা স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন জেনারেল—কোন কিছুর দিকেই তার নজর নেই। অবশেষে ছাড়াছাড়াভাবে বলেন,—

জুতোর জন্য আমি কংগ্রেসের কাছে লিখছি কর্নেল হ্যামিলটন! কংগ্রেসের কাছে জুতো মজুত আছে। হাজার জোড়া জুতো আছে। কিন্তু আমি খুব সবিনয়ে একথা লিখতে পারছি না। ও সব আমার আসে না। আমার হয়ে এটা একটু লিখে দেবে?

দেব স্যার।

তখন তিনি আমার দিকে ফিরে তাকান। আমার পা ও মুখের দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। মনে হয়, তিনি যেন আমাকে পাঁচ হাজার লোক থেকে আলাদা করে দিতে চান!

তোমাদের মধ্যে কে গুলি করেছে? তিনি কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করেন।

আমি মাথা ঝাঁকাই। জানি না স্যার।

নিজেদের মধ্যে এটা ঠিক করে নাও। তারপর হ্যামিলটনের দিকে ফিরে বলেন, দুজনের মুক্তির নির্দেশ দিয়ে একটা আদেশনামা লেখ কর্নেল। ওদের দুজনের জন্য চাবুকের শাস্তির ব্যবস্থা করে আবার ওদের নিজ নিজ ব্রিগেডে পাঠিয়ে দাও।

হ্যামিলটনের মুখে কোন কথা যোগায় না। টেবিলের পাশে বসে একটা পালকের কলম তুলে নিয়ে তিনি লিখতে শুরু করলেন! লেখা শেষ করে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করলেন আপনি সই করবেন তো স্যার?

সই করে ওয়াশিংটন পালকের কলমটা ফেলে দেন। মনে হয় যেন আর নিজের মাথার ভার বইতে পারছেন না। হ্যামিলটন বাইরে যাবার দরজার কাছে যান। তিনি দরজা খুলবার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াশিংটন ডাক দেন, ফিরে আসছ তো কর্নেল? আমার এখন ঘুম আসবে না। তুমি ফিরে এলে খানিকটা আলোচনা করব।

নিশ্চয়ই আসব স্যার। এখন আর ধন্যবাদ জানাব না। এখুনি ফিরে আসছি।

আমরা ওর সাথে বেরিয়ে পড়ি। শাস্ত্রীর হেফাজতে আমাকে না দেওয়া অবধি হ্যামিলটন কোন কথা বলেন না। শাস্ত্রীটিকে তিনি কেল্লায় যাবার হুকুম দেন। তারপর বলেন, ভোরের আগে ব্যাপারটা জানবার চেষ্টা কর। এর চাইতে অন্য রকম কিছু হলেই সুখী হতাম।

আমি কথা বলবার চেষ্টা করি, কিন্তু গলা আটকে যায় কোন কথা বেরোয় না। তিনি হাতখানা বাড়িয়ে দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে আমি তার হাত চেপে ধরি। তারপর তিনি দীর্ঘ পা ফেলে চলে যান।

বরফের মধ্য দিয়ে শাস্ত্রীর সঙ্গে হাঁটছি। বেজায় ঠাণ্ডা আর কনকনে বাতাস। আমাদের অদ্ভুত জীবনের কথা ভাবি। বরফ ঠাণ্ডা বাতাসের গা-কামড়ানি অনুভব করছি। শুধু বাঁচার কথা জীবনের কথাই ভাবি—ভুলে যেতে চাই যে আমাদের একজন মারা যাবে। যেভাবে বাড়িতে ফিরে যেতে চেয়েছি, ঠিক তেমনি ভাবে এখন নিজেদের পরিখায় ফিরে যেতে ইচ্ছে হয়।

কেনটন ও চার্লি একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে থাকে। আমাকে দেখতে চায় অন্ধকারের মধ্যে! কি করে যে ওদের সব কথা খুলে বলব, বুঝে উঠতে পারি না। দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে থাকি। অন্ধকারের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে চাই।

কেনটন বলে, এস আলেন, বস।

পায়ের ব্যথায় অসহ্য অস্থির লাগে। আগুনের কুণ্ডটার কাছে গিয়ে বসে পড়ি। ব্যথা অনুভবের মধ্য দিয়া বুঝতে পারি যে বেঁচে আছি। ব্যথার মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব বুঝতে পারি। ব্যথার চাইতে সেইটেই বড় কথা।

কেনটন বলে, তোমার জন্য কিছুটা মাংস রেখে দিয়েছি আলেন। নুন দেওয়া চমৎকার শূয়োরের মাংস। আমরা গরম করে খেয়েছি।

হ্যাঁ বড্ড খিদে পেয়েছে। আমি বলি। মাংসের কথা শুনে মনটা চনমন করে ওঠে। মাংসটুকু নিয়ে গোগ্রাসে খেয়ে ফেলি। কেনটন আমাকে খানিকটা জল খেতে দেয়। একটা লোকের যতটা দরকার তার চাইতে বেশী মাংসই ছিল। মনে হয়, ওরা কম খেয়ে বেশীটা আমার জন্য রেখে দিয়েছে। খাবার সময় ওরা আমার দিকে চেয়ে থাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

বাঃ বেশ ভাল মাংস। আমি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলি। চমৎকার নুন দেওয়া শূয়োরের মাংস।

চার্লি বলে, বোস্টন রাউণ্ড নামে শূয়োরের একরকম মাংস আছে, মুখে দিলে মাখনের মত গলে যায়।

মোহকের লোকেরাও চমৎকার একরকম মাংস তৈরী করে।

আরে বোস্টনের শূয়োরের মাংস ঐসব দেশগাঁয়ের শূয়োরের মাংসের চাইতে অনেক ভাল—এ আমি হলপ করে বলতে পারি। ঐসব পাড়াগাঁয়ের লোকেরা ভাল করে থাকতে খেতে জানে বলে বড়াই করলে আমার হাসি আসে। ধাড়ী ধাড়ী লোক, অথচ নিজের নামটা পর্যন্ত সই করতে জানে না, নিজের চত্বরের বাইরে কিছু খোঁজ রাখে না। বুনো রেডদের সঙ্গে এদের তফাৎ কি ?

আলেন পাড়াগেঁয়ে ছেলে হলেও কিন্তু লেখাপড়া জানে। কেনটন বলে,—লেখাপড়া শেখাটা এমন কিছু ঝামেলার কাজ নয়। কিন্তু আমার বরাবরই লেখাপড়ার উপর একটা ঘেন্না ছিল।

চার্লি হেসে ওঠে। আমি খাওয়া শেষ করে পাত্রটি একপাশে সরিয়ে রাখি। ওরা আমার দিকে তাকায়; তবু কোন প্রশ্ন করে না। ফাঁসির কথা ভুলে যে কি ভাবে এমন করে এখন হাসি-গল্প করতে পারে—ভেবে আমি অবাক হয়ে যাই। আমার কোন কিছু বলতে

সাহস হয় না,—বুঝতে পারি না কি করে সব বলব।
আগুনের কুণ্ড থেকে শিখার রাঙা আভা আমাদের মুখে হরেক রকম ছায়ার সৃষ্টি করছে··· মনে হচ্ছে আগুন ধরেছে কেনটনের দাড়িতে। আমি আমার দাড়ি ও কোঁকড়ান চুলে হাত দিই। আস্তে আস্তে আঙুল দিয়ে আঁচড়াই। চার্লি আমার বাহু স্পর্শ করে। শান্তভাবে বলে, মৃত্যুকে আমরা উপহাস বা উপেক্ষা করতে চাইছি না আলেন, শুধু ভয় তাড়াতে চাইছি।
আলেন, তোমাকে ওখানে পাঠান উচিত হয়নি। কেনটন বলে,—এই ভাবে না খেলিয়ে, কষ্ট না দিয়ে ব্যাটারা ফাঁসি দিয়ে সব চুকিয়ে দিলেই তো পারতো।
হ্যামিলটন আমাদের বাঁচাতে চেয়েছে। আমি বলি,—তার পক্ষে যা করা সম্ভব, সবই করেছে। ওয়াশিংটনের কাছে সে শাস্তি মকুবের আবেদন জানিয়েছিল।
ওয়াশিংটনের মত কঠোর লোকদের আমি দেখতে পারি না। চার্লি বলে।
সত্যিই কঠোর।
অবশ্য আলেন যাবার সময়েও তেমন কোন আশা আমি করিনি।
শেষ পর্যন্ত কি হল আলেন ?
আমাদের তাহলে মরতেই হবে ?
তখন আমি ধীরে ধীরে বলি, একজনকে শুধু মরতে হবে। কে মরবে আমাদেরই ঠিক করতে হবে। বাকী দুজনকে চাবুক মেরে ছেড়ে দেওয়া হবে। কিন্তু একজনের ফাঁসি হবেই।
ওরা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকায়, একজনকে ?
আমি ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারি না। মাথা ঝাঁকিয়ে তীব্র চীৎকার করে উঠি, আমি কিন্তু কিছু করিনি। ভাবছ হয়ত তোমাদের সঙ্গে মরবার সাহস আমার নেই তাই···
আমরা জানি আলেন ! কেনটন বলে,—তোমার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ আলেন ! তার গলায় একটা পূর্ণ স্বস্তির ভাব ফুটে ওঠে। কথা বলবার সময় তার হাসি মুখে ফুটে ওঠে। এ হাসি পরিতৃপ্তির।
চার্লি সন্দেহের গলায় গলায় বলে ওঠে, দুজনকে ছেড়ে দিল কি বলে ? এ কি করে সম্ভব হল আলেন ?
আমি তখন ওদের সব কথা খুলে বলবার চেষ্টা করি। কি কি হয়েছে সব জানাই। বলতে বলতে আমার গলা আটকে যায়, কান্না আসে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকি।
সব ঠিক আছে। কেনটন বলে,—কান্নার কিছু হয়নি আলেন।
না, তোমরা নিশ্চয় ভাবছ, এ আমার কাজ। ভাবছ, আমি শাস্তি থেকে বাদ পড়তে চেয়েছি। শুধু তোমাদের একজন মরবে। ভাবছ, হয়ত ফাঁসিতে মরবার সাহস আমার নেই। তাই রেহাই পাবার জন্য এই সোজা পথ বেছে নিয়েছি। হয়ত বলেছি, তোমাদের দুজনের হয়ে একজন মরবে। নিশ্চয় একথা ভাবছ তোমরা। না হলে অমন করে আমার দিকে চাইছ কেন ? হাঃ ঈশ্বর···
আলেন, আলেন—শান্ত হও !
সত্যি বলছি, আমি ভয় পাইনি।

আলেন, তোমাকে ব্যথা দেবার কোন ইচ্ছাই আমাদের নেই।

তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে ঘৃণা করছ।

আলেন, আমাদের মধ্যে দুজনের প্রাণ বেঁচে যাওয়াতে ভালই হয়েছে। ফাঁসিতে মরা বড় ভয়ানক। এ সম্পর্কে ভাবা বা স্বপ্ন দেখা বড় বিভীষিকাময়।

আমি তখন ক্ষীণকণ্ঠে বলি, তাহলে কে মরবে? কে মরবে আমাদের তিনজনের মধ্যে। আজকেই জানাতে হবে।

তিনজনেই চুপ করে বসে থাকি—পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকি। সহসা চার্লি উঠে দাঁড়ায়, হনহন করে দরজার কাছে গিয়ে কবাটের উপর পাগলের মতো দমাদম ঘুষি মারতে থাকে। তার ঘুষির চোটে দরজা কেঁপে ওঠে। তখন সে কবাটে ঠেস দিয়ে হাঁপাতে থাকে।

হাত ছড়ে যাবে চার্লি, চলে এস। কেনটন অনুনয় করে,—ফিরে এস চার্লি! এখানে চুপ করে বসো।

জাহান্নামে যাক ব্যাটারা! এ কি জানোয়ার নিয়ে খেলছে নাকি? নিজেদের মধ্যে মারামারি বাধাবার চেষ্টা, আমরা কি মানুষ নই যে জানোয়ারের মত দগ্ধে মারবে আমাদের!

চলে এস!

চার্লি ফিসফিস করে বলে, আমিই তোমাদের মধ্যে বয়সে বড়। আমার বয়স ত্রিশ বছর। সে আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। কয়লা প্রায় পুড়ে এসেছে—আগুন নিভুনিভু। সেই স্তিমিত আগুনের আভায় দরজার কাছে দাঁড়ান চার্লিকে একটা অবয়ব হীন কালো ছায়ার মত দেখায়। আমি সেই কালো মূর্তিটির দিকে তাকাই। মানুষের কোন লক্ষণ নেই তার মধ্যে—যেন ভয়ের প্রেতমূর্তি! এক একবার মৃত্যুর শঙ্কায় আঁৎকে উঠছে, আবার সে আতঙ্ক কেটে যাচ্ছে। আমার তখন কিছুদিন আগেকার একজন মোটাসোটা মানুষের কথা মনে পড়ে। ছাপা-খানার কালিমাখা হাতে সে বোস্টনে আমাদের রেজিমেণ্টে যোগ দেয়। ছোট্ট একটি গোঁফ ছিল তার…লাল গাল…মাথায় পালক লাগান কালো টুপি…গায়ে কালো কোট…নীল চোখ। রেজিমেণ্টে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে সে আমাদের ঠাট্টা আর ঘৃণার পাত্র হয়ে পড়ে। শিকারীর সবজে কোট-পরা দেশগাঁয়ের লোক দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যেত। তার সঙ্গে ছিল হাতির হাড়ের কাজ করা একটি সুন্দর বন্দুক। যত্ন করে রাখবার মত ছোটখাটো ভারি সুন্দর বন্দুকটি। পল রিভারির তৈরী একটি কাজ করা নস্যের কৌটোও ছিল সঙ্গে। লেসের কাফ পড়ত লোকটি—চেষ্টা করত ফুলবাবু সাজবার, কিন্তু বাবু না বলে তাকে ট্রল (১) বলাই ভাল। দরজার সামনে দাঁড়ান লোকটির দিকে চেয়ে বার বার আমার সেই মানুষটির চেহারা চোখের উপর ভেসে ওঠে…কালো ছায়ামূর্তিটির মধ্যে খুঁজি সেই বছর কয়েক আগেকার ফুলবাবু মানুষটিকে।

আমার বয়স তিরিশ বছর। আবার বলে চার্লি,…তিনজনের মধ্যে আমিই বড়। তারপর সে আমাদের কাছে ফিরে আসে - ধপ করে মেঝেয় বসে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে থাকে। বেঁটে রোগা হাড় জিরজিরে দাড়িওলা নোংরা পোষাক পরা মানুষ।

১। ফিটফাট পোষাক পরা স্ফূর্তিবাজ বামন। উত্তর ইউরোপের দেশগুলির পৌরাণিক গল্পকথায় বর্ণিত।

আমাদের জন্য তুমি ফাঁসি যাবে, তা হয় না চার্লি ? আমাদের জন্য ফাঁসিতে মরতে কোন ভয় করবে না তো ? কেনটনের কণ্ঠস্বর মোলায়েম ও রহস্যময়। দুনিয়ার পরম বিস্ময় যেন লুকান রয়েছে তার কণ্ঠে।
ফাঁসিকাঠে মরতে ভারি ভয় করে আমার। ভীষণ ভয় হয়। চার্লি অকপটে বলে।
কিন্তু তুমি তো সাহসী লোক চার্লি। কেনটন বলে।
সাহসী হবার মানুষ আলাদা। কোনদিক থেকেই আমি সাহসী নই। ভাবছি আজকে এলি যদি এখানে থাকত তো তার বদলে কোন কমবয়সীকে সে মরতে দিত না।
অদ্ভুত লোক এলি। ভয়ের কোন বালাই নেই।
চার্লির মুখে হাসির ভাব ফুটে উঠতে চায়। ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসিরেখা ফুটে ওঠে—আস্তে আস্তে নড়তে থাকে ঠোঁট দুখানি। এগিয়ে এসে সে আমার হাত ধরে। আমি তার দিকে তাকাতে পারি না। সে আমাকে ধরেই থাকে। বলে, অনেক পথ—জীবনের অনেকটা পথ একসঙ্গে মার্চ করেছি। হা খ্রীস্ট, তিনজনেই আমরা ভাইয়ের মত।
কেনটন বলে, এখন আর কোন ভয় নেই আমার। সঙ্গী জুটবে—ভাল সঙ্গীই পাব। ঘৃণাভরে আমার কাছ থেকে দূরে সরে থাকবে এমন লোক আর নেই। কেউ আর বলবে না, যে-লোক ফাঁসিতে মরে সে আমাদের সঙ্গী হবার যোগ্য নয়।
আমরা লটারি করি না কেন। মরিয়া হয়ে আমি বলি।
না লটারি করার দরকার হবে না।
কেন ? আর ভয় করছে না আমার। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি, আর আমি ভয় পাচ্ছি না। আর কোন ভয় করি না...
এ ভয়ের কথা নয় আলেন। কেনটন শান্ত ভাবে বলে,—বেঁচে থেকে একথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারব না যে আমার বদলে তুমি প্রাণ দিয়েছ। মোহকে ফিরে গিয়ে একথা কিছুতেই বলতে পারব না যে আমাকে বাঁচাবার জন্য একুশ বছরের আলেন হেল ফাঁসিকাঠে প্রাণ দিয়েছে।
কিন্তু আমি ফিরে গিয়ে...
আলেন, আমিই লোকটাকে গুলি করেছি। ভগবান ও যীশুর নামে দিব্যি করে বলছি আমি আমিই মেরেছি তাকে। বন্দুকে তাক করে আমিই ইচ্ছে করে তাকে খুন করেছি। তার মৃত্যুর পাপ আমার—তার রক্তে আমার হাত রঞ্জিত। আমার পাপের জন্য অন্য কোন লোক যদি মৃত্যু বরণ করে, তাহলে আমি কি কোনদিন শান্তি পাব আলেন ?
এই মিথ্যে কথা বলছ তুমি। ফিসফিস করে চার্লি বলে,—আমি তোমার পাশেই ছিলাম ওর দিকে কোন তাক তুমি করনি।
চার্লি তার পকেট থেকে একটা মুদ্রা বার করে। ময়লা একটা শিলিং। সে মুদ্রাটি বার বার উলটাতে থাকে। বলে, তুমি জোয়ান লোক কেনটন। ভালবাসতে বা ঘৃণা করতে তোমার জুড়ি মেলা ভার। আর আমরা তর্ক করব না।
আমি শিলিংটাকে ছুড়ছি। রাজার মুণ্ডু পড়লে তুমি বাঁচবে।
বেশ।
মুদ্রাটি তখন সে এমন ভাবে শূন্যে ছোড়ে যাতে সেটি আগুনের কুণ্ডের ভেতরে পড়ে। কিন্তু

কেনটন মুদ্রাটি শূন্যেই ধরে ফেলে। আঙুলে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত নাড়াচাড়া করে সে ঘরের অন্ধকার কোণে মুদ্রাটি ছুঁড়ে ফেলে দেয়। আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি! কেনটন হাসতে থাকে।
এ তোমার ভারি অন্যায় কেনটন। চার্লি বলে।
বাঁচা-মরার প্রশ্ন নিয়ে মুদ্রাক্ষেপণ ছেলেখেলা। কোন মানুষ মনে মনে যদি মরতে চায় তো···
কিছুতেই তোমাকে আমি মরতে দিতে পারি না।
কেনটন তখন চিন্তিতভাবে ধীরে ধীরে বলে, উত্তরে যাবার পরিকল্পনা আমিই ঠিক করেছি ; আমার পরিকল্পনার জন্য আর কাউকে আমি শাস্তি পেতে দেব না!
এ দৃশ্য আর আমার সহ্য হয় না। হাতে মুখ চেপে আমি ফোঁপাতে শুরু করি। ওরা আমাকে থামায় না। আগুনের কাছ থেকে সরে গিয়ে আমি সটান মেঝেয় শুয়ে পড়ি।
খানিক বাদে কেনটন আমার কাছে আসে। হয়ত ঘণ্টা খানেক কি দুঘণ্টা বাদে। আগুন প্রায় নিভে এসেছে। স্তিমিত আভা বেরুচ্ছে আগুনের কুণ্ড থেকে। হাঁটু ভেঙে বসে কেনটন আমার কাঁধ জড়িয়ে ধরে। ফিসফিস করে ডাকে, আলেন।
আমি সাড়া দিতে পারি না।
আমার কোন ভয় নেই আলেন। আমি শপথ করে বলছি ফাঁসিতে মরতে কোন ভয়, কোন লজ্জা বা অনুশোচনা আমার নেই।
আঃ আমায় একটু একলা থাকতে দাও। আমি চেঁচিয়ে উঠি।
তবু সে কথা বলে চলে। তার কণ্ঠস্বর সহজ ও শান্ত।
আলেন, বছর বারো তেরো আগে একদিন তুমি আমার বিরুদ্ধতা করেছিলে মনে আছে, সেজন্য আমি তোমায় বেদম ঠেঙিয়েছিলাম। তোমার চাইতে আমি তখন মাথায় ফুটখানেক ঢ্যাঙা। সেদিন তুমি হলপ করে বলেছিলে যে মারের কথা তুমি ভুলবে না···
আমি নিশ্চল হয়ে থাকি। কেনটন তখন দূরে সরে যায়। হাতড়ে আমি তাকে খুঁজি এবং তার বাহুবন্ধনে পড়ে থাকি ; আর একটি ছায়া এগিয়ে আসে। চার্লি গ্রীন এসে বসে আমাদের পাশে।
তোমার কাছে ক্ষমা চাইব ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম, স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে আমার বারুদ রাখার শিঙটা দিয়ে যাব তোমায়।
তারপর তিনজনেই এক সাথে বসে থাকি। আর কোন কথা হয় না। গরম হবার জন্য আমরা জড়াজড়ি করে শুয়ে থাকি।

কেনটন বিদায় নেয়। আবছা সকাল। বড় বড় বরফের ফালি ঝরে পড়ছে ধীরে ধীরে। চার্লির মুখ বেদনা কুণ্ঠিত। চোখের জলের ধারায় গালের ময়লা ধুয়ে যায়। কেনটনের দিকে কিছুতেই সে তাকাবে না। একদৃষ্টে মাটির দিকে চেয়ে আছে মাথা হেঁট করে। মাঝে মাঝে হাত মুঠ করছে আর খুলছে। অস্থিরভাবে নড়ে উঠছে কখনও···কাঁপছে।
কেনটনের মুখ থেকে দুশ্চিন্তা লোপ পেয়েছে। হ্যামিলটনের দেওয়া লম্বা মাটির পাইপটি টানছে আর আমাদের দিকে নীলচে ধোঁয়া ছাড়ছে। কেনটন বলে, তুমি একলাও যদি

মোহকে ফিরে যাও আলেন, তাহলেও ওরা টের পাবে না তো যে আমি ফাঁসিতে মরেছি ? কোন দিন টের পাবে না।

লজ্জার জন্য বলছি না আলেন। একে আমি লজ্জার কথা বলে মনে করি না। কিন্তু লোকে একে কলঙ্ক বলে মনে করতে পারে।

আমি মাথা নেড়ে তাকে আশ্বাস দিই...চোখ মুছে হাত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরি। আমরা বেরিয়ে যাই। কেনটন ঘরের মাঝখানে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। হাত নেড়ে সে আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানায়।

হ্যামিলটন এবং কেল্লার কমাণ্ডার বাইরে অপেক্ষা করছে। হ্যামিলটন আমাদের দিকে তাকায় না। চারজন প্রহরী আমাদের পেছনে দাঁড়ায়—একজন ভেরী বাজিয়ে সামনে যায়। আস্তে আস্তে ভেরী বাজতে সুরু করে। ভেরীর উপর বরফের ফালি ঝরে পড়ছে—ছিটকে যাচ্ছে কাঠিতে লেগে। চার্লি আমার পেছনে। কোনমতে পা টেনে টেনে এগোচ্ছে। কেনটনের কাছে ফিরে যাবার, তার সঙ্গে থাকবার একটা পাগলা খেয়াল আমার পেয়ে বসে। চার্লির দিকে তাকাই। তার চোখেও ব্যগ্রতার একই ছবি দেখতে পাই। সে মাথা ঝাঁকাতে থাকে।

ব্যাপটিস্ট রোড দিয়ে মার্চ করে এগোই আমরা। তারপর গ্রাণ্ড প্যারেডে পড়ে চাবকাবার খুঁটোর দিকে যাই। আরও জোরে বরফ পড়ছে এখন। তুষারপাতের মধ্যে পেনসিলভানিয়ার সৈনিকদের ছায়ার মত দেখায়। মাথা হেঁট করে তারা মার্চ করে যাচ্ছে আর সার বেঁধে দাঁড়াচ্ছে।

তুষারপাতকে গালি পাড়ছে তারা—গালাগালি দিচ্ছে আমাদের নাম ধরে।

এমনি দিন কেন বেছে নিলি বেজন্মা ভুত যত! চীৎকার করে বলে তারা,—এমন নচ্ছার হিমশীতল দিনে কাউকে বাইরে আনতে আছে ?

তারা আমাদের ঘিরে দাঁড়ায় কিন্তু খুব বেশী উৎসাহী বলে মনে হয় না তাদের। শীত ও বরফের জন্যই সবাই অস্থির! কাঁপছে হিহি করে। গায়ের সাথে লাগিয়ে বন্দুক ধরে আছে ...এক হাত বগলে দিয়ে আছে গরম হবার আশায়। বাতাসের ঝাপটা এড়াবার জন্য তারা মাথা হেঁট করে আছে। সৈনিকের চেহারা এদের নয়, এমনকি মানুষের মতো ও দেখায় না এদের! আমি চোখ মেলে এলিকে খুঁজি। কিন্তু ছেঁড়া জামা-কাপড় পরা দাড়িওলা লোকের কি অভাব আছে ? সবাইকেই প্রায় এক রকম দেখায়। বরফের ঘুর্নিপাকে হারিয়ে যায় তাদের পরিচয়।

ঘোড়ায় চড়ে সেনানীরা এগিয়ে আসে। উবু হয়ে পাশাপাশি ছুটছে। সামনে পেছনে ছুটা-ছুটি করে তারা সৈনিকদের সার বেঁধে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে। আঁটসাট ভাবে ক্লোক জড়িয়ে ঘোড়ার পিঠে বসে আছেন ওয়েন। ঝুরঝুর করে বরফ পড়ছে তার সারা গায়ে, তার বাহনের উপর।

সহসা জোরসে ভেরী বেজে ওঠে। তারপর আস্তে আস্তে বাজনার শব্দ মিলিয়ে যায়। তখন শুধু লোকজনের চাপা কথাবার্তাতে নীরবতা ভাঙে। প্যারেডের মাঠ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। বরফ-ঢাকা বরফের দেয়াল দিয়ে ঘেরা বিস্তীর্ণ সমতল মাঠ। একটি লোক জোরে চীৎকার করে বলছে: খালি পিঠে বিশ ঘা করে চাবুক মারতে হবে, বেইজ্জতির জন্য...।

চার্লি আমার খানিকটা আগে। শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বার বার মাথা ঝাঁকাচ্ছে সে। কেনটন রয়েছে কয়েদখানায়—একলা। নিঃসঙ্গতার মধ্যে ডুবে আছে বেচারী। আবার আস্তে আস্তে ভেরী বেজে ওঠে। এ যেন ভিখারীদের বল নাচের আসর—নাচ দেখাবে ভিখারীরা। আমি যেন নাচছি বেসের সঙ্গে। বরফের পর্দার ওধারে মস্ত বড় একটি দল রয়েছে যেন। ঐ তো বেস বসে আছে তার স্বামীর সঙ্গে। সে কি আমার ভালবেসেছে, না ভালবেসেছে তার স্বামীকে? এ কি কেনটনের ভালবাসার মত? পুরুষের ভালবাসা না নারীর ভালবাসা? আমাদের সব জামা-কাপড় খুলে ফেলে! আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। শীত ও ব্যথার ভয়ে প্রাণ শিউরে ওঠে। এই একই ভয়ে কেনটন মৃত্যু বরণ করছে। কেনটনের জায়গায় যদি আমি হতাম?

চার্লিকে লক্ষ্য করছি: খোসার মত তার ছেঁড়া জামা খুলে ফেলা হল। বোস্টনের নাদুসনুদুস ভুড়িওয়ালা লোক ছিল চার্লি। গোলগাল মোটাসোটা চেহারা। আর পাড়াগেঁয়ে চাষাড়ে লোক নিয়ে গড়া রেজিমেন্টের সৈনিকদের তামাসার জিনিস ছিল তার চেহারা আর সাজ-পোষাক। শিকারীর সবজে শার্টপরা লম্বা লম্বা লোক বেরিয়ে আসছে মোহক থেকে। নিজের হাতে-বোনা কাপড় দিয়ে শার্ট সেলাই করছেন মা, আর আমাকে নিষেধ করছেন যেতে। আবাদ হয়ে গেছে। তাঁকে বলছিলাম আসছে শীতেই ফিরে আসব। লড়াই খতম হয়ে যাবে। গোটা দেশ সশস্ত্র বিদ্রোহ করবে। তাহলেই খতম হয়ে যাবে লড়াই। চার পাঁচ মাসের ব্যাপার। বড়জোর মাস দশেক লাগতে পারে।

ওরা চার্লির পিঠ আলগা করে। আমার পিঠও খোলা হয়। প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় কাঁপতে শুরু করি। গা কাঁটা দিয়ে ওঠে, কুঁকড়ে যাই। মনে হয়, রক্ত জমাট বেঁধে আসছে।

চাবুকে শরীর গরম হবে···

চার্লির মাংসের মধ্য দিয়ে হাড় ফুটে বেরিয়েছে। কুঁকরানো চামড়ায় মোড়া হাড়। গায়ে সারা শীতের জমাট ময়লা। কিন্তু বরফে গা ধুয়ে যাবে। দাঁতে দাঁত চেপে আমি ঠোঁট কামড়ে ধরি। চামড়ার উপর বরফ পড়ছে, বরফ গলছে। ভেজা জায়গায় বাতাস লাগতেই ছুরি দিয়ে কাটছে বলে মনে হয়।

আমাদের পাশাপাশি দুটো খোঁটায় শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হল। খোঁটার মাথায় এক একটি লোহার আংটা ঝুলান। হাত বেঁধে তার সঙ্গে লটকে দেয় আমাদের। চার্লির দেহটা চামড়া ছাড়ান মুরগীর মত দেখাচ্ছে। বেদম হাসি আসে আমার। বড় শীতের ভয় কেনটনের! সে এখনো কয়েদখানাতেই আছে।

প্রতিকষ্টে পেছন ফিরে আমি সৈনিকদের মুখ দেখতে চেষ্টা করি। জামা কাপড় পরে ওরা বেশ গরমেই আছে। গরম···

পয়লা চাবুক পড়ে। চার্লি পা মোচড়ায়। আমার মনে হয় যেন চামড়ার উপর দিয়ে গরম ছুরি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তেমন যন্ত্রণা বোধ করি না, ব্যাথায় সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসে। শীতের তুলনায় এ যন্ত্রণা কিছুই নয়। শীত আমাকে ঘিরে এমন প্রাচীর সৃষ্টি করেছে যে তার মধ্য দিয়ে কিছুই প্রবেশ করতে পারে না। বেস যদি এখন আমার পাশে শুতো তাহলে তার উত্তাপে গা বেশ গরম হত। বেস আস্তানায় আছে। না ও তো মারা গেছে। এখন আমি কেনটনের সঙ্গিনীকে নিয়ে নিতে পারি। কেনটনও মরে গেছে বল্লেই হয়। আস্তানায় ফিরে

কেনটনের সঙ্গিনীকে দিয়ে শরীর তাতাব।
আবার আর একটা—তৃতীয়—চতুর্থ। তাজ্জব হয়ে আমি চার্লি'র পিঠের রক্তাক্ত দাগগুলোর দিকে তাকাই। এত বেশী ঠাণ্ডা যে রক্ত ঝরছে না।
আমার পিঠেও অমনি দাগ পড়েছে নাকি? খালি পিঠের মাঝে মাঝে লাল দাগ। চাবুকের চতুর্থ ঘায়ে চার্লি'র মুখ থেকে একটা অস্ফুট আর্তনাদ বেরোয়। জানোয়ারের মত চাপা একটা গোঙানি। বাঁধা হাত মোচড়াতে থাকে সে। পঞ্চম ঘায়ে পিঠের ময়লায় উপর দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। পিঠের ময়লা ধুয়ে যাবে রক্তে।
নিজের পিঠেও প্রচণ্ড যন্ত্রণা বোধ করি। তীব্র জ্বালাময় বেদনার অনুভূতি। আমার চারি-দিকের শীতের প্রাচীর ভেঙে গেছে। আগুনের মত পুড়ে যাচ্ছে গা। জ্বলুনি ও শীত একই সঙ্গে। আমার আর্তনাদ ভিন্নলোকের আর্তনাদের মত মনে হয়। এ যেন আমার নিজের কণ্ঠের আর্তনাদ নয়। আর চাবুকের ঘা গুনতে পারি না। অবশ হয়ে আসে চেতনা।
হয়ত অষ্টম কি দশম ঘা হবে! চার্লি'র পিঠের মাংস আর মানুষের মাংসের মত দেখায় না। ওর শরীরটা ঝুলে পড়েছে। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি কি? চোখের উপর একটি মোচড়ান মূর্তি ভাসছে। না হয় কিছুই দেখছি না। পালাতে চেয়েছিলাম আমরা...রওনা হয়েছিলাম সুদূর মোহক উপত্যকার দিকে…তিনজনে একসঙ্গে বরফের উপর দিয়ে চলেছি, ঘরবাড়িতে ফিরে যাব। চতুর্থ সঙ্গী বেস। মেয়ে হলেও পাকা হাঁটিয়ে। মেয়েদের সহ্য শক্তি ধরিত্রীর শক্তির মত। বেস আমায় যেন আঁকড়ে ধরেছে কেঁদে বলেছে, কি করেছি আমরা? দোহাই ভগবানের বল না আলেন কি করেছি আমরা?
হঠাৎ বুঝতে পারি, এ চার্লি'র কণ্ঠস্বর। বুঝতে পারি, শুনবার ও বুঝবার মত বোধশক্তি তখনও লোপ পায়নি, জ্ঞানহারা হইনি।
ততক্ষণে পনেরো ঘা পড়েছে। না বেশী? মনে হয় অনেক বেশী। বিশ তিরিশ ঘা বোধহয় দেবে! এখন আর ব্যথা অনুভবের শক্তি নেই। পিঠে হাতুড়ির ঘা পড়ছে তার ফুসফুসে নিশ্বাস টানার সাথে সাথে চাপা তীব্র বেদনা অনুভব করছি। তবু পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে আছি। চার্লি অজ্ঞান হয়ে ঝুলে রয়েছে। আর কোন ব্যথা বোধই তার নেই। মুক্ত সে।
আমি তাকে বলব, টেবিলের চারপাশে বসা সেনানীরা একযোগে এই ন্যায়দণ্ডের ব্যবস্থা করেছে। বড় মুখওলা মস্ত একটা লোক পল্টনের কথা বলে, শৃঙ্খলার কথা বলে। পরিখায় বসে সৈনিকেরা আলোচনা করে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্য নিয়ে। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে জুয়া খেলছেন তিনি। তাছাড়া আর কোন উপায় নেই তার। বড় ঝুঁকি নিয়ে খেলছেন বলেই তাঁকে ফাঁসে গলা দিতে হয়েছে। হাজার হাজার মাইল জোড়া বন-কান্তার ভরা বিশাল রাজ্য গড়া হবে। জেকব জানে। বার বার সেকথা বলেছে আমাদের। নাইট ক্যাপ পরে টেবিলের পাশে বসে আছেন ওয়াশিংটন। লোকটা কি হ্যামিলটনকে ভালবাসে? কে এই হ্যামিলটন?—মেয়েদের মত বেগনি টানাটানা চোখ কেন তার?
গান লেখার মত কথা বটে। বাংকার পাহাড়ে আমরা ভড়কে গিয়েছিলাম কিন্তু মুক্তির কথা বলে সাহস সঞ্চয় করি। সব সময় মুক্তির কথা। ব্রিটিশরা এগিয়ে আসে…টকটকে লাল কোটপরাদলে দলে লোক আসে মার্চ করে। ভেরী বাজিয়েরা ইয়াংকি ডুডল গানের সুর বাজায়: টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে ইয়াংকি বাবু গেলেন লণ্ডনে। ঢেউয়ের মত এগিয়ে

আসে তারা। বিউগল বাজায় 'হুটস্টাফ' গানের সুর। ফৌজদারদের খোলা তরোয়াল রোদে ঝিকমিকিয়ে ওঠে। মাস্কেট ফেলে দিয়ে পালিয়ে যাব বোস্টনে···লুকিয়ে থাকব চার্লি'র ঘরে। বুড়ো পুটনাম বলেন, ফায়ার! বেজন্মা লাল ব্যাটাদের আচ্ছা করে লাগাও। তাহলেই স্বাধীন হব—মুক্ত হব। হঠাৎ সম্বিত ফেরে···
জোরালো গলায় কে যেন বলে ওঠে, বিশ! এবার বাঁধন কেটে দাও।
চার্লি'কে আগে খোলা হয়। বরফের উপর নেতিয়ে পড়ে সে—একদলা মাংস যেন। সারা পিঠে কাটা ছেঁড়ার রক্তাক্ত ক্ষত···রক্ত ঝরছে অনবরত। বরফের উপর পড়ে রয়েছে তো পড়েই আছে...একদম নড়াচড়া করছে না। আমি কিন্তু খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। হা ভগবান, কি শক্তি আমার। ঠিক খাড়া হয়ে আছি। হাত নাড়াচাড়া করে আমি হাত দুখানা দুপাশে ছড়িয়ে দিই। এলি আমার দিকে তাকায়। এই কাটা ছেঁড়া রক্তাক্ত অবস্থাতেও ঠিক মাথা খাড়া করে দাঁড়িয়ে আছি। আমার হিম্মত নেই?
ব্রিগেডস্—এটেনশন!
তখনও আমি হাত নাড়াচাড়া করছি।
ব্রিগেডস্—মার্চ!
এক পা দু পা করে আমি চার্লি'র দিকে যাই! তার উপর উবু হয়ে দেখি বরফ রক্তে লাল হয়ে গেছে। ডাকি—চার্লি!
কোন সাড়া নেই।
চার্লি আমাদের সাজা হয়ে গেছে। ওঠো!
চার্লি ওঠো!
আবার ডাকি—হা যীশু খ্রীস্ট! কোন শব্দ নেই। বরফের উপর পড়ে আছে।
এলি আমার দিকে এগিয়ে আসে। বুড়ো মানুষ এলি। এমন ব্যথাতুর মুখ এর আগে কোনদিন দেখিনি। তার দিকে ফিরে ডাকি, এলি!
সে আমার জামা কাপড় পরিয়ে দেয়। ছেঁড়া জামা কাপড় এক একটা করে কুড়িয়ে গায়ে পরিয়ে দেয় সে।
আমায় ঠাণ্ডা লাগছে না এলি।
সে আমায় কোট পরতে সাহায্য করে। তারপর সে এগিয়ে যায় চার্লি'র দিকে। আমি তার পেছু পেছু যাইনা। যেখানে আছি সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকি। উৎসুকদৃষ্টিতে চারদিকে তাকাই। কিছু লোকজন জমেছে—লক্ষ্য করছে আমাদের। ফৌজদাররা তাদের তাড়া করে। দুচারটে পলাতক যদি বরফের উপর মরে থাকে তো কচু হবে। ঘোড়া ছুটিয়ে ফৌজদার এলির কাছে আসে। এলি চোখ তুলে তাকায়। ফৌজদারটির মুখের কথা মুখেই রয়ে যায়। আমি তখন এলির দিকে এগোই।
ওকে ধরে নিয়ে যেতে হবে। এলি বলে।
চার্লি আমার দিকে তাকায় এবং হাসবার চেষ্টা করে। আমি এবং এলি দুজনে দুইহাত ধরে তাকে দাঁড় করাই।
কেনটনের বদলে আমারই থাকা উচিত ছিল। ফিসফিস করে বলে চার্লি।
আস্তানায় ফিরবার পথের যেন শেষ নেই। গুটিগুটি পা ফেলে চলেছি আমরা। আমাদের

সামনে ঝরে-পড়া বরফের প্রাচীরের ওধারে সৈন্যদল অদৃশ্য হয়ে যায়। পা টেনে টেনে চলেছি আমরা ; কিন্তু এ তুষার-প্রাচীরের যেন শেষ নেই। সব সময় একটা না একটা সামনে রয়েছে।
চার্লি'কে বয়ে নিতে হচ্ছে। আমাদের উপর ভর করে সে কোনমতে খুঁড়িয়ে চলছে। কয়েক পা এগিয়েই জিরোবার জন্য থামতে হয়।
আবার ভয় হচ্ছে, ঠাণ্ডা লেগেই শেষে মারা না যায়।
আমরা পাহাড়ে চড়ি। পেনসিলভানিয়ার জনকয়েক লোক ছিল সেখানে। তারা আমাদের সাহায্য করে। অবাক হয়ে তারা আমার দিকে চেয়ে থাকে। সত্যিই তো, এখনও আমি যে হাঁটা-চলা করতে পারছি, কথা বলছি—এ আশ্চর্যের ব্যাপার বই কি !
চাবুক খেয়ে হাঁটা-চলা করতে পারে এমন লোক ক্বচিৎ মেলে। ওদের একজন প্রশংসা করে বলে।
সত্যি, এমন জোয়ান কদাচিৎ মেলে।
আজকের এই বেজায় ঠাণ্ডা দিনে চাবুক মারল ! অবাক কাণ্ড !
ওরা ধরাধরি করে চার্লি'কে পরিখায় নিয়ে যায় এবং একটা বাঙ্কের পর শুইয়ে দেয়। এলি ঢোকে। আমি তার পেছু পেছু আসি। আমি খুব কাহিল হইনি। জেকব এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমার দিকে তাকায় না। দুটি মেয়ে এখনও আছে। স্মিথ কুঁজো হয়ে বসে আছে। সে শুয়ে আছে একটা বাঙ্কে। মনে হচ্ছে কারা যেন তার মুখে এক কুৎসিত মুখোস পরিয়ে দিয়েছে। হেনরি লেনকে দেখছি না। মারা গেছে বোধহয় !
পেনসিলভানিয়ানদের একজন বলে, সুন্দরপনা যে ছেলেটি হরিণ মেরেছিল সে কোথায় ?
আমি হাসতে শুরু করি। সহসা শীতে গা কেঁপে ওঠে টলতে টলতে আগুনের কাছে গিয়ে গুটিসুটি মেরে বসে পড়ি। শরীরের সামনের দিকটা শীতে কাঁপছে কিন্তু পিঠ জ্বলে যাচ্ছে বেদনায়।
কেনটন কোথায় ? মেয়েদের একজন জিজ্ঞাসা করে।
হামাগুড়ি দিয়ে একটা বাঙ্কে উঠে দু'হাতে মুখ চেপে আমি কাঁদতে শুরু করি। এলি আমার কাছে আসে। ঝুঁকে বলে, এখুনি আমি ডাক্তার নিয়ে আসছি আলেন।
তাতে কি হবে ?
এখুনি নিয়ে আসছি।
যন্ত্রণায় আমি গড়াগড়ি দিতে থাকি। কাঠের বিছানায় পা দাপাদাপি করে আঙুল থেতলে-ছড়ে যায় ! একটি মেয়ে আমায় এক বাটি জল এনে দেয়। বলে—এই নাও, খাও।
এক নিঃশ্বাসে জলটা খেয়ে ফেলি। ঘুমোবার চেষ্টা করি, ভুলে থাকবার চেষ্টা করি, কিন্তু কোন মতেই স্বস্তি পাই না। বেদনার জ্বালাও কমে না কিছুতেই। তখন ফিসফিস করে ডাকি, এলি !
সে বাইরে গেছে !
জেকব…
আমি ঘাড় তুলে তাকাই। আমরা ঘরে ঢুকবার সময় তাকে যেখানে দাঁড়ান দেখেছি

সেইখানেই সে দাঁড়িয়ে আছে।
জেকব, অনেক সাজা পেয়েছি এখনও ঘৃণা করবে আমাদের ?
তবু সে নড়ে না বা তার মুখে কোন পরিবর্তন হয়না।
আমায় ক্ষমা কর জেকব। কেনটনকে প্রাণ দিতে হয়েছে।
আমরা যুদ্ধরত জাতি! ঠিক সাজাই হয়েছে···
আমি ককিয়ে উঠি···দুহাতে মুখ চেপে ডুকরে কাঁদতে থাকি।
তারপর অনেকক্ষণ কেটে যায়। হয়ত সময় বেশী না হলেও যন্ত্রণার জন্য দীর্ঘ বলে মনে হয়। এলি ডাক্তার নিয়ে ফিরে আসে। নিশ্চয়ই আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন হুঁস হয়, দেখি ওরা আমার জামা কাপড় খুলছে। ডাক্তার বলছে, সভ্য—এই তো আমাদের সভ্যতা! এই জন্যই তো যুদ্ধ করছি; পিঠটার দিকে তাকাও!
ওরা দল ছেড়ে পালিয়েছিল। জেকব বলে।
পলাতক! এখানে কোন সুস্থ মস্তিষ্কের লোক থাকতে চায়? আমাদের কারও মাথা ঠিক আছে? আটশো লোক আমার হাসপাতালে কসাইখানার মাংসের মত পাঁজা করা আছে। উলঙ্গ—শীতে অসাড়—ক্ষুধার্ত। অক্লেশে আমি হাত পা কেটে ফেলছি। আমি তো ডাক্তার নই—কসাই—পরামাণিক—হাতুড়ে! কোন ডাক্তার নেই এখানে। মিথ্যে···সব মিথ্যে··· বানান কথা। কিছু জানিনে আমি। শুধু রক্ত ঝরাই···অসাড় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলি। তেমন মরছেও। পিঁপড়ের মত মরছে। মানুষ যদি পিঁপড়ের মত, বুনো জানোয়ারের মত মরেই গেল তো কি হবে তোমার আদর্শ দিয়ে? আমার অবস্থাও আর দশজনের মত। অজ্ঞানের রাজ্যে বসবাস করছি আমরা। যারা মরছে, মরতে দাও। আমি বাঁচাবার চেষ্টা করি না তো। মরে গেলে বেঁচে যাবে!
গরম জল দিয়ে সে আমার পিঠ ধুয়ে দেয় এবং তারপর ঘষে ঘষে চর্বির মত একটা মলম মাখিয়ে দেয়।
ঠিক হয়ে যাবে তো। উৎকণ্ঠিত এলি জিজ্ঞাসা করে।
এটা জোয়ান আছে। ওঃ, একটা জোয়ান লোক যে কত সহ্য করতে পারে। বাকী আর একজনের কথা বলতে পারি না। দেখা যাক!
ঘাড় বাঁকিয়ে দেখি, ওরা চার্লি'র দিকে যাচ্ছে। সবল পাকা হাতে কাজ করে যায় ডাক্তার। ঐ হাত দুটোই এখনও একই রকম আছে! বাকী আর সবই বদলে গেছে। আগে যখন তখন তাকে দেখেছি তার চাইতে অনেক বুড়িয়ে গেছে। তেমন ফিটফাট ভাবও নেই। দাড়িও কামায়নি।
সেরে উঠবে তো?
কি করে বলব? আমি কি ভগবান যে জীবন দেব? না, আমি বলতে পারি না। ডাক্তাররা ভাঁওতা দেয়। কেউ কিচ্ছু জানে না! তাতে অবিশ্যি কিছুই এসে যায় না। মা বসুন্ধরার বুকে অঢেল জায়গা আছে—সবাইর জায়গা হবে। হাঁ, লাপসি ছাড়া আর কিছু খেতে দিও না। জ্বর আছে।
ধন্যবাদ। এলি বলে।
ধন্যবাদ দিও না। সে-ই ভাল। আমি শিখছি। মানুষের গোপন রহস্য শিখছি। যন্ত্রনা

··শুধু যন্ত্রনা। আটশো লোক রয়েছে একখানা কাঠের ঘরে। যখনই সেখানে যাই, আমি ভগবান হলে তারা খুশি হয়। হা খ্রীস্ট, তোমাদের দশা দেখে দেখে আর ভাল লাগে না।
তারপর তিনি বেরিয়ে যান। আমি এলিকে ডাকি।
আর ছটফট কর না আলেন। ঘুমোবার চেষ্টা কর। সে প্রবোধ দেয়।
আমাকে বলতেই হবে এলি।
বেশ তো। কিছু বলতে হয় তো পরে বল।
না—এখুনি। কেনটন সম্বন্ধে। ওরা বলে যে দুজনকে ছেড়ে দেবে কিন্তু ম্যাকলেনের সঙ্গীকে মারবার জন্য একজনকে মরতে হবে। কেনটন নিজের ইচ্ছায় মরতে রাজী হয়। আমি এলির কোট টেনে ধরি।—আমার ভয় হয়েছিল। কিন্তু এর জন্য আমিই দায়ী··· মেয়েটিকে সঙ্গে নেবার জন্যই আমরা ধরা পড়েছি।
এলি বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকায়। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, কেনটন যদি চেয়ে থাকে তো সে দায়িত্ব তার। মানুষের জীবন তার নিজস্ব ব্যাপার।
ফাঁসির বড় ভয় কেনটনের...বেদম ভয়। ফাঁসিতে মরবার কোন ইচ্ছাটাই তার ছিল না।
তুমি যথেষ্ট ব্যথা পেয়েছ আলেন।
না···
এখন ঘুমোও।
না, সৈনিকেরা যখন কেনটনের ফাঁসি দেখতে যাবে আমাকে সেখানে থাকতেই হবে। বল এলি, আমায় ডেকে তুলবে তো ? কথা দাও।
তুলব আলেন।
আমাকে ঘৃণা কর না তো এলি ?
না।
সৈনিকেরা যখন যাবে···
অন্ধকারের গর্ভে তলিয়ে যাই। পা পিছলে পড়ে যাই যেন। ঘুমোচ্ছি আর জাগছি। যখন সৈনিকেরা মার্চ করে যাবে...দেখতে যাবে একটা মানুষের অপমান···
স্বপ্নের ঘোর অতীতে ফিরে যাই। ঢেউয়ের দোলায় এক একবার অনেকটা পেছনে হটে যাই আবার এগিয়ে আসি সামনে। বেস একবার মরছে আবার বেঁচে উঠছে···একবার কাছে আসে আবার দূরে সরে যায়। ফিসফিস করে কানে কানে বলে তার মৃত্যু রহস্য। কেন মরেছি আলেন ? কেন মরেছি বলব ? সুশ্রী সুন্দর মানুষ মরে। মানুষ কেন মরে আলেন ? এ যুদ্ধের আসল রূপ কি ? কেন এই যুদ্ধ ? গরীবরা যাতে বড়লোকদের হটিয়ে দিতে পারে তার জন্য ? না বড়লোকরা যাতে গরীবদের ধ্বংস করতে পারে তার জন্য ? কিসের জন্য আলেন ? যে স্বাধীনতায় কোন লোক স্বাধীন হবে না তার জন্য ? বলনা আলেন, কেন এই যুদ্ধ ?
বেস চলে যায়। আমি জেগে উঠি। দেখি, আগুন জ্বলছে আর জেকব সে আগুনে কাঠ দিচ্ছে। স্বপ্ন বিলাসী জেকব। স্বপ্ন বিলাসীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সাদৃশ্য থাকে না। কি স্বপ্ন আছে জর্জ ওয়াশিংটনের ? সিংহাসনের স্বপ্ন ? রাজমুকুট পরা ওই ব্যথিত বড়

মুখখানা কল্পনা করবার চেষ্টা করি। সিংহাসনের স্বপ্ন তাঁর নেই। লোকটা হাতড়াচ্ছে। জেকবের মত লোক বনভূমি চায়। বনবাদাড়ের সন্ধানী সে : বনকান্তারে নতুন দেশ গড়ে তুলবে। একটি মাত্র লক্ষ্য তার—ব্রিটিশদের হটাও মানুষ মরে মরুক ! যতদিন লক্ষ্য বেঁচে থাকবে কিছু এসে যায় না তাতে ? শেষ ইংরেজটিকে পর্যন্ত হটাও। এই বিশাল বন-কান্তার নিজেদের দখলে নিয়ে এস। বেসের মত যত মেয়ে আছে জঙ্গলে তাড়িয়ে দাও। বুনো অসভ্যেরাই ওদের সাবাড় করে দেবে। সব বেটিকে তাড়িয়ে দাও।
আবার ঘুমের দেশে ভেসে যাই। স্বপ্নে দেখি, বেস যেন আমার সঙ্গে রয়েছে। কিন্তু এবার বুঝতে পারি যে মৃত্যুর রহস্যময় ঘোমটার ওধারে রয়েছে সে···রয়েছে মৃত্যু লোকের সেই অগণিতের দলে যারা জানে কেন আমরা সংগ্রাম করছি, কেনই-বা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি আর কি পরিণাম এই সংগ্রাম ও দুঃখ-বরণের। বেস আর আমাকে কোন প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করছে না। ভাবছে কেনটনের কথা। কেনটন জেগে ওঠে। মৃত্যুলোকে যারা পাড়ি দিয়েছে সেই অগণিতের দলে আর একজন বাড়ে।
স্বপ্নের পট বদলে যায়। এবার স্বপ্ন দেখি জলদস্যুর···চোখের সামনে ভেসে ওঠে মাসাচুসেট্‌সের লোকজন। সমুদ্রবক্ষে নিজেদের জাহাজের একছত্র আধিপত্য চায় তারা···তাই এক যুদ্ধ বাধিয়েছে। ভার্জিনিয়ার প্লাণ্টাররাও আছে। তারা উঠে পড়ে লেগেছে ইংরেজের মূল্যমানের চাইতে চড়া দাম আদায়ের জন্য। ফার ব্যবসায়ীরা চাইছে বিরাট ইংরেজ কোম্পানীর ধ্বংস। কিন্তু আমরা কৃষকেরা এসেছি কেন ? আমরা কেন প্রাণ দিচ্ছি··· কেনই বা নিজেদের জানোয়ার করে তুলছি ? ঐ সব স্বার্থের সঙ্গে কি সম্পর্ক আমাদের ? চাষাভূষা লোক আমরা। যতদিন আবাদ করতে পারব···যতদিন মাটির বুকে ফসল ফলাতে পারব, ততদিন আমাদের শান্তির ব্যাঘাত হবে না। কিন্তু ইহুদিটি এসেছিল কোন আকর্ষণে ?
আবার ঘুমিয়ে পড়ি। ভাঙা ভাঙা ঘুম হয়। জীবন্ত ও মরা মানুষের মুখের মিছিল বারে বারে ঘুম ভেঙে দেয়। গোটা রাত যেন বিকারের ঘোরে কাটে।
পরদিন সৈন্যদল মার্চ করে বেরিয়ে যায়। যাচ্ছে কেনটনের ফাঁসি দেখতে। তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে। গোটা মাঠে বরফের আস্তরণ। স্থানে স্থানে এক হাত পুরু বরফ জমেছে। তুষারের বুকে সোনালী রোদ ঝিকমিক করছে···এই পাহাড়ের বুকে সৃষ্টি করেছে অদ্ভুত এক সৌন্দর্যের মায়ালোক। আমাদের এই ছাউনির চারিদিকের গড়ানে গ্রামাঞ্চল বরফের সাদা আস্তরণে ঢাকা।
সহসা প্যারেডের জন্য জমায়েৎ হবার হুকুম আসে। আমরা জানি আসল উদ্দেশ্য কি। চার্লি গ্রীন তার বাঙ্কে শুয়ে আছে। তার মুখে চোখে বেদনা ও জ্বরের ছাপ। আমি তার কাছে যেতেই সে বলে, তুমি প্যারেডে যেও আলেন। তাকে লক্ষ্য কর আর সম্মান দেখিও।
নিশ্চয় সম্মান দেখাব।
সে তোমাকে ছোট করতে চায়নি আলেন। ভালবেসেই এ কাজ করেছে।
জানি। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয় যে পরের জন্য আত্মবলি দেবার হিম্মত আমার হয়নি।
এখন ভাবছি, আমি থেকে গেলেই ভাল হত আলেন। মনে হচ্ছে আর বিছানা ছেড়ে

উঠতে পারব না। কেনটন বাঁচত। বেশ জোয়ান লোক সে। এই চাবুক সহ্য করে অনায়াসেই সে বাঁচতে পারত।
তুমিও ভাল হয়ে উঠবে, চার্লি।
ওরা যদি চোখ খুলে রাখে তো তায় চোখেচোখে তাকাবার চেষ্টা কর।
নিশ্চয় করব।
আস্তে আস্তে আমি পরিখা থেকে বেরিয়ে যাই। নড়াচড়া করা এখনও আমার পক্ষে প্রাণান্তকর ব্যাপার। মনে হয়, কে যেন পিঠের মাংসে তাতান লোহার শিক চেপে ধরছে। এলি আমায় যেতে নিষেধ করে।
এ তো সখ করে দেখবার মত দৃশ্য নয় আলেন। তাছাড়া, কাল যে লোকটাকে চাবকেছে সে যে আজ ওঠে আসবে, এ আশাও কেউ করবে না।
না গেলে মনে শান্তি পাব না।
রাস্তার পরে আমরা সার বাঁধি। বড় করুণ দৃশ্য। গোটা পেনসিলভানিয়া লাইনে বড় জোর আট থেকে ন'শো ছিন্নবাস ভিখারী মাত্র অবশিষ্ট আছে। এরাই ওয়েনের গর্বের বস্তু। এরাই গোটা পল্টনের সেরা সৈনিক। বন্দুকের ভারে আমাদের পিঠ নুইয়ে পড়ছে, বরফের মধ্য দিয়ে পা টেনে টেনে কোনমতে এগোচ্ছি। চকচকে বরফের উপর রোদের ঝিলিকে প্যাঁচার মত চোখ পিটপিট করে চলতে হচ্ছে।
একঘেয়ে সুরে ভেরী বেজে চলেছে। পাঁজর-বার-করা আধাউপোসী কাহিল একটা ঘোড়ায় চড়ে ওয়েন যাচ্ছেন। অধিকাংশ সেনানী পায়ে হেঁটে চলেছে। খাবারের অভাবে তাদের বাহনগুলো মরণের মুখে পা বাড়িয়েছে।
আমি যে সারিতে আছি, এলি আর জেকবও আছে সেই সারিতে। জেকবের মুখে এখনও সেই পাথুরে নীরবতা। আমার বন্দুকের বোঝাটা এলিই বয়ে চলেছে।
উপত্যকার মধ্য দিয়ে আমরা হাসপাতালের পাশ কাটিয়ে যায়। সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাক্তার আমাদের দেখছে। তার মুখে কৌতূহলী বিদ্রূপের হাসি। কেল্লার কাছে পৌঁছোতেই আমাদের সার বেঁধে দাঁড় করান হয়। জয় পাহাড়ের ঢালুতে একটা ফাঁসির মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। কেনটন দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চের সামনে। জন চারেক প্রহরী ঘিরে আছে তাকে তার মাথা খোলা। রোদে তার হলদে চুলে সোনালী রঙ ধরিয়েছে।
এতটা পথ চলে আমি দুর্বল ও ক্লান্ত বোধ করছি। কেনটনের দিকে চেয়ে আর আমি চোখ ফেরাতে পারিনি। বেশ বুঝতে পারছি, এ দৃশ্য দেখতে দেখতে এইখানেই মূর্ছা যাব।
এলির কানে কানে বলি, ওর কোন অপরাধ নেই। রাগের মাথায় তিনজনেই আমরা গুলি কার। কার গুলিতে যে ম্যাকলেনের লোকটা মারা গেছে তার ঠিক নেই।
ভগবান ওকে রক্ষা করবেন। বিড়বিড় করে বলে জেকব।
ভগবানের ভয় ও করবে না। আমি বলি।
সৈনিকেরা কেনটনের প্রতি সহানুভূতিশীল। ম্যাকলেনের হানাদারদের কেউই আমরা দেখতে পারি না। তারা যে খাদ্য লুঠে আনে তা আমাদের চোখেই পড়ে না। সৈনিকা মহলে কলগুঞ্জন ও আলোচনা শুরু হয়। কেনটন যে দুটো হরিণ মেরে নিয়ে এসেছিল তার কথ সৈনিকেরা এখনও ভুলতে পারেনি।

আমার মনে হয়, আমি যদি থাকতাম কেনটনের সঙ্গে? একটার জায়গায় যদি তিনটে ফাঁসির মঞ্চ থাকত? কোন ধরনের ভয় হচ্ছে কেনটনের মনে? কি করে অমন ভাবে মাথা খাড়া করে আছে? সইছে কি করে?

মনে হয়, সে আমার দিকে চাইছে। কিন্তু তারপর বুঝতে পারি যে চোখে রোদ পড়ে ঝিকমিক-করা বরফের মধ্যে শুধু মানুষের কাল মূর্তিই দেখতে পাচ্ছে!

চার্লি'র কথা মনে পড়ে। ওর বদলে সে মরতে চেয়েছিল। শুধু আমিই ছিলাম হিসাবের বাইরে। আমিও যে মরতে পারি একথা ওদের কারও মনে জাগে নি। এ আমি জানতাম। যখনই ওয়াশিংটন হ্যামিলটনের প্রস্তাবে রাজী হলেন, সেই মুহূর্তেই বুঝতে পারলাম যে আমি বাদ পড়ব। বুঝতে পারি যে আমার প্রাণ বাঁচবে।

মনে পড়ে, কেনটনের মুখ থেকে ঘৃণাসূচক একটি কথাও বেরোয়নি, প্রকাশ পায়নি কোন ক্রোধের লক্ষণ। শুধু ছোটবেলায় আমার প্রতি যে অন্যায় করেছিল তার কথাই বলেছে। অথচ সে কথা আমি একেবারেই ভুলে গেছি! কেনটনের মধ্যে যে মানুষটিকে বরাবর দেখে এসেছি, এখন তার কথাই বারে বারে মনে পড়ছে। এই মানুষটি…

দেবতার মত মানুষ! এলিকে বলি।

অঝোরে কাঁদছে এলি। কোন লজ্জা-সঙ্কোচ নেই। এর আগে কোনদিন এলির চোখে জল দেখিনি।

সৈনিক মহলে ক্রোধ ধূমায়িত হচ্ছে।

ওকে বাঁচান উচিত…নিতান্ত সৎলোক…কোন অপরাধ করেনি।

মূলার কেনটনের কাছে এগিয়ে যায় এবং তার ছেঁড়া কোটের টুকরো কাপড় ছিঁড়ে ফেলে, তারপর পেছন ফিরে গটমট করে চলে যায়। উর্দি কলঙ্কিত করবার নামে রীতিরক্ষা করা হয়। কেনটনের গায়ে উর্দি নেই। মহাদেশীয় বাহিনীর কারও গায়েই উর্দি নেই। উর্দি কথাটা কংগ্রেস ও সেনানীদের ধাপ্পা। নিজের শত ছিন্ন জামা-কাপড়ের কথা ভেবে এইবার আমি খুব গর্ব বোধ করি। সৈনিক আমরা নই। নিজেদের অধিকার বলে একজোট মানুষ আমরা—বন্দুকধারী ভিখারীর মিছিল।

যে বিপ্লব আমাদের মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছে, কেনটনের দিকে চেয়ে, মূলারকে গটমট করে হেঁটে যেতে দেখে এবং দুই পাশের লোকজনের দিকে চেয়ে তার একটা ছবি আমার সামনে ভেসে ওঠে। যে শক্তি মানুষের আত্মমর্যাদা নাশ করেছে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড ক্রোধের প্রতীক সেই বিপ্লব। আমরা তারই অংশ! নতুন জগতে যে নতুন মানুষ জন্ম নিচ্ছে তাদেরই দলে আমরা।

সৈনিক মহলে ফুঁসে উঠেছে এই ইঙ্গিত…মূক ক্রোধ ও ঘৃণার গর্জন। নিজেকে আবিষ্কারের আশায় অন্ধের মত যে জগৎ হাতড়ে বেড়াচ্ছে আমাদের মধ্যে সেই নতুন জগতের ইঙ্গিত মূলার দেখতে পেয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু কেনটন পেয়েছে। আমি হলপ করে বলতে পারি, কেনটন দেখেছে সে নতুন জগতের ইঙ্গিত। ভগবানের নামে হলপ করে বলতে পারি যে কেনটন সেই স্বপ্ন নিয়েই মরেছে।

কেঁদে এলিকে বলি, ওর ফাঁসি বন্ধ করতে হবে। আমরা ওকে ফিরিয়ে নেব।

পলকের জন্য সৈনিকদল তরঙ্গের মত এগিয়ে যায়। কিন্তু সেই মুহূর্তেই ওয়েনের

ক্যানকেনে কণ্ঠস্বর গর্জে উঠে, বিগ্রেডস্—এটেনশান্ !
আবার আমরা হটে যাই। হটে যায় সার বাঁধা সশস্ত্র মানুষ—হটে যায় দীর্ঘস্থায়ী রণাঙ্গনে। কতদিনে এ যুদ্ধের শেষ হবে কেউ জানে না।
তারপর ওরা কেনটনকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং তার চোখ বেঁধে দিতে চায়। মাথা নেড়ে আপত্তি জানায় কেনটন। খালি মাথায় গলায় ফাঁস পড়ে আছে সে। সোনালী রোদে সোনার ছোপ লেগেছে তার চুলে। তারপর ওরা ফাঁসটা ঝুলিয়ে দেয়···মরে যাও কেনটন।
সৈনিকদের মধ্যে গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়ে। মাথা হেঁট করে অবশভাবে বন্দুক ধরে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই।
মরে গেছে। আমি ফিসফিস করে বলি।
সকালের হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে ভেরী বাজতে থাকে। সৈনিকেরা আস্তানার দিকে পা বাড়ায়। ওয়েন পাথরের মূর্তি হয়ে গেছেন। কারও দিকে না চেয়ে তিনি ঘোড়ায় চড়ে আগে আগে চলেন।
জেকবের মুখ ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে। বিষণ্ণ চোখে কালির ছায়া।
আমি বলি, ওকে ঘৃণা কর না জেকব। ঘৃণা করতে হয় আমাকে কর—কেনটনকে নয়।
ওর পর আর কোন ঘৃণাই নেই আমার।
এলি বিড়বিড় করে বলে, পরের জন্য যে প্রাণ দেয় তার ভালবাসা···আবার আমরা আস্তানার ফিরে আসি। আমি ভেতরে ঢুকি। চার্লি গ্রীন আনার জন্যই অপেক্ষা করছে। তার উৎকণ্ঠিত মুখ ফ্যাকাশে সাদা।
কেনটন মারা গেছে।
কি করে মরল ? ভয় পেয়েছিল কি ?
না। হাসছিল।
চার্লি কেঁদে ওঠে···দুহাতে মুখ চেপে ডুকরে কাঁদতে থাকে। আগুনের কাছে গিয়ে আমি ঘেঁষে বসি···একদৃষ্টে চেয়ে থাকি শিখার দিকে। কেনটনকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করাবার সময় পলকের জন্য যে দৃশ্য দেখেছি, বারবার সে ছবি মনে আনবার চেষ্টা করি।

অসহায়ের মত আমি মাথা ঝাঁকাই। জলের কাপ ধরা হাতখানা কাঁপতে থাকে। খানিকটা জল ছলকে পড়ে। হাতে এখন হাড়ের পর হলদে চামড়া খানাই সার হয়েছে।
অনেক জ্বর দেখছি। এলি বলে।—জ্বর আসে যায় কিন্তু শরীর বড় দুর্বল করে দিয়ে যায়। মনে বহুত আজগুবি চিন্তা রেখে যায়।
কত দিন এখানে আছি এলি ?
ছয় দিন।
মনে মনে ভাবি—ছয় দিন। একটানা ছয় দিন উপবাস। তবু বেঁচে আছি। বলি, মরে গেলে কি হয় কখনও ভেবে দেখেছ এলি ?
এলি মাথা ঝাঁকায়।—আমি ধার্মিক লোক নই আলেন। এতো পাদরিদের কাজ।

আমার জন্য প্রাণ দিয়েছে কেনটন। আমার উপর তার কোন ঘৃণা থাকবে না ?
আমার মনে হয় না।
তুমি আমার পাশে থাকবে তো এলি ? যখন আমি চলে যাব, আমায় ধরে থাকবে ? বড় ভয় হচ্ছে আমার।
আমি তোমার কাছে কাছেই থাকব আলেন।
তুমি ভারী আশ্চর্য লোক এলি। জীবনে এমন ভাল লোক দেখিনি।
এলি মাথা ঝাঁকায়। ছেঁড়া নেকড়া ভিজিয়ে সে আমার মুখ মুছিয়ে দেয়...আমার গা ঢেকে দেয়...পাশে বসে মুখের তাপ মুছিয়ে দেয়।
আবার আমি জ্ঞান হারাই ! ঘুরে ফিরে গরম ও ঠাণ্ডা বোধ করছি। চোখের সামনে তখন আস্তানার আগুনটিই ভাসছে...আগুনের লেলিহান শিখা যেন আমার পুড়িয়ে খাক করে দিচ্ছে। বেসের জন্য কেঁদে উঠি। আবার জ্ঞান ফিরে আসে, ঘাম বেরোতে থাকে। হাত বাড়িয়ে বেসকে খুঁজি। ধোঁয়া-ভরা আস্তানার মধ্যে দিন রাত একাকার হয়ে যায়। এই আস্তানাই চিরন্তন। আমরা যেন এখানকার চিরবন্দী।
আর একবার ডাক্তার আসে। জ্বর ছেড়ে গেছে। দুর্বল শিশুর মত বিছানায় পড়ে আছি। চার্লি আবার উঠে বসেছে। বড় দুর্বল, বড় শীর্ণ তার চেহারা।
ডাক্তারের চেহারাও বদলে গেছে। চোখ লাল, শীর্ণ চেহারা...থুতনিতে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। রক্তের ছিটে লেগে তার পোশাক নোংরা হয়ে গেছে। কথার সেই খোঁচাও আর নেই। ডাক্তার পরিখার আগ্রহে ঢুকলে জেকব তাকে কোট খুলতে সাহায্য করে। আক্ষেপে মাথা ঝাঁকায় ডাক্তার।
আর আমি এই বিচ্ছিরি পাহাড়ে চড়ব না। এখানে ডাক্তার লাগবে কিসে ? তার চাইতে বরং চুপ করে থাকাই ভাল।
আগুনের পাশে বসে সে পা ছড়িয়ে দেয়। আড়চোখে প্রথমে চার্লিকে দেখে, তারপর তাকায় আমার দিকে। বলে, দুজনেই আবার মাথা খাড়া করেছে ! আমি কিন্তু ভাবতে পারিনি।
চার্লি হেসে ওঠে।—এবারে বোধহয় বরফের উপর পাঁজা করতে পারলেন না।
আর কিছু সময় দাও, হাজার রোগী আছে আমার হাসপাতালে ! বিশ্বাস করবে ? ঐ চারখানা কাঠের দেয়ালের মধ্যে কমসে কম হাজার লোক রয়েছে। পা ফেলবার জায়গা নেই। অবিশ্যি গায়ের উপর দিয়ে হেঁটে গেলেও কিছু এসে যায় না। এর বাড়া নরক নেই ! এই তো নরক। আমার হাসপাতালই পৃথিবীর নরক। কমসে কম হাজার লোক। আর তার একজনকেও ও ঘর থেকে হেঁটে বেরুতে হবে না। না পারে ভালোই হবে। এ আর মনে রাখবার মত জিনিস নয়। মাগীগুলো কিন্তু মরে না। ভগবান জানেন কি করে টিকে থাকে ওরা। কিন্তু আছে তো ! মেয়েদের কেউ হাসপাতালে পাঠাবে না। জাহান্নামে যাক বেটিরা ! তবু তো বেঁচে আছে। ঐ দুটোর দিকে তাকাও !
মেরি বলে, আপনার ওই মড়া রাখার ঘরে আমাকে টানতে পারবেন না। আপনি বড় সুবিধের লোক নন।
বটে ? ইংরেজ বাবু নিয়ে ঘর করলে তো দুজনেই ফিলাডেলফিয়ায় বেশ দু-পয়সা কামাতে পারতে।

ভারি নচ্ছার লোক তো আপনি।
যা হোক, এ দুটোকে একবার দেখে নি। ভেবেছিলাম, মরে আমায় রেহাই দিয়ে যাবে। বিরক্তভাবে তিনি আমাদের পরীক্ষা করেন এবং মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, না, বাঁচবে! অবাক করলে তোমরা হে!
জেকব বলে, কোন খবর জানেন নাকি? শিগগির নাকি মার্চ করা হবে?
মার্চ করবে? কোথায়? কি করে যাবে? কি আছে পল্টনের? বড়জোর হাজার খানেক লোক এখন থাকতে পারে। কি তারও কম হতে পারে। তিন হাজারের উপর পালিয়েছে। খুব সম্ভব ম্যারিল্যাণ্ডের লাইনের আদ্ধেক, দুটো নিউইয়র্কের রেজিমেণ্ট এবং মাসাচুসেটসের একটা দল ভেগে গেছে। কত যে মরছে তা ভগবানই জানেন। মাত্র একদিনেই তো আমি শ'খানেক বেশী মড়া হাসপাতাল থেকে বার করে দিয়েছি। আর সহ্য হয় না। পাগল হয়ে যেতে হয়। ওয়াশিংটনকে একবার বলছি। কিন্তু ষাঁড়ের মত লোকটা জেদী। বল্লাম, আগামী বসন্তকালে ছাউনিতে কোন লোক থাকবে না! একজনও বেঁচে থাকবে বলে ভাববেন না! যমপুরীতে বাসা বেঁধেছেন আপনি। লোকটা বলে কি জান? বলে, ডাক্তার, আমি কিন্তু মরব না। আমি তখন ওষুধ আর ব্যাণ্ডেজ চাইলাম। বল্লাম, বিশ লাখ লোকের বেশ সম্পদশালী দেশ রয়েছে···কংগ্রেস রয়েছে···বসে বসে কি করছে কংগ্রেস? তিনি বল্লেন, জানি না আমি বুঝতে পারছি না। কিছুই দিচ্ছে না আমাদের! উপরন্তু তারা অনুযোগ করেন, আমি নাকি বড্ড বেশী দাবী করি। তারপর তিনি শিশুর মত কেঁদে উঠলেন। আমি বললাম, ইওর একসেলেন্সি, চোখের জল অনেক দেখেছি, কিন্তু তাতে তো খাবার আসে না! তিনি বল্লেন, জানি হে, সবই জানি।
জেকব মাথা ঝেঁকে বলে, না না, মিথ্যে কথা বলছেন আপনি।
আমি মিথ্যে কথা বলছি? আমার দিকে চোখে খুলে তাকাও। তোমাদের এই দুঃখ কষ্টে আমার কিছুই আসে যায় না। তোমাদের ঐ আদর্শেরও ধার ধারি না আমি। আমি দেশপ্রেমিক নই। আমি ডাক্তার। প্রথম প্রথম সেই ভাবেই সব ব্যাপার নিয়েছি! ভেবেছি, চুলোয় যে খুশি যাক না কেন, আমার বয়েই গেল। আমি আমার কাজ করে যাব, নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করব। পারি তো দুচারজনকে সাধ্য মত সাহায্য করব। কিন্তু এখন মন ভেঙে গেছে।
বিমর্ষভাবে জেকব বলে, আর ফিরে যাবার কোন উপায় নেই—এখন আর ফেরা যায় না।
কেন যায় না? আত্মসমর্পণ করলেই জেনারেল হাউ রাজী হবে।
এলি বলে, আপনি যা বলেন ব্যাপারটা যদি তাই হয় তো ইংরেজরা আমাদের আক্রমণ করে সব চুকিয়ে ফেলে না কেন?
কেন, ফিলাডেলফিয়ায় কি অসুবিধাটা হচ্ছে তাদের? খামোখা লোকক্ষয় করবে কেন? যদি আর দুমাস অপেক্ষা করলে আক্রমণ করবার দরকারই না হয়। ফিলাডেলফিয়ায় হেলান দিয়ে বসে মজাসে গলা পর্যন্ত গিলে আর সেখামকার ভদ্রঘরের মেয়েদের পেট করেই তারা যুদ্ধ জিততে পারবে!
তখন লড়াই করবার লোক জুটবে। জেকব বিড়বিড় করে বলে।
জুটবে, মরা মানুষ?

তারপর সে বেরিয়ে যায়। দিন কয়েক পরে শোনা যায়, কপালে গুলি করে ডাক্তার আত্মহত্যা করেছে। হাসপাতাল থেকে ফিরে পেনসিলভানিয়ার একটি লোক সংবাদটি দেয়। বলে, সেই বেঁটে ডাক্তার মারা গেছে।
মনে পড়ে কেমন করে আমরা ওর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়েছিলাম।
জেকব ফিসফিস করে বলে, ওর মত লোকের আত্মহত্যা করা উচিত হয়নি। বেশ জোয়ান সৎ লোক ছিল মানুষটা।
ডাক্তার তো মরল, কিন্তু এখন পেনসিলভানিয়ার লোকেদের দেখবে কে?
তারপর আমরা আগুনের চারপাশ ঘিরে বসি। কথা বলবার ভরসা হয় না কারও। অবশেষে এলিকে জিজ্ঞাসা করি, এখন কি হবে?
জানি না। এলি জবাব দেয়।
বন্দুক তুলে নিয়ে জেকব অন্যের বদলে পাহারা দিতে যায়। কিন্তু সেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে তার পা-ও চলতে চায় না। সঙ্গিনীকে নিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে বিছানায় যায় চার্লি মেয়েটি আবার তাকে এমনভাবে গ্রহণ করেছে যেন কোন কালেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়নি। কেনটনের সঙ্গিনী আমার দিকে তাকাচ্ছে! মৃদুমৃদু হাসছে।
এলি উবু হয়ে পায়ের ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেলে! কি ভাবছে সে? মোহক উপত্যকার কৃষক এলি জ্যাকসন। সরল মানুষ। তেমন কোন গভীরতা নেই এলির মধ্যে। তবু কিসের জোরে চলছে সে?
পাশ ফিরে আবার আমি মেয়েটির দিকে তাকাই। তাকে বেস বলে কল্পনা করবার চেষ্টা করি। বেসের জন্য প্রবল আকুতি মনের মধ্যে অদ্ভুত সাড়া জাগায়। হামেশাই সে আমার মনে ফিরে আসে। মনে হয় ক্রমশই যেন আমার মনে নারীত্বের পূর্ণ মহিমার সে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ভার্জিনিয়ানদের কাছ থেকে যে ছোকরা মেয়েটিকে রেখে দিয়েছিল, মনে মনে সেই আলেনের কথা ভাববার চেষ্টা করি। সে যেন অনেকদিন আগেকার কথা। যদিও আমার স্ত্রী ছিল না সে। সে ছিল শিবির সঙ্গিনী…যার হিম্মত আছে তারই অঙ্কশায়িনী। এক সময় সে আমার সঙ্গিনী হলো। কচিৎ এমন ভাল উপহার মেলে। ফিনফিনে চেহারা…রাত্রে পুরুষদের দেহ তাতিয়ে রাখবার পক্ষে চমৎকার। কোনদিন সে কিছু চায়নি। আমিই তার কাছ থেকে সব কিছু আদায় করে নিয়েছি। শেষ অবধি সে মারা গেল।
কেনটনের সঙ্গিনীকে আমি শয্যাসঙ্গিনী করে নিয়েছি। ব্যাপারটা কেনটনের বদান্যতা বলেই মনে হয়। মেয়েটিকে আমি আগে ঘৃণা করতাম; কিন্তু এখন আর করি না। যে করেই হোক এখন আমাদের মন থেকে ঘৃণা লোপ পেয়েছে।
ধীরে ধীরে আমাদের পিঠের ক্ষত শুকিয়ে আসে। দিন কয়েক কেনটনের মৃত্যুর বিভীষিকা আমাদের উপর ভর করে থাকে। ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়ান রোদে ঝলমল কেনটনের ছবি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারছি না। পলকের জন্যও ভুলতে পারিনা তার সোনালী চুলওয়ালা খালি মাথা। মানুষে মানুষে যতটা ঘনিষ্ঠতা সম্ভব, আজকে আমার ও চার্লি গ্রীনের ঘনিষ্ঠতা সেই রকম।
শেষমেষ একদিন আমি কেনটনের কথা তুলি। কেমন করে সে মরেছে একে একে খুলে

বলি। একেবারে কেঁদে ফেলে চার্লি। জোয়ান লোকের পক্ষে কেঁদে শান্তি পাবার চেষ্টা বড় মর্মান্তিক।

একদিন নিজের বন্দুকটার কাছে যাই। রোড দ্বীপের সৈন্যদলের একজন কেনটনের আমার আর চার্লির বন্দুক তিনটে দিয়ে গেছে। সযত্নে আমি নিজের বন্দুকটি ঘষেমেজে পরিষ্কার করে রাখি···বালি দিয়ে ঘষে ঘষে মরচে সাফ করি।

তারপর একদিন পাহারা দিতে যাই। যে-কদিন আমাদের পালা সে-কদিন পাহারা দিতেই হবে। জেকব ও এলির পক্ষে সবার হয়ে পাহারা কোন মতেই সম্ভব নয়। পরিষ্কার এক ঠাণ্ডা রাতে আমি পাহারায় যাই। এক ফালি চাঁদ উঠেছে আকাশে। আস্তে আস্তে পায়চারি করতে থাকি। মনে মনে ভাবি, বরফে ঢাকা মাঠ আর পাহাড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে কতদিন যে এই জায়গায় পায়চারি করতে হয়েছে!

পেনসিলভানিয়ার লাইনের আর একটি লোকও পাহারা দিচ্ছে। পায়চারি করতে করতে যখন তার সঙ্গে দেখা হয়, দুজনে কিছুক্ষণ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে দু চারটে কথা বলি। পেনসিলভানিয়ার লোকজনের উপর আর কোন ঘৃণাই আমার নেই।

ভারি ঠাণ্ডা রাত। সে বলে।

শীতের জোর কমে আসছে।

আজকালকার শীত যেন কেমন!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমরা বাঘের ডাক শুনি। ছাউনির কাছাকাছি ইদানীং অনেক বাঘের আনাগোনা টের পাওয়া যাচ্ছে।

মোহকে আমাদের আবাদে এত বাঘ কোনদিন দেখেছি বলে মনে হয় না।

মড়ার খোঁজে আসে। লোক বলে, শীতের দিনে বিশ মাইল দূর থেকেও বাঘ মাংসের গন্ধ পায়।

সেই জার্মান ছেলেটির কথা মনে পড়ে। ঢালুর দিকে চেয়ে মনে হয়, আমি যেন চোখের উপর দেখতে পাচ্ছি, সে হামাগুড়ি দিয়ে চলছে···বরফের উপর পড়ে যাচ্ছে···হোঁচট খাচ্ছে ···আবার চলছে টলতে টলতে। পেনসিলভানিয়ার পাহাড়িয়া অঞ্চলে নিজের বাড়ির কথা ভাবছে জার্মান ছেলেটি। অদ্ভুত লোক আমরা। ওলন্দাজ, জার্মান, সমুদ্র তীরের নিষ্ঠাবান পিউরিটান আর সাগরপারের পোল-ইহুদির দল, দক্ষিণের স্কচ-আইরিশ-সুইডিস দল, কি উত্তরে ভ্যালী-অঞ্চলের লোক বল বা ভার্জিনিয়ার নিগ্রোদাস—সবাই মিলে আমরা এক আজব সেনাদল গড়েছি।

পরদিন রাত্রে এলি ও জেকবের সঙ্গে আমার কথা হয়। রসদখানা থেকে সামান্য কিছু রাম নিয়ে ফিরেছে জেকব। ভুট্টার কিছু লাপসিও মজুত আছে। আগুনের পাশে বসে সবাই মিলে খাওয়া হয়। খবরাখবর জানবার জন্য, কি দুচারটে কথা বলবার জন্য জনকয়েক পেনসিলভানিয়ার লোক আসে।

এলিকে বলি, কেনটন মরবার সময় নতুন একটা কিছু বুঝতে পেরেছে বলে আমার মনে হয়।

কি করে বুঝলে?

একদম ভয় পায়নি।

বেশ জোয়ান লোক ছিল। চার্লি বলে।
শুধু গায়ের জোরের কথা নয়। কেন আমরা চলেছি এলি ? আমাদের মাইনে দেয় না... উপোস করিয়ে রাখে···বাড়ির জন্য সবাই আঁকুপাঁকু করছি...
মুক্ত স্বাধীন মানুষ হব আমরা। এলি বলে।
ইয়োরোপের কোনো দেশের মানুষই তো স্বাধীন নয়!
কিন্তু এখানকার মানুষ মুক্তি পাবে। জেকব বিড়বিড় করে বলে।
আমাদের পক্ষে যুদ্ধ জয় করা অসম্ভব। শুনতে পাই ফিলাডেলফিয়ার ব্রিটিশদের নাকি বিশ হাজার সৈনিক আছে। হাজার লোকে বিশ হাজারের সঙ্গে লড়তে পারে না।
পেনসিলভানিয়ানদের একজন বলে, পাহাড়ের উপর দিয়ে কেনটাকি যাবার একটা বুনো পথ আছে। শুনতে পাই, সেনাপত্য ছেড়ে দেবার আগে ওয়াশিংটন নাকি সে-পথ দখল করবার হলপ করেছেন। পাহাড়ের ওপারে গেলে বহু বছর লড়াই চালাতে পারবেন।
বহু বছর ? অবিশ্বাসীর মত জিজ্ঞাসা করি আমরা।
বহু বছর! প্রায় আপন মনে বলে জেকব!—বছরের পর বছর!
আমি বেহদ্দ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। আমি বলি।
দুদিন কোন খাবার জোটে না। অনবরত কনকনে উত্তুরে হাওয়া বইছে সোঁ সোঁ করে। আস্তানার মধ্যে গুটিসুটি মেরে আমরা ফাঁদেপড়া জন্তুর মত ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকি। বন্দুক থেকে চামড়ার ফিতে ছিঁড়ে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেদ্ধ করে তা-ই খাওয়া হয়। টুকরো টুকরো করে কাপড় ছিঁড়ে তাই রান্না করে খাই। গাছের বাকলও বাদ পড়ে না। জংগলে সামান্য যে-কটি গাছ ছিল, তার ছাল দুদিনেই উঠে যায়।
সামান্য কারণেই আমরা চটেমটে অস্থির হই। চার্লি সামান্য কি একটা কথা বলতেই জেকব তার গলা টিপে ধরে। এলি আর আমি তাদের ছাড়িয়ে দিই। মেয়েরা তখন চীৎকার চেঁচামেচি করে পরিখা মাতিয়ে তোলে। শিশুর মত দুর্বল চার্লি। সঙ্গিনীও তাকে ছেড়ে গেছে। সে এত দুর্বল যে মেয়েটিকে সন্তুষ্ট করবার সামর্থ তার নেই। পেনসিলভানিয়ার অন্য আস্তানায় ডেরা বেঁধেছে মেয়েটি। চার্লি তাকে ফিরিয়ে দেবার দাবী করে। তারপর আবার সে ফিরে আসে বটে, কিন্তু বেড়ালের মত দুজনের ঝগড়া লেগেই থাকে।
মেয়েটিকেই বেছে নিতে দাও। এলি বলে।
মেয়েটি বলে, তোমাদের মত নোংরা ভিখারীদের কোন মেয়েই চায় না।
আমাদের যে কোন একজনের কাছে এসে থাক।
কার সাথে থাকব না থাকব সে আমার খুশি। স্বাধীন মেয়ে আমি।
পুরোদস্তুর খানকি।
এই খানকি বলবে না। আমিও একদিন ভাল মেয়ে ছিলাম। তোমাদের এই নোংরা বিদ্রোহী পল্টনে আসবার কোন ইচ্ছাই ছিল না।
শেষ পর্যন্ত আবার সে পেনসিলভানিয়ানদের কাছে ফিরে গেল। বাঙ্কে শুয়ে অসহায়ের মত কাঁদতে থাকে চার্লি। আমি আমার মানে একদা কেনটনের সঙ্গিনীকে দিতে চাই তাকে।
না না, ও তোমার কাছেই থাক আলেন।

রাগে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলি। পেনসিলভানিয়ানদের যেয়ে শাসাই। চার্লিকে বলি শরীরে আর একটু বল পেলে আমি ওদের খুন করব…তার সঙ্গিনীকে যারা নিয়েছে তাদের একজনও আমার হাত থেকে রেহাই পাবে না।
এলি বিষাদময় কণ্ঠে বলে, হা ভগবান, আমরা তো অচেনা আলাদা জায়গার লোক নই! একসাথে এই আস্তানার নরকে বসবাস করছি। নিজেদের মধ্যে মারামারি খুনোখুনি করা আমাদের সাজে না।
এলির চেষ্টাতেই সবসময় আগুন জ্বালান থাকে। নিজেই সে এই কনকনে শীতে জঙ্গলে গিয়ে কাঠ কেটে আনে। শিশুর মত আমাদের পালন করে এলি। সে-ই আমাদের ঠাট্টা-তামাসা গল্প করে সজীব রাখে। রাত্রে জেগে বসে কাটায়…অম্লানবদনে পায়ের অসহ্য ব্যথা সহ্য করে। এখন আর পা বাঁধে না।
সাতই মার্চ প্যারেডের ডাক পড়ে। হামাগুড়ি দিয়ে সৈনিকেরা আস্তানা থেকে বেরোয়। সৈনিকদল জমায়েৎ হয়। এত কম লোক আর কোন দিন হয় নি। প্যারেডের মাঠে কংগ্রেসের এক বাণী পড়ে শোনান হয়।
চারিদিকে গুজব রটে যায় যে আমরা দক্ষিন দিকে পেছু হটব।
ছাউনি ভেঙে দিচ্ছে।
এখনকার কাজ শেষ হয়েছে।
ব্রিটিশরা আক্রমণ করবে…জয় পাহাড়ের কেল্লা রক্ষা করতে হবে আমাদের।
ইংরেজদের আক্রমণের কোন সংবাদই কংগ্রেস জানে না। কোন খবরই রাখে না কংগ্রেস। জাহান্নামে যাক ব্যাটারা।
শীতে কাঁপছি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। শেষ অবধি ওয়েন তার স্টাফ নিয়ে এগিয়ে আসেন। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আমাদের সারির কাছে হেঁটে আসেন। বলেন, এটেনশন।
আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করি। মাথা ঝেঁকে আবার তিনি ঘোড়ার কাছে ফিরে যান। সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ফিলাডেলফিয়ার দিকে ধূসর পাহাড়ের দিকে চেয়ে থাকেন।
বাণীটি পড়বার জন্য এক তরুণ অফিসার এগিয়ে আসেন। উৎকর্ণ হয়ে আমরা অপেক্ষা করি। তিনি পড়তে শুরু করেন : মহাদেশীয় কংগ্রেস থেকে সাধারণতন্ত্রের পল্টনের উদ্দেশে : দুঃখকষ্ট-বরণে সৈনিকেরা যে সাহসের পরিচয় দিয়েছে তারই স্মরণে এতদ্বারা আমরা উপবাস ও প্রার্থনার জন্য একটি দিন ধার্য করছি…
আমরা হেসে উঠি। হা ভগবান, তেমন হাসি অনেক দিনের মধ্যে হাসতে পাইনি। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়—দুর্বলতায় কাঁপতে থাকি। তারপর পেছন ফিরে আবার আস্তানায় চলে আসি।
মনে পড়ে, বাণীটি পড়বার সময় ওয়েন নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। আস্তে আস্তে ঘোড়ায় চড়ে বৃদ্ধের মত তিনি পাহাড় বেয়ে বাসায় ফিরে যান।

সারা সকাল বৃষ্টি পড়েছে। আস্তানায় বসে আছি। বেশ বুঝতে পারছি এ তুষার নয়···বৃষ্টি পড়ছে টুপটাপ। নিভু নিভু হয়ে আগুন জ্বলছে। তবু কেউ কাঠ দিচ্ছে না। পরিখার চালে বৃষ্টির ফোঁটা যেন বাজনা বাজাচ্ছে।
সহসা মেরি কেঁপে ওঠে···বিছানার প্রান্তে বসে ফোঁপায়। কান্নার আবেগে তার শীর্ণ দেহ সামনে-পেছনে দুলতে থাকে।
কষ্ট লাগছে মেরি ? এলি জিজ্ঞাসা করে। এলির এ কৌতূহল বিস্ময়কর।
না।
তাহলে কাঁদছ কেন ?
শুনছ না, বৃষ্টি পড়ছে! ভেবেছিলাম এ শীত আর শেষ হবে না।
হাঁ, বৃষ্টি পড়ছে বটে ?
বৃষ্টিই হচ্ছে। মাথা ঝেঁকে জেকব বলে। আকাশ থেকে জল ঝরছে···চমৎকার বর্ষণ!
আন্না আমার বিছানায় শোয়া টুপটাপ বৃষ্টি পড়ার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য মাথা নাড়ছে। আমার বিছানার কাছে চাল ফুটো। লিকলিকে হাত পেতে সে বৃষ্টির ফোঁটা ধরে। ফিসফিস করে বলে, ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে। বাদলা দিনে আমরা রান্নাঘরে লেগে থাকতাম। এমনি দিনে সবাই রান্নাঘরের কাজ করে-- রুটি সেঁকে, সেলাই করে আর কাপড় বোনে! তাঁত পেলে ভাল কোটের কাপড় বুনতে পারতাম।
দরজার কাছে গিয়ে আমি কবাট খুলে ফেলি। গাছগুলি ছায়ার মত। খুব নীচু দিয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছে আর জোর বৃষ্টি পড়ছে অক্লান্তে। প্রতিটি ফোঁটায় বরফের বুকে এক একটি গর্ত হচ্ছে। শুরু হয়েছে বরফ গলা।
অবাক হয়ে দেখি, আমার কথা ফোটে না। বলি, কত তারিখ এলি ?
মার্চের যে কোন দিন হবে। তারিখটা ঠিক বলতে পারব না।
জেকব বলে, আজকে ইহুদিটির কথা মনে পড়ছে। বারবার বসন্ত আসবার কথা বলত বেচারী। এদেশের বসন্ত আর দেখতে পেল না।
আমি ফিসফিস করে বলি, আমরা তো বেঁচে আছি···আমি তুমি চার্লি···আমরা তো দেখতে পেলাম!
কি অপূর্ব বাহার বসন্তের!
আমরা বেঁচে আছি! এখনও কথা বলছি···নড়াচড়া করছি!
এলি মাথা ঝাঁকে। লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে ঘুরে এক একবার সে বিছানায় হাত বাড়িয়ে চালের ফুটোগুলো চেপে ধরে। তারপর সে আগুনের পাশে বসে পড়ে।
জেকব তার কাছে গিয়ে শান্তভাবে বলে, তোমার মনটা কি অস্থির হয়েছে এলি ?
অস্থির হবে কেন ? ভাবছি।

আবার একদিন আমরা মোহকে ফিরে যাব এলি···ফিরে যাব শ্যামল সুন্দর এক স্বাধীন দেশে!

হাঁ, আবার ফিরে যাব। কিন্তু তার কণ্ঠস্বরে প্রত্যয়ের দৃঢ়তা নেই।

আবার আমি দরজার কাছে যাই। শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি। চেঁচিয়ে বলি, এলি—এলি, দ্যাখ বরফ গলছে! বেয়নেট হাতে নিয়ে বৃষ্টির মধ্যে মাটি খুঁড়তে শুরু করি আমি। তারপর আবার আস্তানায় ফিরে আসি। ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে গা থেকে।

ঠাণ্ডা লেগে যাবে। এলি বলে। বোকামি কর না আলেন।

চার্লি ফিসফিস করে বলে, তুমি তো মাটি খুঁড়ছিলে আলেন। এখনই এত নরম হয়ে গেছে কি?

যারা মরেছে সবাইকে কবর দেব। শান্তিতে ঘুমোতে পারবে। আমি বলি,—কাউকে আর কবরের বাইরে বাঘের শিকার হয়ে থাকতে হবে না। মাটি খুঁড়ে সবাইকে কবর দেব। শান্তিতে থাকবে।

হাসতে হাসতে আমি বিছানায় বসে পড়ি।

জেকব বলে, এপ্রিল মাসের মোহকের কথা মনে পড়ছে। পশলা পশলা বৃষ্টির পর আকাশের কি স্নিগ্ধ চোখ জুড়ান শোভা! তারপর মে মাসে আপেল গাছে ফুল ফুটে ওঠে··· সে দৃশ্য জীবনেও ভুলতে পারব না।

ফোর্জ উপত্যকাতেও আপেল গাছ আছে। সাগ্রহে বলে চার্লি।

চাল চুঁইয়ে টপ টপ করে জলের ফোঁটা পড়ছে। গোল হয়ে বসে জলপড়া দেখছি। আমাদের হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ছে···মেঝের শুকনো ময়লা ভিজে সৃষ্টি হচ্ছে ছোট জল-কাদার খানা।

আমার হাড়ে শীত ঢুকেছে। বিষণ্ণভাবে চার্লি বলে,—যতদিনই যাক, এ শীত আর যাবে না। চাবকাবার সময় যে দারুণ ঠাণ্ডা লেগেছে তার কাঁপুনি কোনদিনই যাবে না।

আমি গরম রোদের স্বপ্ন দেখি।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও বলে উঠি, আমিও স্বপ্ন দেখছি যেন মুখে কাপড় দিয়ে রোদের মধ্যে সবজে নরম ঘাসের উপর শুয়ে আছি···ফুরফুরে হাওয়া বইছে···

সঙ্গে একটি মেয়েও থাকবে তো? মেরি জিজ্ঞাসা করে।

ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।

গরম রোদ! মাথা নেড়ে চার্লি বলে।

একদৃষ্টে আগুনের দিকে দিকে চেয়ে জেকব বলে, আবার পল্টন তাজা হয়ে উঠবে···নতুন নতুন লোক আসবে···স্বেচ্ছাসেনারা জড়ো হবে···আবার আমরা মার্চ করে এগিয়ে যাব···

এমনি সময় দড়াম করে দরজাটা খুলে যায়। হুট করে ঢুকে পড়ে পেনসিলভানিয়ার কার্ক ফ্লিম্যান। জলে চুপচুপ লোকটি হাঁপাতে থাকে। টুপটুপ করে জল গড়াচ্ছে তার গা মাথা থেকে।

ব্যাপার কি?

শুয়েলকিলের জমাট বরফ ভাঙছে।

আমরা তার পেছু পেছু বেরিয়ে পড়ি। বহু লোক বেরিয়ে পড়েছে পরিখা থেকে। বৃষ্টির

মধ্যে দাঁড়িয়ে কান পেতে আছে। বহুদূর থেকে একটা অস্পষ্ট কড়কড় আওয়াজ আসছে।
বরফ ভাঙছে।
মেঘ ডাকছে।
সহসা একটা কড় কড় শব্দ হয়। কে যেন কর্কশ গলায় হিঁহি করে হেসে উঠে।
শিগগির আস্তানায় ফিরে এস। এলি ডাকে। ধারাবৃষ্টি সহ্য হবে না।
আবার আমরা ফিরে আসি। জনকয়েক পেনসিলভানিয়ার লোকও আসে সঙ্গে। তাদের একজনের কাছে কিছু 'রাম' আছে। কি করে এই মদটুকু হাতে আসে সবিস্তারে তার কাহিনী শোনায় লোকটি। জন আটেক পেনসিলভানিয়ার লোক রসদখানা পাহারা দিচ্ছিল। পাহারা দিয়ে ফিরবার পথে একদিন সন্ধ্যাবেলা ম্যাকলেনের দলের দুজন হানাদারকে পাকড়াও করে। ধরাধরি করে এক টব লুটে আনা মদ ঝুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল লোক দুটি। পেনসিলভানিয়ানদের সার্জেন্টটি ক্যাপ্টেনের হয়ে সই করে মদটুকু নিয়ে আসে এবং সবাই মিলে প্রাণভরে খায়। এজন্য সার্জেন্টটিকে দশ ঘা চাবুক খেতে হয়েছে। আর সবাই খেয়েছে চার ঘা করে। তা এর জন্য এ শাস্তি নেওয়া যায়।
সেই রামের বাকীটুকুই আছে এদের কাছে। যা আছে তাতেও আমাদের সবাইর বেশ খানিকটা করে হয়। আগুনে তাতিয়ে আমরা আস্তে আস্তে খাই।
স্বাধীনতার স্মরণে তখন 'টোস্ট' করা হয়: জন ও স্যাম আডমসের উদ্দেশ্যে···ব্যাটাদের ফাঁসি হোক।
মহাদেশীয় কংগ্রেস নরকে পচে মরুক!
আমাশায় তাদের পেট পচে খসে যাক!
আগুনের চারপাশে বসে আমরা একটু একটু মদ খাচ্ছি আর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শুনছি। বৃষ্টির একটানা টাপটুপ শব্দের মধ্যে কেমন একটা ঘুমপাড়ানি আমেজ আছে।
পেনসিলভানিয়ার লোকটি কেনটনের কথা তোলে।
বেশ জোয়ান লোক ছিল। মানুষের মত মানুষ!
দুঃখ কষ্ট সহ্য করবার মানুষ সে নয়। কিন্তু সে জানত লড়ে কেমন করে জিততে হয়।
চার্লি'র ইতিমধ্যেই খানিকটা নেশা হয়েছে। বেশী মদ গিলবার অভ্যাস আমাদের কারোরই নেই। তাছাড়া পেটেও এমন কিছু খাবার নেই যে মদের কড়া ঝাঁজ সামলাতে পারি। চার্লি' বলে, আমাদের জন্যই সে প্রাণ দিয়েছে। ফাঁসিতে মরার বড় ভয় ছিল কেনটনের! তবু সে আমাদের জন্য মরেছে।
মুলার ব্যাটা নরকে যাবে। হরিণের কথা মনে করে ব্যাটা কেনটনের পর শোধ তুলেছে। সেদিন অমন দুটো হরিণ উপহার দেবার কথা বহু পেনসিলভানিয়ার লোকই ভুলবে না। মুলার ব্যাটারও মনে থাকবে ঘটনাটা।
এলি বলে, কেনটনকে শান্তিতে থাকতে দাও। ছাউনিতে এমন কোন কিছু পাবে না যার জন্য রক্তের মূল্য দিতে হয়নি।
ফাঁসিতে মরলে কোনদিন শান্তি পাওয়া যায় না।
খুব যায়।
পেনসিলভানিয়ার জনকয়েকের সঙ্গে তাদের সঙ্গিনীরাও রয়েছে। হাত বদল হচ্ছে মেয়েরা।

কারও কোন দ্বেষ নেই সেজন্য। কেউ হয়ত মারা গেল, কিন্তু তার সঙ্গিনী বেঁচে রইল। এত দুঃখকষ্ট ভুগেছি যে আমাদের মধ্য থেকে ঈর্ষা লোপ পেয়েছে। অদ্ভুত জীবন এই শিবির-সঙ্গিনীদের। এককালে এদের অনেকেই ভাল ছিল। ভালবাসার লোক যুদ্ধে আসছে, বিয়ে করে মেয়েটিও সঙ্গে আসে। তারপর হয়ত সঙ্গী মারা গেছে কিম্বা তাকে ফেলে পালিয়েছে। মেয়েটির তখন দাঁড়াবার জায়গা নেই। বাধ্য হয়ে শিবিরের সঙ্গেই চলতে হয়েছে···গা ঢেলে দিতে হয়েছে শিবিরের জীবনে। অনবরত হাত বদল হয়ে ঘুরছে মেয়েরা আর পুরুষের ক্ষুধা মিটিয়েছে। মানুষের মধ্যে জানোয়ারের রূপ দেখেছে এরা। কে জানে, হয়ত এদের জন্যই এখনও আমরা মানুষ আছি।
আগুনের পাশে শুয়ে করুণ একটি ওলন্দাজ গান গাই। নিউ ইয়র্ক আর পেনসিলভানিয়ার নদীর তীরে একশো বছর ধরে গাওয়া হচ্ছে এ গান।
আরও দুদিন বৃষ্টি চলে। তারপর মেঘলা ভেজা দিনে হুকুম আসে যে সেইদিনই গোটা পল্টনের 'রিভিউ' হবে। সংবাদটা মূলার নিজেই নিয়ে আসে। পরিখায় ঢুকে বলে, গর্ত থেকে বেরিয়ে সাফ-সাফাই হয়ে নাও।
আমাদের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে হেসে ফেলে। লোকটার সাহস আছে বলতে হবে। পরিখায় ঢুকে বলে, বেয়নেট উঁচিয়ে প্যারেড করবে। গটমট করে হাঁটবে।
পল্টন আবার চলতে শুরু করবে নাকি ? এলি জিজ্ঞাসা করে।
জানি না।
একটু বাদেই জেনারেল ওয়েন আস্তানায় ঢুকে পড়েন। আপনা থেকেই আমরা 'এটেনশন' হয়ে দাঁড়াই। ওয়েনের মধ্যে এ একটা সহজ ও স্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব আছে···ফিকে নীল চোখে আছে আগুনের ঝিলিক। মূলারকে দেখে আমরা নড়িনি।
কোন কথা না বলে তিনি পরিখার চারিদিক ঘুরে দেখেন। বন্দুক হাতে নিয়ে পরীক্ষা করেন এবং চকমকি পরখ করেন। তারপর মাথা ঝেঁকে বলেন, সৈনিক তোমরা, জাহান্নামে গেলেও সৈনিক তার বন্দুকটা ঠিক রাখে। একে একে তিনি আমাদের সবাইর পায়ের দিকে তাকান। এলির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, হাঁটতে পার ?
পারি স্যার। এলি বলে।
ভগবান সাক্ষী, জুতোর জন্য কত অনুনয় যে করেছি ! তবে শিগগিরই পাওয়া যাবে হয়ত।
আমারও তাই বিশ্বাস স্যার। তবে শঙ্কা হয়, আর কোন জুতোই আমার পায়ে খাটবে না।
বড় দুঃখের কথা। দরদভরা কণ্ঠে ওয়েন বলেন।
দরজার কাছে গিয়ে সরাসরি তিনি বলেন, নিউ ইয়র্কের লোক তোমরা ; কিন্তু এখন আমার সৈন্য দলে আছে। সবাই আমরা নরক দেখেছি। সামরিক বিচারের সময় আমি তোমাদের হয়ে অনুনয় করেছিলাম : এই কথা বলেই তিনি বেরিয়ে যান।
বাইরে এসে আমরা ব্রিগেডের মত দাঁড়াই। বরফ গলে জল-কাদায় প্যাচপ্যাচ করছে। প্রতিপদে পায়ের পাতা ডুবে যাচ্ছে। ভেরী বাজিয়েরা দাঁড়িয়ে ঢ্যাবঢেবে ভেরী কড়া করবার চেষ্টা করছে। সর্বত্র চলাচলতি ও ব্যস্ততার ভাব। চারদিকে নতুন জীবনের সাড়া। অবশেষে মার্চ করবার হুকুম আসে। পেনসিলভানিয়ার লাইনে মাত্র আটশোজন আছে।
গাছের ফাঁক দিয়ে চলেছি। বরফ গলা জল পড়ছে গায়ে-মাথায়। গালফ রোডে এসে

আমরা মাসাচুসেট্সের রেজিমেন্টগুলোর পেছনে পড়ি। ভার্জিনিয়ানরা আমাদের পেছনে আসছে। চাপা গলায় টেনে টেনে গালাগাল দিচ্ছে তারা। আমরাও ফিরিয়ে গালাগাল করছি।

মার্চ করে আমরা প্যারেডের মাঠে নেমে পড়ি। মাঠের ওধারে রোড দ্বীপের সৈনিকেরা আমাদের মুখোমুখি দাঁড়ায়। তাদের পাশে মেরিল্যাণ্ডের ব্রিগেড। লম্বা নিউ জার্সি'র সৈনিকেরা আছে তাদের পাশে। এ এক অদ্ভূত দৃশ্য। শীর্ণ দাড়িওলা ফ্যাকাশে মুখ নোংরা সৈনিকদল এক অদ্ভুত পল্টন গড়েছে। কারও গায়ে একটা আস্ত পরিচ্ছন্ন জামাকাপড় নেই। এ যেন নরক ফেরতা এক দল লোক। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কুড়নো বিকলাঙ্গ একদল ভিখারীর মিছিল।

ভেরী বাজিয়েরা সামনে এগিয়ে এক পক্কর বাজায়। কিন্তু ভেরীর আওয়াজও যেন কেমন মিয়ানো। ভেরীর চামড়া ভিজে গেছে। মাথার উপরে নীচু দিয়ে মেঘ ভেসে বেড়ায়। শুয়েলকিল নদীতে বরফ ভাঙবার কড়কড় শব্দ। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে।

ওয়াশিংটন তাঁর স্টাফ নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে আসেন। প্যারেডের মাঝখানে এসে তাঁরা ঘোড়া থেকে নামেন। বরফ গলা কাদার মধ্যে দাঁড়িয়ে সৈনিকেরা প্রতীক্ষা করছে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে একটি অচেনা লোক আছে। সকলের চোখ তার দিকে। সোনার ফিতে লাগানো নীল ও সাদা উর্দি তার গায়ে। মাথায় সাদা টুপি। পায়ে উঁচু গোড়ালির কালো বুট। আমরা তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু কেউ জানে না।

আস্তে আস্তে তিনি পেনসিলভানিয়ার লাইনের দিকে এগিয়ে আসেন। ওয়াশিংটন তাঁর পেছনে আসেন। ওয়েন এগিয়ে গিয়ে তাঁর করমর্দন করেন এবং তিনজনে দাঁড়িয়ে আলোচনা করতে থাকেন। ওরা এত দূরে যে কোন কথাই শুনতে পাচ্ছিনে। সহসা অচেনা লোকটি হো হো করে হেসে ওঠেন। এমন প্রাণ খোলা হাসি অনেক মাস শুনতে পাইনি। এতে ফল হয়। পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি আমরা।

টান হয়ে তিনি সৈন্যদলের দিকে এগিয়ে আসেন। বেশ গাট্টাগোট্টা লোকটি। মুখখানা বেশ চওড়া চ্যাপটা ধরনের। আমাদের কয়েক গজ সামনে তিনি থেমে দাঁড়ান। চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে। ঘাড় বাঁকিয়ে প্রতিটি সৈনিককে লক্ষ্য করে দেখতে দেখতে তিনি হাঁটতে থাকেন। ব্রিচেস নেই এমন একটি সৈনিকের কাছে আসে লোকটি। এক টুকরো ছেঁড়া কাপড় ঘাঘরার মত জড়িয়ে লজ্জা ঢেকেছে সৈনিকটি। আগন্তুক থেমে দাঁড়ান। পলকের জন্য তিনি সরাসরি সামনে তাকান। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে মনমরা ভাবে সৈনিকটির দিকে ফেরেন। আবার ঘুরে যায় মাথাটা। হতাশ চোখে তিনি জেনারেল ওয়াশিংটনকে খোঁজেন। তারপর আবার তাকান ছেঁড়া ঘাঘরা-পরা লোকটির দিকে। আমাদের ভারি মজা লাগে। হাসতে শুরু করি। অন্যান্য সৈনিকেরাও হেসে ওঠে। সহসা এক পশলা বৃষ্টি আসে। তবু হেসে চলে সৈনিকেরা।

ওয়েন বলেন, ভুলে যাবেন না ব্যারণ, শীতকালে নরকের দুর্ভোগ ভুগেছি।

অচেনা লোকটি জার্মান ভাষায় জবাব দেন।

নিশ্চয় মনে রাখতে হবে একথা।

অচেনা লোকটি আবার মাথা ঘোরান। তারপর গুটি গুটি পা ফেলে এগিয়ে যান

সৈনিকটির দিকে। সৈনিকটিকে চিনি। তার নাম এনক ফারের। লম্বা পাতলা চেহারা! অচেনা লোকটি এগিয়ে আসতেই সৈনিকটি পিছিয়ে যায়। নীচু হয়ে হাঁটু ঢাকবার চেষ্টা করে।

অচেনা লোকটি ডাকেন, এদিকে এস।

এনক্ জার্মান জানে না।

এদিকে এসে ফিরে দাঁড়াও।

জার্মান ভাষা বুঝবার মত ওলন্দাজ আমার জানা আছে। পেনসিলভানিয়ার অধিকাংশ লোকেই সামান্য ওলন্দাজ বা জার্মান বলতে পারে। ফারের পেনসিলভানিয়ার উত্তর অঞ্চলের লোক এবং ইংরেজ বাপ-মায়ের সন্তান। ঘাঘরাটা হাঁটু অবধি টেনে দেবার চেষ্টা করে সে খানিকটা পিছিয়ে যায়! তারপর বন্দুকটা ফেলে দেয়।

দুত্তোর ছাই, একদম ভিজে গেছে! বন্দুকটা হাতড়ে বলে,—আপনি কে মিস্টার?

অচেনা লোকটি হো হো করে হেসে ওঠেন। হাসির চোটে তার সারা দেহ কাঁপতে থাকে। করতালি দিয়ে তিনি ডাইনে বাঁয়ে দুলতে থাকেন। ওয়াশিংটন, ওয়েন আর গ্রীন ক্ষুব্ধভাবে নীরবে তাঁর ভাবসাব লক্ষ্য করেন। মস্ত বড় মাথা ঝেঁকে বরফের মধ্যে হোঁচট খেয়ে তিনি তাঁদের দিকে ফিরে তাকান।

মাফ করবেন, সত্যিই আমি দুঃখিত। ইয়োরোপে কিন্তু অদ্ভুত এক পল্টনের গল্প শুনেছি। এমন পল্টনের কথা শুনেছি যারা শেষ অবধি ইংরেজদের রুখে যাচ্ছে। সে বাহিনীকে নাকি গোটা আমেরিকা তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ইংরেজরা।

বন্দুক কিন্তু আমাদের আছে। টান হয়ে দাঁড়িয়ে ওয়াশিংটন বলেন।

জানি। সত্যিই আমি দুঃখিত। মাফ করবেন। তবু তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকেন। হাসি সামলাবার সাধ্য তাঁর নেই।

ব্যারন ফন স্টুবেনকে এই আমরা প্রথম দেখি। পেনসিলভানিয়ানদের কাছেই তিনি প্রথম আসেন। এমন এক সময়ে তিনি এসেছেন যখন আমরা সাবাড় হয়ে গেছি।

সেদিন পুরো তিন ঘণ্টা আমরা বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি। ভিজে চুপচুপ হই। ঠাণ্ডায় প্রায় অসাড় হয়ে যাই। ঐ গাট্টাগোট্টা হোঁতকা জার্মানটি ছাড়া আর কোন কিছু আমাদের ধরে রাখতে পারত না। সামনে পেছনে ছুটাছুটি করে তিনি আমাদের চুটিয়ে গালাগাল করেন। আমাদের মুখ চোখের শূন্যদৃষ্টি দেখে হাসিতে ফেটে পড়েন।

আমাদের মন পেছনে ফিরে যায়। হয়ত বোস্টনের বাঙ্কার পাহাড়ের কথা মনে পড়ে। বিশৃঙ্খল এক জনতা হঠাৎ সেদিন পল্টন হয়ে পড়ে!

অধীরভাবে তিনি আমাদের সারির সামনে-পেছনে ছুটাছুটি করেন। কোন সৈনিকের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়ে নিজে ঠিকমত ধরে জার্মান ভাষায় গর্জে ওঠেন, এই ভাবে। দুত্তোর চাষা ভূত, এইভাবে ধরতে হয়! এটা বন্দুক—কাঠের গুঁড়ি নয়! বুঝলে? এইভাবে ধর!

আবার তিনি মাসাচুসেটসের এক চাষীর হাতে বন্দুকটা ফিরিয়ে দেন। লোকটি যে-ভাবে বন্দুক ধরেছিল, আবার তেমনি আনাড়ীর মতই ধরে থাকে।

ব্যারন তখন আবার বন্দুকটি ছিনিয়ে নেন। ক্রোধে বিবর্ণ হয়ে বলেন, এই ভাবে…এইভাবে

বুঝলে শূয়োর। গাধা চাষী কোথাকার।
সৈনিকটির চোখে শূন্যদৃষ্টি। মুখে ক্যাবলার মত হাসি। ব্যারন তখন রাগে গোঁ গোঁ করে বন্দুকটি ফিরিয়ে দেন এবং মাথা ঝাঁকিয়ে গজ গজ করে পায়চারি করতে থাকেন।
এই দিয়ে পল্টন গড়তে হবে! হা ভগবান্! এদের গড়েপিঠে পল্টন বানাতে হবে!
আবার কোন সময় তিনি হয়ত হা হা করে হেসে উঠতেন। বিরাট জানোয়ারের হাসির মত সে হাসি ছড়িয়ে পড়ত সারা প্যারেডের মাঠে। তারপর আবার নতুন করে তালিম দিতেন। পল্টনের গোড়ার কথা…এক দো তিন চার!
শূন্য অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সৈন্যদল।
হে ভগবান! এদের নচ্ছার ভাষা যদি বলতে পারতাম! এই বর্বর ভাষা বলতে শিখিনি কেন?
তিনি আমাদের মার্চ করান। একবার সামনে নিয়ে যান, আবার পেছনে নিয়ে আসেন। প্যারেডের মাঠের মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে চীৎকার করে হুকুম দেন। আমরা যখন মার্চ করতে শুরু করি ঘোড়ায় চড়ে সামনে পেছনে ছুটাছুটি করেন—ধমক দিয়ে যথারীতি লাইনে রাখবার চেষ্টা করেন।
লাইনে থাক…লাইন ভেঙনা…চোখ ডাইনে রাখ! দোহাই ওয়েন, আমার হয়ে ওদের বুঝিয়ে দাও না।
বৃষ্টির তোর বাড়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা আমরা প্যারেড করি আর স্টুবেন ছুটোছুটি করে গালাগাল দেন। আমাদের বিশ্রাম দেবার জন্য ওয়াশিংটন তাকে অনুরোধ করেন। তিনি রাজী না হয়ে অনবরত আমাদের তাড়িয়ে বেড়ান।
বেহদ্দ ক্লান্ত হয়ে মড়ার মত অবস্থায় বৃষ্টির মধ্যে আমরা আস্তানায় ফিরে আসি এবং ভাল করে আগুন জেলে ঠাণ্ডা ও ক্লান্তিতে কাঁপতে কাঁপতে গুটিশুটি মেরে তার চারপাশে বসে পড়ি।
জেকবের মুখে কিন্তু হাসি ফুটেছে। আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে সহাস্য দৃষ্টিতে সে চেয়ে আছে শিখার দিকে। এতদিনে একটা মানুষের মত মানুষ এবং সাচ্চা অফিসার পেয়েছে সে।

ঝাঁকে ঝাঁকে বৃষ্টি আসে। মাঝে মাঝে রোদের ঝিলিক: কালো এবং ধোঁয়াটে মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। অবিরাম বর্ষণে বরফ গলে জল হচ্ছে, আর জল হচ্ছে কালো কাদা। আস্তানার ফুটো দিয়ে জল গড়াচ্ছে। মেঝে প্যাচপ্যাচ করছে কাদায়। কাদা মাখা ভূত হয়েছি আমরা।
একদিন হয়ত রোদ উঠবে।
ভদ্রলোক ব্যারন ফন স্টুবেন আমাদের সুস্থ থাকতে দিচ্ছেন না। মনে হয় জার্মান ভদ্রলোক হাওয়ার প্রতিকুলে চলেছেন। কে তিনি? কি চায় লোকটা? সে সামান্য শ'কয়েক লোক আছে তাই দিয়ে তিনি পল্টন গড়তে চান নাকি? বিপ্লবী বাহিনী আবার হাসতে শিখছে। হাসছে নিজেদের দুরবস্থা ভেবে…সামান্য কয়েকশো দুর্গত লোকের করুণ অবস্থা দেখে।

ডিসেম্বর মাসে এগারো হাজার লোক এসেছিল এই ফোর্জ উপত্যকায়। আজকে অর্দ্ধেক পরিখা শূন্য। চাল ভেঙে পড়ছে। পেনসিলভানিয়ার লাইনে এক একটি রেজিমেণ্টে দু'তিন জন বেঁচে আছে।
তবু স্টুবেন আমাদের স্থির থাকতে দিচ্ছেন না। ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন বৃষ্টির মধ্যে। টেনে নিচ্ছেন প্যারেডের মাঠে। ভেজা চামড়ার পর ড্রামের ড্যাব-ড্যাবানি লেগেই আছে। হুকুম আসে, ব্রিগেডের ধাঁচে দাঁড়াও। কাদার মধ্যে পট্টি বাঁধা পা টেনে আমরা ড্রিল করি। জার্মানটির 'এক দুই তিন চার' আমরা বুঝি। লাইন থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় কেউ কেউ। বেয়নেট চার্জ করবার হুকুম শুনে জীর্ণবাস শীর্ণদেহ একটি ছোট্ট লাইন বৃষ্টির মধ্যে এগিয়ে যায়। আবার সার বাঁধ...ফের চার্জ করে। বারবার চলে এই সামরিক শিক্ষা। শেষে এমন অবস্থা হয় যে আমাদের সোজা হয়ে দাঁড়াবার শক্তি পর্যন্ত থাকে না। দাড়ি বেয়ে জল পড়ে টুপটুপ করে। খোঁড়ার মত বেঁকে দাঁড়াই। পরস্পরের মুখের দিকে চাই। তারপর হেসে উঠি। দুঃখ-দুর্গতির চরম অবস্থায় পৌঁছেছি। আর নীচুতে নামা যায় না। এ দুনিয়ার আশ্চর্য জানোয়ার আমরা।
স্টুবেন তখন আরো জোরে জোরে হুকুম করেন। আমরা খোঁড়ার মত কাত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। শক্তিহীনের কাছ থেকে এমন বেশী কি আর আশা করা যায়? স্টুবেন তখন অনুনয় করেন।
আর একবার কর না ছেলেরা।
খালি মাথায় বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকেন তিনি। তাঁর উর্দির সোনার ফিতের বাহার আর নেই। সাদা ব্রিচেস ময়লা লেগে মেটে রঙ ধরেছে। প্রত্যেকের কাছে কাছে গিয়ে তিনি অনুনয় করেন। মাঝে মাঝে চটে ওঠেন। গলা ছেড়ে চেঁচান কখনও। তারপর আবার মেয়েদের মত শান্ত হয়ে যান। বন্দুক হাতে নিয়ে নিজেই ড্রিল করে দেখান।
আমার কথা শোন। তোমাদের দিয়ে আমি পল্টন গড়ছি না···গড়ছি একটা জাতি। তোমরা এবং আমি একসঙ্গে জয় গৌরবে এই দেশের মধ্য দিয়ে মার্চ করে যাব। বুঝলে?
আমরা ভিখারীর মত করুণভাবে দাঁড়িয়ে থাকি।
ঠিক আছে···আজ বাড়ি চলে যাও।
জেকব এলি এবং আমি আস্তানায় ফিরে আসি। জ্বর হয়েছে চার্লির। চাবকাবার পর যে জ্বর হয় সেই জ্বরই চলছে হয়ত। অবিরাম কাশছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটে শুকনো লাল দাগ দেখা যায়।
জলে ভিজে ক্লান্ত হয়ে আমরা আস্তানায় ফিরি। ঢুকেই সবাই আগুনের কাছে যাই। আগুনটা আরও বড় করে জ্বালান হয়। বৃষ্টির জোর বেড়েছে। নুড়ির মত টুপটাপ পড়ছে চালে।
চার্লি আমায় ডাকে, অ্যালেন···
একখানা কম্বল নিয়ে তার বিছানার কাছে যাই। সেখানে বসে বন্দুকের জল কাদা মুছে ফেলি। তার সঙ্গিনী এখন আর তার সঙ্গে শোয় না। মাঝে মাঝে পরিখায় এসে গল্প করে যায়। যে করেই হোক, বেঁটে মুদ্রাকরের আদর-যত্ন তাকে করতে হচ্ছে। এখন আস্তানার বিপরীত দিকে বসে সে আমাদের লক্ষ্য করছে।

কিছুটা ভাল আছ? আমি জিজ্ঞাসা করি,—গায়ের জ্বরটা তেমন বেশী লাগছে না তো চার্লি।
আমার হয়ে এসেছে আলেন।
এত পুরুষের কথা নয়। নেহাৎ বোকারাই এভাবে কথা বলে।
একটা শপথ তোমায় করতে হবে আলেন। বল, কবর দেবে তো আমাকে। মানুষের মাথা সমান গর্ত খুঁড়ে মাটিতে পুঁতে রাখতে হবে কিন্তু। শীতের মাঝে পড়ে থাকবার প্রচণ্ড ভয় আমার। যতটা অবধি মাটি জমে যায় তার নীচে থাকতে চাই।
বোকার মত কি বলছ?
কবর তোমাকে দিতেই হবে আলেন।
ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে আমি উঠে দাঁড়াই এবং বন্দুক রেখে দিই। চোখ বুজে শুয়ে আছে চার্লি।...ঘড়ঘড় শব্দ হচ্ছে গলায়। আমি সরে আগুনের কাছে যাই।
ওর অবস্থা ভাল নয়। জেকব বলে।
চারকানিতে শেষ করেছে। কেনটন বাঁচত।
শিগিরই বৃষ্টি থেমে যাবে; তারপর জোর পাবে।
ওর রক্ত ঝরাবার ব্যবস্থা করা দরকার।
না হয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে হয়। শুনলাম, বোস্টন থেকে নাকি নতুন দুজন ডাক্তার এসেছে।
না, হাসপাতালে আর নয়। বিড়বিড় করে আমি বলি,—ওখান থেকে কেউ ফেরে না। হাসপাতালে গিয়ে আমিও বাঁচতে চাই না।
পরদিন এলি হাসপাতালে যায়। বৃষ্টি ভিজে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে বলে, কোন ডাক্তার পরিখায় আসতে চায় না।
আসবার কথা বলেছিলে?
বলে, এখানে নিয়ে এস। হাসপাতালে যাওয়া আর নরকে যাওয়া সমান। তাক করে ওরা বিছানা বানিয়েছে। রোগীরা এত ঘেঁষাঘেঁষি করে শুয়ে আছে যে কারও পাশ ফিরবার সাধ্য নেই। ডাক্তাররা বোস্টনের লোক। কোনদিকেই তাদের খেয়াল নেই।
তাহলে কি সেখানেই নিয়ে যাবে?
এলি মাথা ঝাঁকায়। চার্লির বিছানার কাছে যায় সে। চোখ বুজে সেখানে শুয়ে আস্তে আস্তে কথা বলে।
রক্ত ঝরাবার বন্দোবস্ত কর। মেরি বলে।
আমায় দিয়ে হবে না। বিড়বিড় করে বলে এলি,—ওর মধ্যে আমি নেই।
কি দশা হয়েছে দেখছ না। ভাল কথা বলছি রক্ত ঝরাবার...
করলেই ভাল হয়। জেকব বলে,—তাতে রক্তের দোষ কেটে যাবে।
মাথা নেড়ে সায় দেয় এলি। আমি একটা পাত্র নিয়ে আসি। জেকব পাথরের উপর ছুরি শানায় এবং তারপর ঠিক কনুইর উপরে চার্লির বাহুর একটা শিরা কেটে ফেলে। চার্লি কোন যন্ত্রণা পেয়েছে বলে মনে হয় না। আপন মনে প্রলাপ বকে যায়। শিরাটা পেলেও রক্ত মোক্ষণে জেকব ওস্তাদ নয়। প্রায় গোটা শিরাটাই কেটে ফেলে। দেখে মনে হয় না যে

অত রক্ত পড়লে কোন মানুষ বাচতে পারে।

বন্ধ কর! আমি চেঁচিয়ে উঠি,—অমন করে রক্ত পড়লে মরে যাবে!

জ্ঞান ফিরে না আসা পর্যন্ত পারা যায় না আলেন। ফিসফিস করে বলে এলি,—নয়তো পাগল হয়ে মারা যাবে। জ্ঞান ফিরে আসুক।

পাত্রটি রক্তে ভরে যায়। চার্লি'র মুখের ল্যালচে আভা মিলিয়ে যায়। চামড়ার রঙ কালচে ফ্যাকাশে হয়ে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চোখ মেলে। একে একে সবাইর মুখের দিকে তাকায়। সবাইকেই চিনতে পারে। যে করেই হোক তার মুখে হাসি ফোটে।

আনাড়ীর মত আমরা তার হাত বেঁধে দিই। কিন্তু পুরোপুরি রক্ত বন্ধ করা যায় না। ব্যাণ্ডেজের তলা দিয়ে তবু চু'ইয়ে বেরোয়। কিছুটা পরেই রক্ত বন্ধ হয়ে যায়।

দিন কয়েকের মধ্যেই নতুন মানুষ হবে। এলি বলে।

তারও আগে। ফিসফিস করে বলে চার্লি,—আজ রাত্রেই বৃষ্টি থামবে এলি। আমি ঠিক বলতে পারি। তারপর পৃথিবীতে শান্তি আসবে।

আমরা মাথা নেড়ে সায় দিই। চার্লি'র সঙ্গিনী আলাদা একটা বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। শুনতে পাই, আস্তে আস্তে প্রার্থনা করছে সে।

আমি কেনটনের কাছে যাব। সে বলে,—কোন মতেই কেনটনকে ছেড়ে থাকা আমার উচিত হবে না।

সে রাত্রে আমি পাহারা দিতে যাই। পশ্চিমা বাতাসে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। পৃথিবীর মাথায় ঝুলছে অগুনিত নক্ষত্রের আলো।

ধীরে সুস্থে পায়চারি করছি। মাটির রঙ বদলে গেছে।...খোলস বদলে যেন এক নতুন পৃথিবী যেন জন্ম নিচ্ছে। মাটির ওপরের অধিকাংশ জায়গার বরফ গলে গেছে। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে জমা স্তূপাকার বরফ এখনও সেখানে জমে রয়েছে। আস্তে আস্তে গলে গলে পড়ছে। বাতাসের গতি মৃদু অথচ ঠাণ্ডা।

নরম মাটিতে পা ডুবে যাচ্ছে। নীচু হয়ে আমি বরফ চাপা এক চাপড়া হলদেটে শুকনো ঘাস স্পর্শ করি। আঙুল দিয়ে একটি ঘাসের ডগা ছিঁড়ে আনি।

দ্বিতীয় সান্ত্রীর সাথে দেখা হয়। দুজনে চুপচাপ একসাথে দাঁড়িয়ে থাকি। অপেক্ষা করি তৃতীয় সান্ত্রীর জন্য। স্বপ্নাবিষ্টের মত মাথা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সে এগিয়ে আসে।

বাতাসে নতুন ঋতুর গন্ধ ..বাতাসও হালকা হয়ে উঠেছে।

বসন্ত আসছে।

আবার সবুজ ঘাস গজাবে—বইবে গরম হাওয়া। মাঠে মাঠে ফলবে ফসল।

চাষ আবাদের এইটাই ঠিক সময়। আর দেরী করলে চলবে না।

লাঙলে ঘোড়া জুড়বার আর জমিতে লাঙল দেবার চমৎকার সময় এটা। নতুন উলটানো মাটির গন্ধ কি মধুর।

লোকাস্ট গাছেই প্রথম ফুল ফোটে। নদীর পার বরাবর আমাদের বাড়িতে প্রচুর লোকাস্ট গাছ। পেনসিলভানিয়া মুলুক জুড়ে জন্মায় এই গাছ।

তুমি তো মোহকের লোক আলেন। তোমাদের দেশে নাকি খুব ভাল ফসল আর ভাল ফলের বাগিচা হয়?

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই। আমার এলির আর জেকবের সাময়িক চাকুরীর মেয়াদ শিগগিরই শেষ হবে। এখন আমাদের দল এই তিনজনেই ঠেকেছে।
তুমি বাড়ি চলে যাবে আলেন ?
অবাক হয়ে আমি পেনসিলভানিয়ার লোকটির দিকে তাকাই। বলি, অনেক দূর—একলা হেঁটে যাওয়া অসম্ভব।
আর কেউ যাবে না তোমার সঙ্গে।
জানি না।
বসন্তের ফুল ফুটলেই শুরু হবে লড়াই। পেনসিলভানিয়ানদের একজন বলে,—আবার শুরু হবে সৈন্য চলাচল।
শুনলাম হাউ নাকি আমাদের এই ছাউনি আক্রমণ করবে ?
বুড়ো জেনারেল আমাদের এখানে রাখবেন বলে মনে হয় না। তিনিও নিশ্চয় বেরিয়ে পড়বেন।
কি আছে আর এই পল্টনের।
যা বলছি দেখ, আবার নতুন নতুন লোক আসবে। চাষ-আবাদের পর শত শত লোক আসবে দেখ।
এক জার্মান ব্যারন নাকি তাদের শেখাবে।
বাতাসটা কেমন লাগছে দেখ।
হাঁ গরম গরম লাগছে। কেমন একটা অদ্ভুত গরম আমেজ আছে। দক্ষিণ-পশ্চিমের বাতাস বইছে।
কাল বেশ পরিষ্কার রোদ উঠবে।
হাঁ, বেশ গরম রোদ উঠবে !
বরফের ধাক্কায় নদীর পুলটা ভেঙে গিয়েছিল। মেরিল্যাণ্ডের লোকজন গলা জলে দাঁড়িয়ে আবার পুল সেরেছে।
মেরিল্যাণ্ডের লোকগুলোকে দেখতে পারি না।
না, বরফ জলে দাঁড়ান লোকদের হিংসে কর না।
আবার আমরা আলাদা হয়ে যাই। হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাবণ জানিয়ে আবার নিজ নিজ জায়গায় ফিরে এসে পাহারা দিতে শুরু করি। মাটি থেকে পা টেনে তুলবার সময় একটা প্যাচ্‌প্যাচ্‌ শব্দ হয়। কামানের ঘাঁটির কাছে এসে আমি একটি কামানের মুখে হেলান দিয়ে দাঁড়াই। কামানের মুখের ঠাণ্ডাটা হাতে বেশ ভালই লাগে। এর মধ্যেই এত পরিবর্তন আমার হয়েছে যে দারুণ শীতের পরেও ঠাণ্ডা উপভোগ করতে ভাল লাগছে।
বাড়ি যাবার কথা মনে পড়ে। এলি জেকব এবং আমি তিনজনেই যাব। মনে মনে মোহক উপত্যকার কচি সবুজ ঘাসের প্রান্তরের ছবি আঁকবার চেষ্টা করি। মনে হয়, আগের দিন আর ফিরবে না। বেশ বুঝতে পারি, সে জীবন থেকে কেমন যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। চোখ বুজে ভাববার চেষ্টা করি, আমি যেন লাঙল দিচ্ছি আর নরম মাটি চিরে যাচ্ছে। তারপর আবার মাথা ঝাঁকাই। নিজের মনের অস্বস্তি যায় না। ভয়,হিংসা কি দুঃখ কিছুই এ অস্বস্তি ঘুচাতে পারবে না। নিরন্তর এগিয়ে চলাই আমাদের বিধিলিপি।

জেকব এসে আমাকে ছুটি দেয়। আস্তে আস্তে হাঁটে সে। আমার দিকে তাকায়না। বলে, পরিখায় যাও আলেন।
ভারি সুন্দর রাত, না জেকব? পশ্চিমা বাতাস টের পাচ্ছ?
সে মাথা নাড়ে।
বেশ গরম হাওয়া। গত গ্রীষ্মের একটা ঘাসের পাতা আমি কুড়িয়ে পেয়েছিলাম জেকব। আকাশও নীল হবে, না জেকব?
তারপর আমি আস্তানায় ফিরে আসি। ঢুকে মনে হয়, কি যেন একটা হয়েছে। তারপর দেখি, চার্লি'র সঙ্গিনী হাঁটু ভেঙে তার বিছানার পাশে বসে আছে। আমি আগুনের কুণ্ডর কাছে গিয়ে বসি। চেয়ে থাকি আঁকাবাঁকা শিখার দিকে। গোটা শীতকালটা রাতের পর রাত এমনি আগুন জ্বলেছে।
এলি বলে, এখনও সইতে হবে আলেন।
মনে পড়ে ওয়াশিংটনের কথা। আর কত সইতে পারা যায়? নবাগতের মত কৌতুহলী চোখে আমি পরিখার ধোঁয়ায় কালো গাছের গুঁড়ি, মেঝের সঞ্চিত ময়লা, দুই তাকের সাজান দেয়ালে লাগানো বিছানা এবং কাঠের গোঁজে ঝুলান খান কয়েক ছেঁড়া ন্যাকড়ার দিকে তাকাই। বন্দুকের তাক আছে একটা। সেখানে মস ফুলার, ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার, হেনরি লেন, আরন লেভি, কেনটন ব্রেন্নার, এডওয়ার্ড ফ্লাগ, মেয়ার স্মিথ এবং চার্লি গ্রীনের বন্দুক পাঁজা করা আছে।
নাম ডাকলে বন্দুক তার হয়ে জবাব দেবে। প্রত্যেকটি এক একজনের প্রতীক। চার্লি'র বন্দুকে রূপোর কাজ-করা। পল রিভারির হাতের কাজ। ক্লার্কের বন্দুক ফরাসী দেশে তৈরী। নল-লম্বা উপত্যকা অঞ্চলের তৈরী বন্দুক আছে গুটি তিনেক।
এলিকে বলি, বৃষ্টি থেমে গেছে।
জানি। শান্তভাবে জবাব দেয় এলি। সেও চেয়ে আছে বন্দুকের দিকে। তার পাক-ধরা মস্ত মাথা হেঁট হয়ে পড়ে।
সে উঠে এসে আমার পাশে বসে। বলে, আজকে রাতে মেয়েদের এখানে না রাখাই ভাল।
আমি থাকব। চার্লি'র বিছানার পাশ থেকে মেরি বলে ওঠে।
আমি আমার সঙ্গিনীকে বেরিয়ে যাবার ইশারা করি। সে দরজার দিকে এগোয়।
ওদের বল যে তুমি আলেন হেলের সঙ্গিনী। তাহলেই থাকতে দেবে।
সেও বেরিয়ে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল। মেয়েটি চলে যাবার পর ছোট্ট পরিখাটি কেমন শূন্য শূন্য লাগে।
এলি, মনে পড়ে উপত্যকা অঞ্চল থেকে প্রায় তিনশো জন এসেছিলাম আমরা।
জানি।
একজনও কি ফিরতে পারবে?
পরদিন চার্লি গ্রীনকে কবর দেওয়া হল। ডালপালা সহ গাছ দিয়ে তৈরী রক্ষা ব্যূহের সামান্য দূরে পাহাড়ের গায়ে তাকে সমাধিস্থ করা হল। এমন জায়গায় আমরা তাকে শুইয়ে রাখলাম যে ফিলাডেলফিয়ার কাছাকাছি নীল গিরিমালা চিরদিন তার চোখে পড়বে।

ম্যাসাচুসেটসের জব এনড্রুজ একটা জিনিস দেখে যাবার জন্য চীৎকার করে আমাদের ডাকতে থাকে। শিশুর মত উৎফুল্ল হয়ে পাহাড়ের পাশ দিয়ে সে ছুটে যায়। আমরা তাকে ঘিরে ধরি। সে হাতের নরম লাল টাটকা ফুলটি দেখায়। বলে, এই প্রথম দেখলাম, শীতকালের ফুল।
ফুলটি নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে। অবশেষে হাতে হাতেই সে-টি টুকরো টুকরো হয়ে যায়। নাকের কাছে নিয়ে সবাই গন্ধ শুঁকবার চেষ্টা করে। আমরা পরম যত্নে ফুলটিকে নাড়াচাড়া করি।
একটিই পেলাম। জব বলে।
পরে আরও পাওয়া যাবে।
নদীর পারে এমনি ফুল দেখেছি।
নীল আকাশের বুকে মেঘ পাক খাচ্ছে। আমরা তখন প্যারেডের মাঠে যাই। ফুরফুরে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে পশ্চিম থেকে। ছড়িয়ে দিচ্ছে বসন্তের সৌরভ। কারও গায়ে আর গ্রেটকোট নেই।
সৈনিকেরা সার বেঁধে দাঁড়ায়। ড্রাম বাজতে শুরু করে। ঘোড়ায় চড়ে স্টুবেন মাঠে আসেন। এত দিনে ভালবাসবার মত একটা লোক পাওয়া গেছে। আমাদেরই মত কঠোর অমার্জিত চালচলনের লোক তিনি। মাটির কাছের মানুষ। তাহলেও মেয়েদের মত শান্ত আর ধৈর্যশীল।
ঘোড়া থেকে নেমে তিনি সৈন্যদলের দিকে হেঁটে আসেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজী রপ্ত করেছে লোকটি। হামেশাই তা ব্যবহার করেন। বলেন, খোকারা শোন।
আমরা হেসে উঠি। লোকটি আমাদের নতুন করে হাসতে শিখিয়েছে। ভগ্নোদ্যম কয়েক শ' সৈনিক আমরা। তবু তিনি আমাদের শ্রদ্ধা করেন। এ এক নতুন অভিজ্ঞতা।
খোকারা শোন। আজ আমরা মার্চ করতে শিখব। যেখানে যেতে চাই, যা দখল করতে চাই, কি করে তা করতে হবে তাই আজ শিখব। ব্রিটিশদের যা আছে সব দখল করব, কেমন?
আমরা তার নকল করে বলি : ঠিক ঠিক ব্যারন।
গ্রাণ্ড প্যারেডের মাঠে তখন কুচকাওয়াজ শুরু হয়। আমরা এখন পা তুলবার কায়দা শিখেছি —চলতে শিখেছি প্রুশিয়ান কায়দায়। সুশৃঙ্খলভাবে ঘেষাঘেষি করে চলতে শিখেছি আমরা। দশজনে চলেছি একজনের মত। বেয়নেট ব্যবহারের কায়দাও রপ্ত করে নিয়েছি।
তিনি আমাদের অনুনয় করে বলেন, খোকারা শোন! বেয়নেট দিয়ে তো আর রান্না করবে না! দোহাই, বেয়নেটগুলো সাফ-সাফাই করে রেখ।
ব্যারন আমাদের বসতে বলেন। স্টাফ অফিসারদল আপত্তি জানায়। তাকে পাগল বলে উপহাস করে। আমরা তো জানোয়ার। যেটুকু শৃঙ্খলা আছে, তিনি নাকি তাও নষ্ট করছেন। প্যারেডের সময় লোকে বসে নাকি?
স্টুবেন বুঝতে পারেন না। বারে বারে মাথা ঝাঁকান। জার্মান ভাষায় বলেন, গণতান্ত্রিক দেশের নিয়ম কানুন আলাদা বলেই আমার ধারনা।

আমরা যুদ্ধরত ব্যারন।
জানি জানি। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমারও আছে। এ আমার নিজের কায়দা। ওরা বসুক।
উৎসুকভাবে তাঁর দিকে চেয়ে আমরা ছড়িয়ে পড়ি। তিনি বলেন, আমি তোমাদের বেয়নেট চালাবার কায়দা দেখিয়ে দিচ্ছি। সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে হেঁটে হেঁটে তিনি পছন্দসই একটা বন্দুক ও বেয়নেট খোঁজেন, হাঁটতে হাঁটতে তাঁর ক্রোধ বেড়ে যায়। এক একটি বন্দুক পরীক্ষা করেন আর বিরক্তিভরে ফেলে দেন। অবশেষে চেঁচিয়ে বলেন, দুত্তোর ছাই! কেন যে এই অভিশপ্ত দেশে এসেছিলাম? কেন যে এলাম এই চাষীর দেশে! রাগের চোটে তিনি গটমট করে চলতে থাকেন। আমরা নিরুত্তেজ ভাবে তাঁর ভাবসাব লক্ষ্য করি। জানি রাগ পড়বে। বহুত রাগ দেখেছি। খাঁচায় ভরা জন্তুর মত গোটা শীতকাল কাটিয়েছি।...জনকয়েকের মাথা খারাপ হয়ে গেছে।
ব্যারনের রাগ পড়ে। বেয়নেট শুদ্ধ একটা বন্দুক নিয়ে তিনি আমাদের সামনে যান। আমাদের সেলাম করে বলেন, ভাল করে লক্ষ্য কর ছেলেরা।
ড্রিল করবার সময় তাঁর মত বেঁটে মোটা লোককে বিচ্ছিরি দেখায়। তাঁর পেছনে আমাদের ফৌজদারদের একটি দল। ক্ষোভ ও কৌতূহল ভরে তারা চেয়ে থাকে। স্টুবেন পেছনে হটে যায়···বোঁ করে ঘোরেন এবং বেয়নেট উঁচিয়ে আমাদের দিকে রুখে আসেন। শূন্যে খোঁচা মেরে তিনি বাঁকা ভাবে মোচড় দেন? তারপর বেয়নেট টেনে আনেন।
ঠিক এইভাবে বুঝলে? ইংরেজরা আনাড়ী বোকা। প্রথমে বেয়নেটটা উঁচিয়ে ধরবে, তারপর একটু এগিয়ে যাবে—তারপর আচমকা বসিয়ে দেবে। আর একবার বেয়নেট বসাবার কায়দাটা দেখিয়ে দেন তিনি। আমরা হেসে কুটি কুটি হই। চেঁচিয়ে বলি ঃ আবার ব্যারন, আবার!
জেনারেল হাউর নাম করে আর একবার দেখান না ব্যারন।
সবটা আর একবার দেখান ব্যারন।
আমাদের হাসি দেখে তিনি চটে যান। তারপর নিজেই হাসিতে যোগ দেন। হাসতে হাসতে তার হাঁপ ধরে যায়!
হাঁ, এইবার উঠে পড়। এটেনশন্!
আবার সৈনিকেরা সার বেঁধে দাঁড়ায়। আবার শুরু হয় অন্তহীন ড্রিল। বন্দুকের তাক কর ···চার পা এগোও···বসিয়ে দাও। চার পা এগিয়ে বসাতে হবে। প্যারেডের মাঠের সর্বত্র আমরা মার্চ করে ঘুরে বেড়াই। এ কুচ্‌কাওয়াজের যেন শেষ নেই। চলছে তো চলছেই। শেষ অবধি আমাদের মাথা ঘুরতে শুরু করে। বার বার শূন্যে বেয়নেট বসিয়ে হাত পাকাই। জীর্ণবাস সৈনিকদল নতুন করে তার কথা শোনে।
স্টুবেন ক্লান্তিহীন। শুধু এই ড্রিল করানোই তিনি জানেন বলে মনে হয়। সকাল নেই, দুপুর নেই, রাত্রি নেই—সব সময় তিনি ড্রিল করাচ্ছেন। বুঝিয়ে দিচ্ছেন কি করে বেয়নেট সাফ করতে হবে। বন্দুকের চকমকি ঠিক রাখবার জন্য কি করতে হবে আর কি করেই বা চট করে গুলি ভরবার জন্য বারুদ ভাগ করে রাখতে হবে—তা-ও বুঝিয়ে দেন তিনি।
একবার তিনি আমাদের আস্তানায় আসেন। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ড্রিলের পর বিছানায় শুয়ে আমরা বিশ্রাম করছি। তাকে ঢুকতে দেখেই চটপট উঠে দাঁড়াই। তিনি জার্মান

ভাষায় বলেন, বস। আমার অনুরোধ, বস। জার্মান বোঝ ?
আমারা মাথা ঝাঁকাই। উৎসুক চোখে তিনি আস্তানার সব কিছু লক্ষ্য করেন।
সারা শীত এইখানেই ছিলে ?
হ্যাঁ।
আমাদের বন্দুকের তাকের দিকে ফিরে তিনি মনে মনে এক-দুই করে গোনেন। ঠোঁট দুখানা নড়তে থাকে।
আর যারা ছিল তারা কোথায় ?
মরে গেছে।
আক্ষেপে মাথা নাড়াতে নাড়াতে তিনি আগুনের কাছে গিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। বিড়বিড় করে বলেন, অনেক বিভীষিকা দেখলাম। মানুষের এমন দুর্দশা দেখেছি যে···
ড্রিল যথারীতি চলতে থাকে। আমাদের স্বপ্নের রঙ লেগে আকাশ নীল হয়। শুয়েলকিলের পারে লোকাস্ট গাছে সবুজ কুঁড়ি দেখা দেয়। চার্লি গ্রীনের কবরের বাদামি মাটিতেও অগুনতি নতুন অঙ্কুর গজায়।

এলির সঙ্গে পাহারায় বেরিয়েছি। বেশ পরিষ্কার ঠাণ্ডা রাত। দুজনে একসাথে চার্লি'র কবরের দিকে হেঁটে যাই। নীচু হয়ে কবরের মাটি থেকে একটা ঘাসের পাতা ছিঁড়ে আনলাম। তুলে ধরে দেখালাম এলিকে। হাতে নিয়ে সে একদৃষ্টে ঘাসের পাতাটির দিকে চেয়ে থাকে।
আমি বলি, ভেবেছিলাম চার্লি আমাদের সঙ্গেই থাকবে। ও যে মারা যাবে একথা ভাবতেই পারিনি।
এলি চিন্তিতভাবে বলে, এমন শীত আর হবে না। যেদিন তুমি ভূমিষ্ঠ হলে, সেদিন তোমার বাবার সঙ্গে আমি তোমাদের বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম। তোমার মা সে কি করুণ আর্তনাদ করছিলেন! সারারাত তিনি ব্যথায় ছটফট করলেন। সকালবেলা তুমি ভূমিষ্ঠ হলে।
একমনে আমি তার কথা শুনে যাই। মনে হয়, বেশ বুড়োলোক এলি···অতীত পুরনো দিনের মানুষ।
এই বেজায় শীত···আমাদের এই দারুণ কষ্টের মধ্য থেকে একটা কিছু নিশ্চয়ই হবে আলেন। কি হবে জানি না। লেখাপড়া জানা লোক আমি নই। কিন্তু আমরা এর জন্ম দিয়েছি, বুঝলে ?
আমিও বলতে পারব না।
তুমি ছেলেমানুষ আলেন। আমার বা জেকবের জন্য নয়, তোমরা নিজের জন্যই একটা কিছু গড়ে তুলছ।
কি, এলি ?
একটা নতুন জীবন ধারা। মানুষের জন্য এক নতুন জগত। সুদূর পোলাণ্ড থেকে ইহুদিটি এসেছিল তার খোঁজে। যারা প্রাণ দিয়েছে···

কার জন্য ? আমি জানতে চাই। কর্তারা নিজেদের ভুঁড়ি ভরছে, কিন্তু আমাদের করে রেখেছে উপোসী।
পল্টনে কাজের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তুমি বাড়ি ফিরে যাবে আলেন ?
ঘাড় ঝাঁকানি দিয়ে আমি বিস্ময় প্রকাশ করি।
তুমি একটা কিছু খুঁজছ আলেন। খুঁজে বার কর। তার জন্য জোয়ান লোক চাই।
আমি ভাবছি এলির মত জোয়ান লোকের কথা। ভাবছি মস, কেনটন, চার্লি'র কথা। আজ হোক কি দুদিন বাদে হোক, আমার পালাও শিগ্‌গিরই আসবে। এলিকে বলি, হা ভগবান, বাড়ির জন্য মন আনচান করছে।
সে মাথা নেড়ে সায় দেয়।
সে টান যে কি তা আমার জানা আছে আলেন।
তুমিও আমার সঙ্গে যাবে এলি ? সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করি। তুমি আর জেকব, তিনজনেই আবার আমরা মোহক ফিরে যাব কি ? আমি তার হাত চেপে ধরি।
বহু লোক এখানে প্রাণ দিয়েছে আলেন ! মাথা ঝাঁকিয়ে সে বলে।
কিন্তু কেন এলি, কেন আমরা এইভাবে চলব ? আমার ভয় করছে এলি।
তখন সে মৃদু স্বরে বলে, তুমি একাই ফিরে যাও আলেন। যদি যাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তো ফিরে চলে যাও।
আমরা আবার উল্টো দিকে চলতে থাকি। বার বার ফিরে এলির শীর্ণ দেহের দিকে তাকাই। বার্দ্ধক্যের ছাপ পড়েছে তার চেহারায়। এলির রহস্যময় অনুভূতি আমায় প্রচণ্ড নাড়া দেয়। আমার চিন্তা চেতনার দুনিয়ার ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে সে অনুভূতি।
পরদিন আমি জেনারেল ওয়েনের বাসায় যাই। এই খেয়ালের ফলাফল না ভাববার চেষ্টা করি। চার্লি গ্রীনের কবরের উপর সবুজ অঙ্কুর মাথা ঠেলে উঠছে। সে কথাও ভুলে থাকবার চেষ্টা করি।
ওয়েন ডেস্‌কের পাশে বসে লিখছেন। আরদালি আমায় ভেতরে নিয়ে যায়। তিনি মাথা তোলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুরু কুঁচকে ওঠে। বেশ বুঝতে পারি আমায় চিনেছেন। জিজ্ঞাসা করেন, তোমার কি চাই ?
আবার পল্টনে থাকবার জন্য কাগজ পত্রে সই করতে এসেছি স্যার।
একদৃষ্টে তিনি আমার দিকে চেয়ে থাকেন। আরদালি চলে যায়। বসে বসে অনেকক্ষণ তিনি অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। লক্ষ্য করেন আমার ছেঁড়া নোংরা জামা-কাপড়।
তোমার নাম আলেন হেল ? খাপছাড়াভাবে জিজ্ঞাসা করেন তিনি।
হ্যাঁ স্যার।
রেজিমেন্টের নাম ?
চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া।
ডেস্‌ক থেকে একখানা কাগজ তুলে তিনি গম্ভীরভাবে আমার দিকে চেয়ে থাকেন। তারপর বলেন, পালাবার সময় যে মেয়েটি সঙ্গে ছিল, তাকে ভালবালবাসতে ?
আমি জবাব দিলাম না। চকিতে নিজের কথা মনে পড়ে। বেসের সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে চাই না। আজকে সে আমার বড় কাছে এসেছে। আরও কাছে আসবে।

পল্টনে থাকতে চাইছ কেন ? ওয়েন জিজ্ঞাসা করেন।

এর জবাব দিতে পারি না। তাকে বোঝাবার মত ভাষা আমার নেই।

অনেক কষ্টই তো ভুগেছ, তাই না ? ওয়েন জানতে চান। তার কণ্ঠস্বর গাঢ় হয়।

আমি কষ্ট পাইনি। আস্তে আস্তে বলি। যারা পেয়েছে তারা বেঁচে নেই। আমি তাদের তুলনায় কিছুই পাইনি।

ওয়েন উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসেন। হাতখানা বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, তুমিই আমাকে চিনেছ।

আমি তার হাতে হাত দিই।

তারপর ধীরে ধীরে পরিখায় ফিরে আসি। পেনসিলভানিয়ার ঘাঁটির আশেপাশে পাহাড়ের উপর নতুন ঘাস নজরে পড়ে। খাঁটি ফিকে হলদেটে সবুজ ঘাস। মাঝে মাঝে বেগনি ফুলের কুঁড়ি।

পাহাড়ের মাথায় চড়ে চারিদিকে তাকাই। সারা গ্রামাঞ্চলে আর গড়ানে পাহাড়ের গায়ে সবুজের আভাষ। আকাশ এত নীচু হয়ে এসেছে যেন হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায় বলে মনে হয়।

আস্তানায় ফিরে এলিকে বলি, ওয়েনের অফিসে গিয়েছিলাম। শিগ্‌গিরই বাড়ি যাব ?

জেকব উৎসুক দৃষ্টিতে আমায় লক্ষ্য করছে। তার লম্বা কালোপানা মুখে বিষণ্ণতার ছাপ। বারেকের জন্য তার দৃঢ় সংবদ্ধ কঠোর মুখের সহজাত কাঠিন্য ঢিলে হয়ে যায়। মনে হয়, এই ছোট্ট পরিখায় সে যেন নীরব রাজকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যে সব লোক প্রাণ দিয়েছে তাদের সবাইর শক্তি যেন সংহত হয়েছে জেকবের মধ্যে। এখন তার ছাপ নেই। নিঃসঙ্গ সে। সহনশীলতা মোটেই নেই। বেশ দেখতে পাচ্ছি, আজ হোক কি দুদিন বাদে হোক, অন্ধ ক্রোধের বিদ্যুত চমকে সে উল্কার মতো ছুটে বেরুবে এবং দুর্বার বেগে ছুটে যাবে নিজের পথে। আজকে আচমকা হয়ত বুঝতে পেরেছে যে, সে একলা। ওয়াশিংটনের মত গোটা বিপ্লবের ভার যেন সে নিজের কাঁধে বইছে। তার কাঁধের দৃঢ়তা দেখতেই কথাটা মনে হয়। গোটা শীতকালে সে একবারও কাঁধ ঝাঁকায়নি কিম্বা বারেকের জন্য নীচু হয়নি। তারপর তাকে ইহুদিটির সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। অকস্মাৎ মনে হয়, অদ্ভুত আদর্শের মিল রয়েছে এদের দুজনের।

আমি বাড়ি যাচ্ছি না। ছাড়া ছাড়া ভাবে বলি,—আবার তিন বছরের জন্য নাম লিখিয়েছি।

জেকব মাথা ঝাঁকায়। এই-ই প্রথম তার চোখে আমি মানুষের জন্য দরদ উথলে উঠতে দেখলাম !

ভাল করনি আলেন। এলি বলে।

জেকব একখানা বিছানার প্রান্তে বসে পড়ে। বড় নিঃসঙ্গ বেচারী। তার পেছন শূন্য বিছানার সারি। তার দৃষ্টি নীরবে আস্তানার চারিদিকে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়ায়। জানে আমি আর এলি ছাড়া কেউ নেই। তবু খোঁজে অন্য কারও দেখা পায় কিনা। বন্দুকের তাকটার দিকে নজর পড়তেই সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। মনে হয়, বন্দুকগুলো গুনছে।

ভাল করনি আলেন। আবার বিষণ্ণভাবে বলে এলি,—আমিই ভুল করেছি।

বাড়ি ফিরবার কি হয়েছে আমার ?

আবাদের মরশুম আসছে। আত্মীয় স্বজন তোমাকে পেতে চাইবে। আমার জন্যই তুমি পল্টনে এসেছ আলেন···আমার কথাতেই রয়েছ এখানে।

আমি বোঝাবার চেষ্টা করি। সহসা বিরক্তি লাগে। আর বোঝাতে ইচ্ছে করে না। বাইরে গিয়ে রোদে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে হয়। বলি, সে সব চুকেবুকে গেছে। আর আমাদের মধ্যে কেউ ফিরে যেতে পারি না এলি।

জেকব মাথা ঝাঁকায়।—বছরের পর বছর লড়াই হবে। ভগবান্ জানেন, কতদিনে এর শেষ হবে।

আমি বেরিয়ে পড়ি। বেশ বুঝতে পারি যে ভিন্ন প্রকৃতির দুজন বৃদ্ধকে রেখে যাচ্ছি। বড্ড অস্বস্তি লাগে। দুঃখও হয়। আমিও একলা।

গাছের মধ্য দিয়ে হেঁটে একটা খেলার মাঠে আসি। ছোট্ট খোলা জায়গাটিতে রোদ পড়েছে। সেখানেই শুয়ে পড়ি। মাটি বেশ ঠাণ্ডা। তবু খুব ঠাণ্ডা নয়। রোদের তাতে শরীরটা চাঙা হয়।

অনেকক্ষণ শুয়ে আকাশে মেঘের খেলা দেখলাম। খণ্ড খণ্ড জোট বাঁধা মেঘ উড়ে যাচ্ছে আকাশ পথে। বেসের কথা মনে পড়ে। হারানো সঙ্গিনী বলে তাকে মনে হয় না। মনে হয় আবার একদিন অমনি একটি মেয়ের দেখা পাব। তাকে ঘৃণা করত যে যুবক সেই আলেন তার কথা মনে পড়েও দুঃখ হয়। এখন কিন্তু কোন ঘৃণা বা ক্রোধই আমার মধ্যে নেই। বেসের উপরও না, কিম্বা যে আলেনকে সে ভালবেসেছিল তার উপরও না।

দাড়ি কামাচ্ছি আমরা। এক বোঝা চুল কমে যায়। একজন চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে, তখন আর একজনে তাকে কামিয়ে দেয়। ছুরিতে মাঝেমাঝেই চামড়া কেটে ছড়ে যায়।

তারপর পায়ের পট্টিও খোলা হয়। অগুনতি ব্যাণ্ডেজ পড়ে থাকে এখানে-সেখানে। নোংরা জমে সবাইর পা কালো হয়ে গেছে। পট্টি খুলে খালি পায়ে খুঁড়িয়ে চলাফেরা করি।

পেনসিলভানিয়া আর মাসাচুসেটসের দু'তিনশো লোক ক্রিক উপত্যকা বরাবর উলঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়ে। ছাই বালি দিয়ে জামা কাপড় সাফ করে শুকোবার জন্য গাছে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। এ যেন ভিখারী বা যাযাবরদের জামা কাপড়ের প্রদর্শনী। গোটা জায়গা বরাবর ছেঁড়া ব্রিচেস আর কাগজের মত পাতলা কোট ঝুলছে। বরফের মত ঠাণ্ডা হলে গড়াগড়ি করে আমরা রোদে গা শুকোই। এখনও রোদ কড়া হয়নি। প্রথম প্রথম রোদে পুড়ে গা লাল হয়ে পিঠে ফোসকা পড়ে। তারপর গায়ের চামড়া ক্রমে বাদামি হয়ে যায়। সহসা সবাই যেন সূর্য-উপাসক হয়ে পড়েছি। দীর্ঘদিন ধরে যেমন টনিক খাওয়া হয়, তেমনিভাবে রোজ কয়েক-ঘণ্টা করে আমরা রোদে পড়ে থাকি সারা গায়ে রোদ লাগাই। চোখে মুখে তপ্ত নোনা ঘাম গড়িয়ে পড়ে। ঘামে ভিজে ভালই লাগে।

জলের মধ্যে পা ঝুলিয়ে আমরা নদীর পাড়ে বসে থাকি। পরম আগ্রহে নিজেরা গা ঘষা-মাজা করি। চুল থেকে উকুন বাছি। শীতকালের সঞ্চিত ময়লা উঠে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কৌতুহল ভরে লক্ষ্য করি। শীর্ণকায় অস্থিসার চোখ

বসা অদ্ভুত এক জনতা। রহস্যচ্ছলে আমরা ভার্জিনিয়ায়নদের গালাগাল দিই। বসন্তের জলে ঘৃণা ধুয়ে মুছে যায়। ধুয়ে যায় উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের ব্যবধান। অনেক দিন তো একসাথে সবাই দুঃখ দুর্ভোগ ভোগ করেছি।

আমি এলির পা ধুইয়ে দিই। অবাক হয়ে সে চেয়ে থাকে নিজের পায়ের দিকে। যে করেই হোক তার পায়ের ক্ষত শুকিয়ে এসেছে। লম্বা তাজা ঘায়ে ময়লা লেগে আছে; কিন্তু পুঁজ রক্ত পড়া এখন বন্ধ হয়ে গেছে। আপনা থেকে আবার পচ-ধরা ক্ষতে নতুন মাংস জোড়া লাগছে। শুকনো চামড়া গুলোও শিগগিরই খসে যাবে। মরা সাদা চামড়ার তলায় নতুন মাংস গজাচ্ছে। আজকের জেগে-ওঠা দুর্বল শিরায় বইবে নতুন রক্ত। এমন করে এলি নিজের পায়ের দিকে চাইছে যেন আগে কোনদিন দেখেনি। জলের মধ্যে কয়েক পা হেঁটে সে পারে উঠে বসে থাকে। আমাকে কিছু বলতে চায় কিন্তু পারে না। যেন গলায় আটকে যায়। সে বসে বসে পা দোলায়। চেয়ে থাকে নিজের পায়ের আঙুলের দিকে। শেষ অবধি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, আমার দাড়িটা কামিয়ে দেবে আলেন? মুখটা সাফ-সুরৎ করতে বড্ড ইচ্ছে করছে।

দাড়ি কামাবার সময় সে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকে। তার গোঁফ দাড়ি কামান মুখখানা দেখতে অদ্ভুত লাগে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে বসন্তের বাতাস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছে। মাথার উপর ঝরে পড়ছে ডগউডের ফুল!

আমি শুয়ে পড়ি। গালের উপর ছুরি চলবার সময় চোখ বুজে থাকি। গোঁফ কামাবার সময় বেশ লাগে। বারবার জলে ডুবিয়ে ছুরিখানা ধুয়ে নেয় এলি। আবার গালে ঠেকাতেই পরিচ্ছন্ন ছুরিখানা বেশ ঠাণ্ডা লাগে। আস্তে আস্তে এলি আমার দাড়ি কামিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুরোণো কষ্টকর কয়েক বছর যেন জীবন থেকে ঝড়ে পড়ে। আবার ফিরে আসে তরুণ বয়স। আমার চামড়া টান টান লোমহীন পরিষ্কার হয়ে ওঠে। একচোট কামাবার পর দাড়ির গোড়া নরম করবার জন্য আঙুল দিয়ে উলটো ভাবে গাল ঘষে দেয় এলি। এই সংবাহণে ঝিমানি আসে। চোখ মেলে দেখি, আর একবার ছুরি টেনে সে কাজ সেরে ফেলেছে! আমার দিকে চেয়ে মাথা নাড়িয়ে জানায় যে কামান শেষ।

এরপর ছেলেমানুষের মত আমরা জলের মধ্যে খেলা করি। হাতে জল নিয়ে একে অন্যের গায়ে ছুড়ে মারি। হাঁসের মত পরস্পর পরস্পরের পেছনে ছুটাছুটি করি। গর্তের মধ্যে পা ভরে নাচানাচি করবার মত দুচারটে গভীর গর্তও খুঁজে বার করা হয়। দুটো কাঠের বালতিও যোগাড় হয় এবং মাসাচুসেটসের সৈনিকেরা একটি জলটানা দল গড়ে। লাইন করে আমরা তাদের মধ্যে দিয়ে হেঁটে যাই আর তারা জল দিয়ে আমাদের নাইয়ে দেয়। ভারি মজা লাগে। মাসাচুসেটসের দলটি ক্লান্তিতে অবশ হয়ে না পড়া অবধি এই খেলা চলে। তারপর গা শুকোবার জন্য সবাই রোদে শুয়ে গল্প বলে। ব্রিটিশ ও আমাদের অফিসার এবং তাদের গৃহিনীদের খোঁজখবর নিয়ে হাসি ঠাট্টা করি।

তারপর ছেঁড়া জামা কাপড় পরে খালি পায়ে সবাই ফিরে আসি। আসবার সময় সবুজ ঘাসের উপর পা ঘষি। কোন ফুল চোখে পড়লেই নীচু হয়ে সেটা তুলে নিই এবং দাঁড়িয়ে গন্ধ শুঁকি। তারপর চুলে ফুল গুঁজে নেচে বেড়াই। যেন পৌত্তলিক কোন অনুষ্ঠান করছি, অথবা শিশুদের মতো। খেয়াল খুশি মত যা তা করে চলেছি এবং তার

জন্য কারও মনে বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নেই।

ড্রিলের ফাঁকে ফাঁকে আমরা রোদে পোহাই। তবে সে সুযোগ বড় বেশী জোটে না। আমাদের দেহ যেন জল ভর্তি স্পঞ্জের মত। এত রোদ গায়ে লাগিয়েও সাধ মিটছে না। মনে হয় আরও খানিকটা জল শুকোলে ভাল হয়। শুয়ে শুয়ে আমরা হাসি-গল্প করি। কিন্তু শীতের কথা কেউ তোলে না। সে-টা বড় বেশী দুঃখের নিকট কালের জিনিস।

মেয়েরাও সুন্দর হয়ে সাজবার চেষ্টা করে। কারও পুরো পোশাক বা একটা টুপি নেই। তবু তারা মাথায় তারা ফুল গোঁজে···হাসি মুখে আমাদের দিকে চেয়ে ছুটোছুটি করে। তারাও গা ধোয়। একবার নদীতে স্নান করবার সময় তাদের একটি দলকে অবাক করে দিয়েছিলাম আমরা। নগ্ন দেহ ঢাকবার জন্য স্বচ্ছ অল্প জলের মধ্যে বসে পড়ে মেয়েরা। পাড়ে দাঁড়িয়ে ফক্কর ছেলেদের মত আমরা হাসাহাসি ইয়ার্কি করতে থাকি। অবশেষে ছোঁ মেরে জামা কাপড় তুলে নিয়ে তারা ছুট লাগায়। আমরাও ছুটি ওদের পেছন পেছন। হেসে কুটি কুটি হয়ে বনের মধ্যে গড়াগড়ি খাই। শুকনো পাতা দিয়ে ভিজে গা ঢেকে রাখি।

রসদ সহ নতুন নতুন সৈন্যদল শিবিরে আসতে শুরু করে। উত্তর থেকে বিরাট একটা ওয়াগনের ট্রেন হাজার হাজার পাউণ্ড মাংস নিয়ে আসে। স্বেচ্ছাসেনারা তিন মাসের জন্য নাম লেখায়। আমরা তাদের সু-নজরে দেখি না। তারাও খানিকটা ভয় করে নিয়মিত সৈনিকদের। দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করে ওরা। প্যারেডের মাঠে তাদের অনেক ভুলচুক হয়। আমরা কিন্তু সুশিক্ষিত সৈনিকদের মত স্টুবেনের প্রুশিয়ান কায়দায় শেখান কুচকাওয়াজ করে যাই।

ব্যারণ ফন স্টুবেনের দেহের ওজন কমছে। তবু বাপ যেমন ছেলের জন্য গর্ববোধ করে, আমাদের সাফল্যে তিনিও তেমনি খুশি। আমরা তাঁর লোক, পেনসিলভানিয়া লাইনের অর্দ্ধেক লোককে তিনি জানেন—নামও জানেন তাদের।

আমাদের আস্তানার আগুন নিভে গেছে। যাকৃনা। এখন ও সম্পর্কে কারও তেমন আগ্রহ নেই। নিভে যাওয়া আগুনের কুণ্ডর সামনে দাঁড়িয়ে লাঠি দিয়ে ছাই খোঁচাচ্ছে এলি। পরিখার দরজা খোলা। মৃদু মন্দ বাতাস ঢুকে শুকনো ছাই ওড়াচ্ছে। আমরা দুজনেই শুধু আছি আস্তানায়। বেলা পড়ে এসেছে।···গোধুলি হয় হয়। সঙ্গিনী দুটি ভেগে গেছে। চার্লি মারা যাবার পরেই চলে গেছে তারা। আন্নাকে আমি মাসাচুসেটসের লোকদের সঙ্গে ঘুরতে দেখেছি। তাতে কি এসে যায়?

আগুন না থাকলে কেমন খালি খালি লাগে! এলি বলে। ঠাণ্ডার জন্য আমি শোক করছি না, কিন্তু আগুনের মধ্যে প্রাণের পরশ ছিল। ঘরটা এখন খালি খালি লাগছে। বিচ্ছিরি নির্জন জায়গা।

প্রথমে জায়গাটাকে আমি ঘেন্না করতাম। আমি বলি,—কিন্তু এখন আর করি না। অভ্যাস হয়ে গেছে।

সৈনিকেরা বাইরে আগুন জ্বালছে। এলিকে বাইরে যাবার অনুরোধ করি। কিন্তু সে বাইরে বেরোতে চায় না! একলাই তখন বেরিয়ে পড়ি। পেনসিলভানিয়ার সৈনিকেরা আগুন জ্বেলে মাংস রোষ্ট করছে। গোল হয়ে বসে আমরা মদ খাই—গান গাই।

হঠাৎ দেখি কোত্থেকে একটি মেয়ে আমাদের দলে এসে বসেছে। পাতলা চুল গোলগাল যুবতী। তিন চার জন লোক তার দিকে নজর দিচ্ছে। কিন্তু আমিই ভাগিয়ে আনি তাকে। তারপর আগুনের কাছ থেকে সরে যাই এবং খানিকটা দূরে যেয়ে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ি।
তোমার নাম আলেন হেল ? মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে।
কি করে জানলে ?
তোমাকে দেখেছি। শুনেছি তুমি পালিয়েছিলে, আর সেজন্য তোমাকে চাবকে মেরে ফেলবার উপক্রম করেছিল।
তা বটে। .
আমার নাম বেল্লা।
কোন সঙ্গী নেই তোমার ?
ছিল, কিন্তু আমাকে ফেলে পালিয়েছে। আর তার কোন খবর পাইনি।
আমার মত সমর্থ সুন্দর পুরুষকে মেয়েরা না ভালবেসে পারে না, কি বল ?
খিল খিল করে হেসে ওঠে মেয়েটি। হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে সে স্বেচ্ছায় আত্মসমর্পণ করে। শুয়ে শুয়ে দুজনেই আগুনের দিকে চেয়ে থাকি। ছায়া মূর্তির মত মানুষ ঘোরাফেরা করছে আগুনের চার পাশে। নীরবে আমি তার বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গ হাত দিয়ে পরখ করি।
লোকে বলে, তুমি নাকি মেয়ে ছাড়া থাকতে পার না। মেয়েটি বলে,—ভার্জিনিয়ানদের কাছ থেকে নাকি ভারি সুন্দর একটি মেয়েকে জোর করে কেড়ে নিয়েছিলে।
তা বটে।
কি নাম ছিল তার ? বল না। আমাকে জড়িয়ে ধরে নিশ্চয়ই তার কথা ভাবছ না ?
তার নাম বেস কিনলি।
ভালবাসতে তাকে ? মরবার সময় খুব দুঃখ পেয়েছিলে ?
আচমকা আমি চেঁচিয়ে উঠি,—ভগবানের দিব্যি, চুপ কর ! চীৎকার শুনে মেয়েটি ছিটকে সরে যায় কিন্তু আমি তাকে আবার জড়িয়ে ধরি।
কিছু মনে কর না। আমি তোমাকে চমকে দিতে চাইনি।
আবার আস্তানায় ফিরে আসি। এলি তখনও সেই আগুনের কুণ্ডর পাশেই বসে আছে। যে-জায়গায় তাকে বসা দেখে গেছি, ঠিক সেই জায়গাতেই আছে। সে ডাকে, আলেন !
বল এলি।
আলেন, আমার কাছে একটা শপথ করবে ?
কি ?
বল, বিপ্লবের উপর আস্থা রাখবে ! বহু বছরের মধ্যে হয়ত শান্তি আসবে না। শক্ত পোক্ত লোকের প্রয়োজন হবে।
তুমি সঙ্গে থাকবে তো !
না, যদি তুমি একলা থাকো তাহলেও আলেন।
আমি বিছানায় ফিরে আসি। বহুক্ষণ নিশ্চল হয়ে বসে থাকে এলি। ঘুম আসে না।

অপলকে চেয়ে থাকি এলির দিকে।
তারপর ঘুম আসে। খানিকটা বাদে ভেঙেও যায়। এলি তখনও বসে আছে। দরজাটা খোলা। আবছা চাঁদের আলো ঢুকছে দরজার পথে। জেকবের দীর্ঘ দেহ বাঙ্কের উপর শায়িত। আস্তে আস্তে ডাক দিই, এলি।
সে আমার দিকে মুখ তুলে চায়। আমি ভেবেছি তুমি ঘুমিয়েছ আলেন।
সারারাত এমনি করে বসে থাকবে এলি ? শোবে না ?
বসেই তো আছি আলেন। তেমন কোন ক্লান্তি নেই ।
আবার আমি ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেও এলিকে দেখতে পাই। কুঁজো হয়ে সে যেন আগুনের পাশে বসে আছে আর লাঠি দিয়ে ছাই নাড়ছে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি লোকটার। এ অন্তর্দৃষ্টি বহু বছরের অভিজ্ঞতার ফল। আর ওর হৃদয়টাও বিশাল।
পর দিন মে মাসের যে-কোন দিন হবে। দিনটি আশীর্বাদের মত। হুকুম আসে, সেদিন নাকি জাঁকজমক করে কুচকাওয়াজ হবে। কর্তারা পল্টন পরিদর্শন করবেন। কুচকাওয়াজের পর গোটা একদিন বিশ্রাম আর উৎসব হবে। কিসের জন্য উৎসব ?
হরেকরকম গুজব শোনা যায়। মেলরোজ নামে মাসাচুসেটসের সদরঘাটির এক পিওন বলে, ফ্রান্সের সঙ্গে মিত্রতা হয়ে গেছে।
সৈন্যদল সার বেঁধে দাঁড়ায়। পরম আগ্রহে আমরা এই সংবাদ নিয়ে আলোচনা করি।
সাগর পারের মহান দেশ। যে-সে দেশ নয়, কয়েকশো বছর ইংলণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করে আসছে।
এ নিশ্চয়ই লাফায়েতের কাজ। শুনলাম সে-ই নাকি মিত্রতা ঘটিয়েছে।
যা বলছি শোন, এর মধ্যে নিশ্চয়ই বেন ফ্রাঙ্কলিনের হাত আছে। বুড়ো নিজেই মনে হয় এটা করেছে।
ওরা নাকি একটা পল্টন পাঠাচ্ছে। দশ হাজারের পল্টন।
ওয়াশিংটনের চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে। শিশুর মত কাঁদছেন। নিজের চোখে দেখেছি।
আনন্দে আত্মহারা হয়ে শিশুর মত হাসছেন ওয়েন। সৈন্যদল সার বেঁধে দাঁড়াবার সময়েই তিনি রাম দেবার ব্যবস্থা করে দেন। জ্যাকেটে এবং চুলে আমরা ফুলের কুঁড়ি বা সবুজ পাতা পরি। ড্রামে ইয়ংকি-ডুডলের গৎ বাজে। প্যারেডের মাঠে যেতে যেতে আমরা গান ধরি ঃ

টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে
ইয়াংকি বাবু চললেন বোস্টনে,
বুড়ো বেল্লিক হাউকে পাঠাবেন জাহান্নামে—
বলেন ওটা কিছুনা—ম্যাকারোনি
বাঃ বেশ চালিয়ে ইয়াংকি বাবু,
ব্যাটা গলদা চিংড়িদের হাঁটাও।
লাল কোটপরা বেজন্মা ফুলবাবুরা বুঝুক—
আসছে এবার ইয়াংকি বাবু।

গলা ছেড়ে গেয়ে চলেছি আমরা। আমাদের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে প্যারেডের মাঠ জুড়ে। লাইনের সামনে পেছনে ঘোড়ায় চড়ে ছুটোছুটি করবার সময় ওয়েনকে দেখে আমরা আনন্দ ধ্বনি করে উঠছি। আর পদের পর পদ গেয়ে চলেছি ঃ

ইয়াংকি বাবু জাহান্নামে যেয়ে,
বলেন—ইধার বেজায় ঠাণ্ডা।
যদি থাকতেন মাসছয়েক ফোর্জ ভ্যালীতে,
বলতেন বাবাঃ এর থেকে নরক অনেক ভাল!
বাহবা, চালিয়ে যাও ইয়াংকি বাবু,
ব্যাটা গলদা চিংড়িদের হাঁটাও।
লাল কোটপরা বেজন্মা ফুলবাবুরা বুঝুক—
আসছে এবার ঘোড়ায় চড়ে ইয়াংকি বাবু!

গ্রাণ্ড প্যারেডের মাঠে গিয়ে সারবেঁধে দাঁড়িয়েছি। লাফায়েৎ এবং ব্যারন স্টুবেনকে সাথে নিয়ে ওয়াশিংটন ঘোড়ায় চড়ে এগিয়ে আসছেন। সোজা হয়ে বসে আছেন তিনি। মৃদু মৃদু হাসছেন। চোখের কোণে ভাঁজ পড়েছে। মাঝে মাঝে তিনি হাত নেড়ে প্রত্যাভিবাদন জানান। তারপর ঘোড়া থেকে নামেন। আমাদের সার ভেঙে যায়। পাগলের মত তাদের চার পাশে ঘিরে দাঁড়াই। ওয়াশিংটন এবং স্টুবেনের শরীর স্পর্শ করবার জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যায়। স্টুবেন কাঁদছেন। অঝোরে জল গড়িয়ে পড়ছে তার গাল বেয়ে। স্বপ্নাবিষ্টের মত মাথা ঝাঁকাচ্ছেন ওয়াশিংটন। স্টুবেন বলেন, ছেলেরা, আমার ছেলেরা···

আবার লাইনে ফিরে গিয়ে আমরা চারদিকে তাকাই। চেয়ে থাকি গাছপালা, প্যারেডের মাঠের সবুজ বিস্তার আর নির্মেঘ নীল আকাশের দিকে। আমরা যেন স্বপ্ন দেখছি। শীতটা শুধু ছিল যেন দুঃস্বপ্নের মত। ফিরে আসবার সময় বেশ কয়েকজনের চোখে জল দেখা দেয়।

অফিসার-ঘরণীরা প্যারেডের মাঠের কিনারে দাঁড়িয়েছেন। শিবিরসঙ্গিনীরা তাদের খানিকটা দূরে। হাত নেড়ে তারাও আমাদের উৎসাহ দিচ্ছে। এদের রঙিন সাজ-পোশাক মাঠের চারপাশে সুন্দর রঙের ছোপ লাগিয়েছে।

স্টুবেন এখন আমাদের কুচকাওয়াজ করাচ্ছেন। খালি মাথায় তরোয়াল হাতে তিনি পেনসিলভানিয়ান এবং মাসাচুসেটসের সৈন্যদলের আগে হাঁটছেন। শিশুর মত হাসি-খুসি তিনি। আমাদের মার্চ করবার সময় মাটিতে তরোয়াল ঠুকছেন। ছোটাছুটি করছেন লাইনের পাশ দিয়ে। আর ঘাড় বাঁকিয়ে মাথা নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছেন তিনি। ছুটোছুটিতে ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি হাসিমুখে মাঠের মাঝখানে দাঁড়ান। ওয়াশিংটনকে ডেকে বলেন, কমাণ্ডার, ওদের বেয়নেটের কায়দাটা দেখুন।

দ্রুত তিনি আমাদের দিকে দৌড়ে আসেন,—ছেলেরা, আমার জন্য একবার বেয়নেটের কায়দাটা দেখাও না ঠিক যে-ভাবে শিখিয়েছি।

তারপর তিনি বেয়নেট চার্জের হুকুম দেন। বিগ্রেডের নাম ধরে পার্শ্বদেশ আক্রমণ করতে বলেন। প্রথম সারীর আক্রমণকারীদের রক্ষা করবার জন্য সৈনিকদের পরিচালিত করেন। তারপর সৈন্যদল পুনর্গঠন করে আনন্দে শিশুর মত হেসে ওঠেন।

এমন সৈন্য···সারা দুনিয়ায় পাবেন এমন সৈন্য? হা ভগবান, অপূর্ব···চমৎকার লড়িয়ে এরা!
ওয়াশিংটন তখন গুটিকয়েক কথা বলেন। বলেন, ফ্রান্সের সঙ্গে আমরা মিত্রতা করেছি। এই শীতে কি কষ্ট যে আমাদর ভুগতে হয়েছে তা তোমরাও জান—আমিও জানি। কেউই তা ভুলতে পারব না। তোমরা আমার আন্তরিক ধন্যবাদ গ্রহণ কর।
ঘোড়ায় চড়ে তিনি হাত নেড়ে আমাদের অভিবাদন করেন। তারপর মাথার টুপি খুলে ফেলেন। বাকী দিনটা আমরা মাঠের মধ্যে গুলতানি করে কাটাই। গাল গপ্প করি, মদ খাই, খাবার খাই আর রোদের তাপে চুপ করে শুয়ে থাকি।
ধীরে ধীরে গড়িয়ে যাচ্ছে দিনগুলি। বেশ গরম দিন। নীল আকাশ যেন একটা বাটির মত। ফোর্জ উপত্যকায় নবপল্লবের বাহার। আপেল গাছগুলো বরফের বলের মত দেখাচ্ছে। গাছের তলায় ঝরা ফুলের সাদা কার্পেট পাতা। বনভূমির মধ্য দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অবাক হয়ে ভাবি, এই জায়গাতেই কি ডিসেম্বর মাসে এসেছিলাম?
শীতকালে যারা মারা গেছে তাদের কবর দেওয়া হয়। শুয়েলকিল নদীর পারে ক্রশের লম্বা সার পড়ে। এলির সঙ্গে সেখানে গিয়ে আমাদের সাতজন সঙ্গীর জন্য সাতটি কবর চিহ্নিত করি এবং নামের ফলক লাগাই। বেঁটে ডাক্তারের নামে একটি কবর চিহ্নিত করি এবং অতিকষ্টে তার উপর এই কটি কথা লিখে রাখি ঃ

যিনি কখনও কর্তব্যে অবহেলা করেননি
অসুস্থকে দিয়েছেন আশ্বাস, করেছেন নিরাময়—
পীড়িতকে স্থান দিতে
যিনি কখনও বিলম্ব করেননি—
ঈশ্বর তাঁর আত্মাকে শান্তি দিন—
ক্ষমা করুন তাঁর সমস্ত পাপ!

ঠিক কথা লিখেছ। এলি বলে,—যোগ্য লোকের যোগ্য স্মৃতিফলক।
লোকটা অদ্ভূত কর্তব্যনিষ্ঠ আর কঠোর ছিল।
চার্লির কবরের উপর সবুজ ঘাসের গালিচা পাতা। তাকে এখানে কবর দেওয়ায় আমি খুশিই হয়েছি। এখানে শুয়ে পাহাড়ের উপর দিয়ে সে ফিলাডেলফিয়ার দিকে চেয়ে থাকতে পারবে।
একদিন আস্তানার বাইরে বসে আমরা গপ্প-সপ্প করছি। এলি জেকব আমি আর জনকয়েক পেনসিলভানিয়ার লোক আছে আগুনের চারপাশে। বেশ গরম মেঘলা রাত। উপত্যকার মধ্যে কুয়াশা জমেছে।
এর কথা বেশীদিন মনে থাকবে না। এলি বলে। শীতের কথা দুদিনেই ভুলে যাবে।
ভুলতে পারলেই ভাল।
বেজায় শীত পড়েছিল। এমন শীত কেউ কোনদিন দেখেনি।
গত একশো বছরের মধ্যে এমন শীত পড়েছে বলে বাপ-দাদার মুখে শুনিনি।
এর কথা ভুলে যাওয়াই ভাল। এ মর্মান্তিক স্মৃতি যত শিগ্‌গির ভোলা যায় ততই ভাল।

এখনও আমার হাড়ে যেন ঠাণ্ডা লেগে আছে।
অত সহজে যাবেও না।
এলি তখন গম্ভীর ভাবে বলে, অনেক সময় ভাবি, কি হবে এ সবে ?
যুদ্ধের কথা সাধারণ লোকের পক্ষে বোঝা মুশকিল।
এ যেন মৃত্যুর মত। যুদ্ধ বা মৃত্যুর কথা ভেবে কুল-কিনারা করা যায় না।
বহুদিন আগে চোখে ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে কেনটন যখন মারা যায়, তখন একথা বুঝেছি বলে মনে হয় না। তারপর আবারও তিন বছরের জন্য নাম লিখিয়েছি। তার কথাও এখন ভাবতে পারি না। বিশ্বাস করবার মত কিছু থাক বা না থাক, বিশ্বাস আমাকে করতেই হবে।
দিন গড়িয়ে চলেছে– গরমের হলকা বইছে বাতাসে। তাত ক্রমেই এমন বেড়ে যায় যে লোকে বলতে শুরু করে, শীতের মত গরমও দেখ কি ভয়ানক পড়ে। ফোর্জ উপত্যকার রূপ উথলে পড়ছে। অপূর্ব স্নিগ্ধ রূপের জোয়ার। পাহাড়ের পর পাহাড় সবুজে ঢাকা। শুধু কোয়েকার চাষীরা যেটুকু জায়গায় লাঙল দিচ্ছে তাই বাদে। এই সবুজের রাজ্যে লালচে বাদামি চেরার দাগ খুব সামান্য জায়গাতেই আছে।
গুজব রটে যে শিগ্‌গিরই আমরা অন্যত্র যাব। কোথায় যাব কেউ জানে না।
ব্রিটিশরা ফিলাডলফিয়া ছেড়ে যাবে। কিন্তু আমাদের আক্রমণ করবে না। পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেনা ইতিমধ্যেই ফোর্জ উপত্যকায় এসে গেছে। আমরা এখন বেশ শক্তিশালী।
কুচকাওয়াজের বিরাম নেই। অনবরত করে যাচ্ছি। শীতের কষ্ট সহ্য করে যারা রয়ে গেছে, পেনসিলভানিয়া, মাসাচুসেটস ও জার্সির সেই ক্ষত-বিক্ষত সৈন্যদল স্টুবেনের প্রিয় পাত্র। আমাদের তিনি প্রকৃত সৈনিক বানাচ্ছেন। খাঁটি সৈনিক আমরা কোন কালেই ছিলাম না। আসলে আমরা একদল চাষী। প্রতিটি যুদ্ধে হেরেছি আর ব্রিটিশদের এড়াবার জন্য দেশময় পালিয়ে বেড়িয়েছি। এইবার কুচকাওয়াজ করে আমরা যন্ত্র হয়ে যাচ্ছি। স্টুবেন অক্লান্ত। লোহার মত কঠিন হতে হবে আমাদের। তার আগে তিনি ছাড়বেন না। এ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা তার।
তিনি বলেন, আর দেরী নেই ছেলেরা! শিগ্‌গিরই আমরা এক শক্ত আঘাত হানব। তারপর খতম হয়ে যাবে লড়াই। জোরসে এক আঘাত। দেরী নেই···তার আর দেরী নেই।
আমরা যা আশা করেছি তার আগেই সেদিন আসে। জীর্ণশীর্ণ একটা ঘোড়ায় চড়ে গালফ রোড দিয়ে এক সওয়ার ছুটে আসছে। চেঁচিয়ে কি যেন বলতে বলতে সে সাস্ত্রীদের মধ্য দিয়ে ছুটে আসে। গোটা শিবিরে অশ্বখুরের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। সদর ঘাঁটির সামনে এসে পাগলের মত সে ঘোড়ার রাশ টেনে ধরে।
আগুনের মত বার্তাবহের আগমন সংবাদ গোটা শিবিরে ছড়িয়ে পড়ে। কেউ জানে না কি সংবাদ সে এনেছে। কিন্তু সবাই ধরে নেয়, নিশ্চয়ই ফিলাডেলফিয়া থেকে আসছে। জটলা করে আমরা নিজের নিজের অভিমত ও অনুমান প্রকাশ করি।
ব্রিটিশরা হয়ত শিবির আক্রমণ করবে···
ফিলাডেলফিয়া পুড়িয়ে দিয়ে তারা নিউইয়র্ক যাচ্ছে···

ডেলওয়ারে দিয়ে জাহাজে যাচ্ছে···

রাত হয়। আমরা আগুন জ্বালি। এই আগুন দেখে উপত্যকার বাসিন্দা কোয়েকার চাষীরা কি ভাবছে? এর আগে কোনদিন এ প্রশ্ন মনে জাগেনি। মানব দেহী অদ্ভুত এক শ্রেণীর জানোয়ার নিজেদের পল্টন বলে পরিচয় দিচ্ছে। হঠাৎ একদিন রাত্রির অন্ধকারে বরফের মধ্যে তারা এখানে এসে ঘাঁটি গাড়ে। আবার চলে যাবে। কিন্তু কোয়েকাররা এখানে থাকবে—গত একশো বছর ধরে যেভাবে বসবাস করে এসেছে ঠিক সেইভাবেই বসবাস করবে।

রাত্রে ঘুম ভেঙে যায়। হঠাৎ জেগে বেসের শরীর খুঁজি। বিড়বিড় করে বলি, যদি এখান থেকে চলে যাই, কেমন করে আমার দেখা পাবে? মনে পড়ে, আরও পুরো তিনটি বছর সঙ্গিনী ছাড়া পল্টনে কাটাতে হবে। বেসের কথা ভেবে ছেলেমানুষের মত কেঁদে ফেলি। একলা থাকতে ভয় করে।

পরদিন ছাউনিতে একটা অদ্ভুত অস্বস্তির ভাব দেখা দেয়। সকালবেলা স্টুবেন যথানিয়মে আমাদের ড্রিল করান। গোমরা মুখো সাচ্চা প্রুশিয়ানের মত তার মুখের চেহারা। যন্ত্রের মত নিয়মমাফিক তিনি কুচকাওয়াজ করান; কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন উৎসাহ বা আগ্রহের ভাব নেই। যেন করাতে হবে বলেই করাচ্ছেন। তপ্ত সূর্যের তাপে তার চেহারা টকটকে লাল ঘায়ের মত। স্টুবেন আমাদের এমনভাবে কুচকাওয়াজ করান যে ঘামে ভিজে চুপচুপ হয়ে যাই।

আস্তানায় শুয়ে শুয়ে আমরা নানা গুজব নিয়ে আলোচনা করি। এখন স্পষ্টই জানা গেছে যে ব্রিটিশরা ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে গেছে। গোটা শীতকাল বিশ হাজার লোক সেখানে আরাম করে গাণ্ডে-পিণ্ডে গিলেছে। পাক্কা বিশ হাজার লোক। আর তাদেরই আঠারো মাইল দূরে হাজার তিনেক রুগ্ন ভিক্ষুক পাহাড়ের বুকে একটানা উপোস করে কাটিয়েছে। এখন সংবাদ পাওয়া যায় যে দশ-বারে হাজার ব্রিটিশ সেনা ফিলাডেলফিয়া ছেড়ে হাঁটা পথে জার্সির মধ্য দিয়ে নিউ ইয়র্ক রওনা হয়েছে। অফিসাররা কেউ কোন কথা বলে না। টুকরো টুকরো সংবাদ জোড়া দিয়ে আমরা নিজেরাই বুঝবার চেষ্টা করি। আধা-আধি ব্রিটিশ সেনা জাহাজে চড়ে গেছে। জার্সির মধ্য দিয়ে হাঁটা পথে যারা যাচ্ছে, ওয়াশিংটন যদি তাদের আক্রমণ করেন তো···

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি। আমেরিকানরা একবার মাত্র একটি যুদ্ধে হারিয়েছে ব্রিটিশদের। সে যুদ্ধ হয় সতেরো শো পঁচাত্তর সালে—বোস্টনের বাঙ্কার পাহাড়ে। তারপর আর ঘাঁটি আগলে থাকতে পারিনি আমরা। বরাবর হেরে আসছি।

শিগ্‌গীরই জানা যাবে। এলি বলে। আশ্চর্য রকম শান্ত সে। মনে হয় যেন এরজন্যই প্রতীক্ষা করছিল।

ঠিক কথাই বলেছ, শিগ্‌গিরই জানতে পাব। জেকব সায় দেয়।

পরদিন সকালবেলা রওনা হবার আদেশ আসে। হুকুম আসে, আস্তানা ভেঙে ফেল। এই আশ্রয়েই ছ'মাস কেটেছে আমাদের।

শান্তভাবেই আমরা হুকুম পালন করি। আস্তানায় টুকিটাকি কাজ করে সামান্য জিনিসপত্তর গুছিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করি যে পুরো ছ'টি মাস কেটেছে এখানে। আমরা নীরবে

ছাউনি ভেঙে সংগ্রামের জন্য রওনা হই।

এলি এবং জেকব চলে যাবার পরেও একলা আমি আস্তানায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। প্রতিটি বিছানা, আমাদের নিজেদের হাতে তৈরী প্রতিটি জিনিস হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখি। গাছের গঁুড়ির দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াই। চুল্লীর ছাই লাথি মেরে ছড়িয়ে দিই। পরিখাটি তখন বেজায় গরম হয়ে উঠেছে। সকালবেলার সূর্য তাতিয়ে তুলছে আস্তানার চাল।

মনে হয় যেন অনেক বছর আগে আমরা এ আশ্রয়টি বানিয়েছি। ক্লার্ক ভ্যানডিয়ার, হেনরি লেন, এডওয়ার্ড ফ্লাগ, কেনটন ব্রেনার আর চার্লি গ্রীনের মত জোয়ান লোকরা যেন তাজা গাছ কাটছে।

আস্তানার ভেতরটা নরকের মত। এর মধ্যেই বেসকে কোলে জড়িয়ে কতদিন যে শুয়েছি! ভালবেসেছি একটি নারীকে। একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালবাসে অথচ বুঝতে পারে না—একি আশ্চর্য রহস্য?

আচ্ছা, পরিখার কাঠের দেয়ালে যদি আমি লিখে রাখি যে, আলেন হেল নামে এক সৈনিক এখানে এক শিবির-সঙ্গিনীকে ভালবেসেছিল, তাকে নিয়ে থাকত—তাহলে কেমন হয়?

বন্দুকের তাক শূন্য। একদিন ওয়েনের কাছে আমরা বন্দুক কটা নিয়ে যাই। আটটি বন্দুক। ওয়েন একদৃষ্টে চেয়ে থাকেন। এলি বলে, আপনার অস্ত্রের দরকার আছে স্যার। অস্ত্র নেই এমন তো বহু লোক আছে পল্টনে।

ওয়েন ছাড়া ছাড়া ভাবে বলেন, যারা ব্যবহার করেছে এর মালিক তারা। মালিক তারা হলেও আমি নেব, অস্ত্র চাই আমাদের।

এলি এসে আমাকে ডাক দেয়। বাইরে এসে আমি দরজা বন্ধ করে দিই। ছুঁড়ে ফেলে দিই চাবিটা। দরজা এমনিতেই বন্ধ থাকবে। কেউ এই হতচ্ছাড়াদের আড্ডা ভাঙতে-চুরতে আসবে না। হয়ত বহু বছর পরে একটা মাটির ঢিবির মধ্যে কতগুলো পচা কাঠ বেরুবে। তখন হয়ত লোকজন উৎসুক দৃষ্টিতে এর দিকে চেয়ে থাকবে। বলবে, বিপ্লবীরা ছমাস বসবাস করেছিল এখানে।

এস আলেন। এলি মোলায়েম ভাবে বলে।

আমরা তখন নিজেদের ব্রিগেডে ভীড়ে যাই। বেশ গরম দিন। গা পুড়ে যাচ্ছে গরমে। গলিত স্বর্ণের মত সূর্য-গোলক যেন ভেসে বেড়াচ্ছে হিমশীতল আকাশের নীল-নীলিমার মধ্যে। আমাদের পাশ দিয়ে ঘোড়া হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন ওয়েন। হাসছেন এই জীর্ণবাস শীর্ণ লোকগুলোর দিকে চেয়ে। মাথা নেড়ে অভিবাদন করছেন। পরিচ্ছদ শতছিন্ন হলেও দুঃখের দহনে এরা সাচ্চা মানুষ হয়েছে! অকুতোভয়ে এই মানুষগুলো নরকে পর্যন্ত তার অনুসঙ্গী হবে। কোনও ভয়ই এদের নেই। নরকের ভয়ও না। তিনি হেঁকে বলেন, বিগ্রেডস···এগিয়ে চল।

ড্রামে আবার মামুলি গৎ বেজে ওঠে। নতুন কোন গৎ নয়···বেজে ওঠে ভিখারীর পল্টনের যোগ্য গানের সুর। একটি বিউগিলও যোগ দেয়। বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে তার তিক্ষ্ণ কর্কশ শব্দে ঃ

ঠাট্টু ঘোড়ার চড়ে
ইয়াংকি বাবু গেলেন লণ্ডনে···

স্টুবেনের শেখান প্রুশিয়ান কায়দায় টান হয়ে পা ফেলছে পেনসিলভানিয়ার সৈনিকেরা। মাসাচুসেটস্ ও নিউ জার্সির লোকজনের পাশ কাটিয়ে আমরা এগিয়ে যাই। একদল স্বেচ্ছাসেনার পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়। ঘোড়ার পিঠে বসে স্টুবেন বারবার মাথা নাড়ছেন। তার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত। মুখ দিয়ে কোন কথা সরছে না।

আমরা পল্টনের সামনেই চলতে থাকি। ওয়াশিংটনের ভার্জিনিয়ান দেহরক্ষীদের ঠিক পেছনে। লম্বা ভার্জিনিয়ানরা পেছন ফিরে আমাদের দিকে চেয়ে দাঁত বার করে হাসে। এস চাষীর দল···লাঙল দেবার দরকার আছে।

আমরা আবার গান ধরি ঃ

ইয়াংকি বাবু গেলেন নরকে,
বলেন—ইধার বহুত ঠাণ্ডা···

আমি পেছন ফিরে তাকাই। পাহাড়গুলো গ্রীষ্মকালের রোদে পোড়া 'ন্যাশপাতি' বাগানের মত দেখায়। ছোট্ট একদল কোয়েকার চাষী তাদের বউদের সাথে প্যারেডের মাঠে দাঁড়িয়ে দেখছে আমাদের।

আমার এক পাশে এলি—অপর পাশে জেকব। আমি আর ফিরে তাকাই না।

ঘন জলো মেঘের বৃষ্টি নামে ঝমঝম করে আমাদের একেবারে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। প্রবল ধারা বর্ষণের মধ্যেই চলেছি। বিরাট এক সাপের মত পাহাড়ের মধ্য দিয়ে চলেছে সৈন্যদল। সামনের ও পেছনের মুখ বৃষ্টির ধারায় অদৃশ্য। বৃষ্টি থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ঝকঝকে রোদ ওঠে। এ রোদের তেজ অনেক বেশী! কাদা জমাট বেঁধে শক্ত হয়। আবার সেই মাটি আমাদের পায়ের চাপে গুঁড়িয়ে ক্রমে মিহি বালিকণায় পরিণত হয়। আমাদের অনেকেরই খালি পা। কিন্তু এই গুঁড়ানো নরম বালি মাটিতে চলতে অসুবিধা হয় না।

কিন্তু জামা-কাপড় বৃষ্টির জলে ভিজে শপশপ করছে। পিঠের সাথে জামা লেপটে রয়েছে। মিহি বালিকণা উড়ে পড়ছে সবার গায়ে। এ অসহ্য। প্রথমে আমরা কোট খুলে রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দিই। তারপর ফেলি ছেঁড়া শার্ট। বন্দুক ঝুলানো ফিতে পিঠের চামড়ায় কেটে বসে। কোমর অবধি খালি গায়ে আমাদের অদ্ভুত দেখায়। এ যেন এক অর্ধনগ্নের পল্টন।

শ্রান্ত হলেও পথ চলেছি। কিন্তু দুপুর বেলা রোদের তাপে আর ক্লান্তির অবসাদে বসে পড়ি। কেউই তেমন খেতে পারে না। খেতে না পেয়ে পেয়ে পেটে চড়া পড়েছে। তার উপর জুটেছে শঙ্কা আব প্রতীক্ষার অস্বস্তি।

সবাইর মুখে শত্রুর কথা। কোথায় গেল ? কখন দেখা মিলবে ওদের ? শুনছি, স্বেচ্ছাসেনারা নাকি ইতিমধ্যেই যুদ্ধের ভয়ে উসখুস করছে। এতক্ষণে বুঝতে পারি, কেন পেনসিলভানিয়ার সৈনিকদের সামনে দেওয়া হয়েছে।

স্বেচ্ছাসেনাদের উপর কোন আস্থা নেই আমাদের। জেকব বলে,—যাই ঘটুক, আমাদেরই সামনে যেয়ে পড়তে হবে। আমরা যদি দাঁড়াতে পারি তো স্বেচ্ছাসেনারাও দাঁড়াবে। শুধু ওদের উপর কোন ভরসাই আমি করি না।
হঠাৎ আমার যেন কেমন একটা ভয়-ভয় করে। অদ্ভুত একটা শঙ্কা অনুভব করি। শীতকালের পর জীবনের উপর এত মায়া কোন সময় অনুভব করিনি। ঐ শীতের ধাক্কাও সামলেছি। ঐ বেজায় শীতের পরেও বেঁচে রয়েছি।
সত্যিই কি যুদ্ধ হবে জেকব ?
যুদ্ধ হতে হবেই। তিন মাসের বেশী তো আর স্বেচ্ছাসেনাদের আটকে রাখা যাবে না।
এইটেই শেষ যুদ্ধ। খাপছাড়া ভাবে এলি বলে ওঠে। এটাতেই জয় পরাজয় নির্ধারিত হবে।
আমরা দুজনেই তার দিকে তাকাই। ধীরে ধীরে এলি বলে, যুদ্ধের কোন মোহ আমার নেই। অনেক লোক মরেছে। মৃত্যু দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এখন বিশ্রাম করতে চাই। জেকব তুমি বা আমি এখন তো আর যুবক নই। এখন আমাদের চাই একটানা নির্ঝঞ্ঝাট বিশ্রাম।
বিশ্রামের অবসর! জেকব বলে। বিশ্রামের অবসর তো পরে অনেক মিলবে।
আবার আমরা এগিয়ে চলি। এবার চলেছি জোর তালে। রসদের ট্রেন আর শিবির-সঙ্গিনীরা অনেক পেছনে পড়েগেছে। একটা কিছুর পেছনে চলেছি আমরা। ক্রমাগত পা টেনে এগোচ্ছি। ড্রামের বাজনা উড়ো বালির কুয়াশায় যেন চাপা পড়ে যায়। খালি পায়ের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পথে ডোরাকেটে দেয়। হেঁটে হেঁটে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছি যে বসবার হুকুম পেলেই ধুপ করে রাস্তায় বসে পড়ি।
পরদিন আবার বৃষ্টি শুরু হয়। ভ্যাপসা গরমের টানে বৃষ্টিধারা যেন পুরু প্রাচীর সৃষ্টি করে। দেলওয়ারে নদী পার হয়ে আমরা লম্বা পাইন বন আর উষর বালিয়াড়ি দেশে পড়ি, পাইনের গন্ধ বেজায় কড়া। বিচ্ছিরি। দলে দলে মশা উড়ছে গুনগুন করে। মশার কামড়ে সারা গায়ে লাল লাল-ছিট পড়ে। দরদর ধারায় ঘাম পড়ে চোখে-মুখে। সারা গায়ে বালির চড়া পড়েছে।
ওয়েন হেসে বলেন, শত্রুরা তোমাদের দেখলেই ভয় পাবে। যুদ্ধের আর দরকার হবে না।
সুন্দর আমরা নই। যুদ্ধের শঙ্কায় চোখমুখ বসে গেছে। শত্রুর দেখা না পাওয়া পর্যন্ত কোন বিশ্রাম নেই। এখন এমন অবস্থা মনে হয় যেন শত্রুর দেখা পেলেই বাঁচি। যাই হোক, অন্তত এই ঝুটঝামেলা থেকে তো বাঁচা যায়।
রাত কাটাবার জন্য বালিয়াড়ির মধ্যে ছাউনি ফেলা হয়। পাইন গাছের ফাঁকে ফাঁকে আগুন জ্বালি! রান্নাবান্না সেরে আগুনের কাছ থেকে সরে যাই। কোন জায়গা ঠাণ্ডা নয়। বালিই তেতে রয়েছে। সারা রাতেও সে তাত কমে না। রোদে সব কিছু পুড়ে তেতে আছে।
শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। পাইনের উগ্র গন্ধ-মাখা ভারী হাওয়া কষ্ট হয় টানতে। ফুসফুসে আটকে থাকে যেন।
শুয়ে আছি, হঠাৎ ওয়েনের এক বার্তাবহ এসে হাজির হয়। সেনানীরা যে-তাঁবুতে

বৈঠক করছেন তারই সামনে মোতায়েন ছিল লোকটি। তার কাছে সংবাদ জিজ্ঞাসা করি। আমরা কি এগোবো এখন ? এই ঈশ্বর-বর্জিত জার্সিদেশ ছেড়ে কোনদিন এগিয়ে যাওয়া হবে কি ?

সেনানায়কদের মধ্যে তুমুল বাক-বিতণ্ডা শুরু হয়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চলে। লী যুদ্ধ করতে চান না।

এই চার্লস লী লোকটা বেশ বুদ্ধিমান সেনানী। কিন্তু নেতৃত্বের ক্ষমতা নেই। চেহারাও কদাকার।

ওয়াশিংটন প্রায় পাগল হয়ে গেছেন। বসে বসে বিড় করে বলেছেন, তিনি একলা। হ্যামিলটন, ওয়েন আর স্টুবেন ছাড়া কোন সাথী নেই তাঁর। ওয়াশিংটনের অবস্থা স্বপ্নাবিষ্টের মত। একা বসে বলে চলেছেন, কেন আপনারা আমার সাথী হতে চাইছেন না ? আমাকে কি একলাই এগোতে হবে ? আমাকে কি একলাই থাকতে হবে ? এই নিঃসঙ্গতা অসহনীয়।

ব্রিটিশরা কোথায় আছে ?

জার্সিতেই। শুনছি, মাইল পনরো লম্বা এক সার দিয়ে চলেছে তারা। ফিলাডেলফিয়ার প্রায় আর্দ্ধেক লোক নাকি তাদের সঙ্গে চলেছে। কে জানে, রাতে শোবার জন্য হয়ত হাজার দুয়েক ফিলাডেলফিয়ার বৌ ঝিদের সঙ্গে নিয়ে চলেছে।

ওয়েন যুদ্ধ করতে চান !

তিনি বলছেন, শুধু পেনসিলভানিয়ার লোক নিয়েই তিনি লড়াই করবেন। গোটা পল্টন জাহান্নামে গেলেও তিনি তাঁর পেনসিলভানিয়ার লোকজন নিয়ে যুদ্ধ করবেন।

তাঁর মত অমন মাথা-গরম লোক কিন্তু যুদ্ধের পরিকল্পনা করতে পারে না।

তিনি বিড় বিড় করে বলছেন, দোহাই ভগবানের, যুদ্ধ করুন। যুদ্ধ করে জাহান্নামে যান ! না হলে পল্টন বাঁচানো যাবে না। সবাই আপনারা ভীরু। লী বলছেন, এসব কথা তিনি সহ্য করবেন না। ওয়েন বলেন যে লী'র জন্য কোন কথা যদি তিনি প্রত্যাহার করেন তবে তিনি বেজন্মা মিথ্যুক। ওয়াশিংটন তাদের দুজনকেই শান্ত করতে চেষ্টা করছেন। হ্যামিলটন হলপ করে বলছেন যে সবাই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করছে। লী হ্যামিলটনকে ইহুদি বলে গালাগাল দেন। তাই শুনে হ্যামিলটন তাকে খুন করতে যায় আর কি ! বেদম ঝগড়া লেগেছে বৈঠকে।

ওদের মধ্যে কারও মনস্থির নেই বুঝি ?

ওয়াশিংটন যুদ্ধ করবার পক্ষপাতী।

এখন যুদ্ধ না করলে আর পল্টনকে এক সাথে রাখতে হবে না। এখনি আমরা আটদশ হাজার আছি। হয় এখুনি যুদ্ধ করতে হবে···না হয় মাসখানেক পরে পল্টনের অস্তিত্ব থাকবে না।

পরদিন আবার এগিয়ে চলি। ঘোড়া থেকে নেমে ওয়েন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলেছেন। রাগে টগবগ করছে লোকটা। অক্লান্ত ভাবে লাইনের পাশে দিয়ে হাঁটাহাঁটি করছেন আর আমাদের দ্রুত চালিয়ে নিচ্ছেন। আকাশে বৃষ্টির কোন লক্ষণ নেই। কোন মেঘ নেই সারা আকাশে। শুধু নীল অসীম বিস্তারের মধ্যে একটি লাল অগ্নি-গোলক

জ্বলজ্বল করছে। পা টেনে টেনে আমরা পাইন গাছের ফাঁক দিয়ে চলেছি। যাচ্ছি বালিয়াড়ি মাড়িয়ে। পায়ের চাপে বালির ঢিবি ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে। উড়ো বালিকণায় অন্ধকার পথে অন্ধের মত এগোচ্ছি, গালাগাল করছি মশার ঝাঁকের চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে।

বিশ্রামের অবকাশ নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু সামনে এগিয়ে চলেছি। খালি পায়ে যারা "ওনা হয়েছে, এতক্ষণে তাদের পায়ে দগদগে রক্তস্রাবী ঘা হয়েছে। তাতানো বালিতে পা পুড়ে যাচ্ছে। ফোসকা পড়েছে পায়ে। রোদে পুড়ে আর নোংরা লেগে আমাদের চেহারা আবার কালচে হয়ে গেছে। আবার দাড়ি গজিয়েছে মুখে। চামড়ার পর ফুলে রয়েছে মশার লাল লাল কামড়ের দাগ।

কষ্ট হচ্ছে এলির। জেকবের চেহারা শীর্ণ হলেও চোখে আগুন নিয়ে সে চলেছে। জেকব এই বিপ্লবের আত্মা। অনুযোগহীন অক্লান্ত। নিভিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত এ অনির্বাণ আগুন জ্বলবে। কিন্তু এলির পা ফেটে কুচি কুচি হয়েছে। ফুলে উঠেছে আবার! শীতকালেও ভালভাবে সারেনি তো! আমরা তার পা বেঁধে দিয়েছি। তবু অবিশ্রান্ত রক্ত ঝরছে।

বিশ্রাম দেবার জন্য একবার আমরা যখন বসে পড়ি, হাঁপাতে হাঁপাতে এলি বলে, এই-ই শেষ মার্চ আলেন।

না না! এর চাইতেও অনেক বেশী কষ্ট তুমি সয়েছ এলি। শিগ্‌গিরই আমরা বিশ্রাম পাব।

কোনরকম ক্ষোভ প্রকাশ না করে সে বলে, আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আলেন! এতদিন কম বোঝা টানতে হয়নি! মস্ত বোঝা বয়েছি।

জব এনড্রুজ আমাদের পাশেই বসা। সে বলে, বুড়ো লোকের পক্ষে একটানা এভাবে মার্চ করা কঠিন।

যা বলেছ, বুড়ো লোকের পক্ষে কঠিনই বটে! মৃদু হাসে এলি।

বুড়ো হবার মত বয়স তোমার নয় এলি!

হয়েছে হে হয়েছে। বয়স কম হল না আলেন। ভাবছি বেচারী পা দুখানাকে এবার বিশ্রাম দিতে হবে। বেশ দীর্ঘ বিশ্রাম!

আবার হোঁচট খেয়ে টলতে টলতে এগোই। রাত হয় তো পথের মধ্যেই বসে পড়ি। আগুন জ্বালবার শক্তি কারও নেই। সার বাঁধ অবস্থাতেই শুয়ে পড়ি। গরম বালির উপর মোড়ামুড়ি করি। হাঁ করে শ্বাস টানি। ভোর হবার সঙ্গে আবার রওনা হই। এগিয়ে যাই উত্তর মুখে।

চলতে চলতে দু-পাঁচ জন পড়ে যায়। মাথা ঘুরে চোখে ঝাপসা দেখে, আর গোটাকয়েক টাল খেয়ে ধড়াস করে মাটিতে পড়ে কুঁকড়ে একটা পোঁটলার মতো বালির উপর পড়ে থাকে। পল্টন এঁকেবেঁকে পাশ কাটিয়ে যায়। আমাদের সারা গায়ে নোংরা মাখা। রোদে-পোড়া বীভৎস কালো চেহারা সকলের।

চলার পথে একটি হেসিয়ানের লাস চোখে পড়ে। গরমে মারা গেছে বেচারী। উর্দি ও গাঁটরির সত্তর পাউণ্ড ওজনের পর এই প্রচণ্ড গরম সইতে পারছে না। পোকা মাকড়ের

মত মরছে। লোকটির ফিটফাট সবজে উর্দির উপর এঁটেল মাটি ও নোংরার দাগ। শূন্য দৃষ্টিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে জার্মান সৈনিকটি। মশার কামড়ে মুখ ফুলে ঢোল হয়েছে। অদ্ভুত নিসঙ্গ লোকটি। ছমাস যে শত্রুর দেখা সাক্ষাৎ মেলেনি তারই স্মারক। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ থেমে তার বুট খুলবার চেষ্টা করে।

অনবরত এগিয়ে চলেছি আমরা। এইবার বুঝতে পারছি যে শত্রু পালাবার চেষ্টা করছে। এ এক কল্পনাতীত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। এই ছয় মাসের মধ্যে যে কোন দিন এক গুঁতোয় আমাদের খতম করে দিতে পারত। কিন্তু আজকে অর্ধনগ্ন নোংরা ভিখারীদের ভয়ে পালাচ্ছে ওরা!

ক্রমেই আরও হেসিয়ানের লাশ চোখে পড়ে। সবাই গরমের চোটে মরেছে। কেউ কেউ রাস্তার উপরেই পড়ে আছে। রাস্তার দুপাশেও আছে কিছু। বালির উপর এদের সবজে উর্দি বেশ বর্ণ বৈচিত্র সৃষ্টি করেছে। অমন ভারী উর্দি নিয়ে ওরা যে কি করে মাইল খানেক পথও চলেছে তাই ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। আমরা এদের বুট খুলে নিই। মরা হেসিয়ান দেখে হাসাহাসি করি। অধনগ্ন কিছু পেনসিলভানিয়ার চাষী হেসিয়ানের উঁচু টুপি মাথায় পরে; কিন্তু বেশীক্ষণ রাখতে পারে না।

তারপর ফুজিলিয়ার্স (সেকেলে হালকা বন্দুকধারী) এক খাস ইংরেজের লাশ দেখা যায়। আমরা থেমে তার লাল কোট আর সোনালী ফিতের দিকে তাকাই। রাজার মত উর্দি বটে!

বেশ গরম কিন্তু। কে একজন বলে ওঠে। অমন গরম পোশাক গায়ে রাখতে পারবে কেন? বেচারী গরমের চোটেই মারা গেছে।

অনায়াসে লোকটা কোন উপত্যকায় থাকতে পারত। এই কাটফাটা রোদের জন্য আঁকুপাকু করতে হত না।

এইবার শীতে যদি এমন একটা লাল জ্যাকেট থাকত! অমন জিনিস ফেলে যেতে বুক ফেটে যায়!

ধুলোর আবছা আবরণের মধ্যে সহসা দু-চারটে জিনিস নজরে পড়ে। ড্রাম বাজনা থেমে গেছে। আমরা যেন ধুলোর সমুদ্রের মধ্যে হাতড়াচ্ছি। ভার্জিনিয়ার সৈনিকরা টহলদারির জন্য এগিয়ে গেছে। অদৃশ্য স্থান থেকে মাঝে মাঝে তাদের শুকনো গলার হাঁক শোনা যায়।

সব ঠিক আছে···সব ঠিক আছে···সব ঠিক আছে···

খাদ একটা···হাত আষ্টেক গভীর।

বালির ঢিবি···

এরপর দেখি একখানা উলটানো গাড়ি। বৃটিশদের মালটানা গাড়ি। একসেল্ ভেঙে কাত হয়ে আছে। দুটো ভাঙা ট্রাঙ্ক থেকে মেয়েদের জামা কাপড় ছড়িয়ে আছে বালির উপর। হাতে হাতে আমরা পোশাক কটি তুলে নি। লেস লাগানো গুটি কয়েকপেটি কোট, লেস দেওয়া এবং রেশমী কয়েকটা জ্যাকেট আর গাউন একটা।

আমার এগ্নি থাকলে পরতে পারত।

তোমার এগ্নি এতক্ষণে স্বেচ্ছাসেনার সঙ্গে ভীড়ে গিয়েছে। লেস-দেওয়া পেটি কোট চাইবার

মত লোক নেই।

গরমে মরা আরও বহু লাশ নজরে পড়ে। মুমূর্ষু ঘোড়াগুলো বালির উপর শুয়ে ধুঁকছে। এক জায়গায় গুটিবারো হেসিয়ানের লাশ দেখা যায়। চোখ খোলা অবস্থায় পড়ে আছে। এখন আর তাদের রোদের ভয় নেই।

পাইন বনের শেষ নেই। লম্বা লম্বা পাতা ঝরা পাইন গাছ জায়গায় জায়গায় মাথার উপর যেন ছাতি মেলে ধরে। শ'খানেক পা দুরে সামান্য এক ফালি খোলা জায়গা। আগাছায় ঢাকা গড়ানে বালির ঢিবি। তারপর আবার পাইন বন। পাইনের উগ্র মাতাল করা গন্ধ ভুলে থাকবার জো নেই। বালির উপর দিয়ে চলবার সময় পা ফসকে যায়—পড়ে যাই। হাত পা ছড়িয়ে একবার পড়ে যাচ্ছি। আবার কোনমতে উঠে চলেছি। এলি আমার পাশে। একরোখা যন্ত্রের মত চলেছে সে। চকচক করছে চোখদুটো। আমি তাকে সাহায্য করবার জন্য হাত বাড়াই। ভাঙা গলায় ফিসফিস করে ধন্যবাদ দেয় এলি।

রাত কাটাবার জন্য ছাউনি ফেলা হয়। জোর এক পশলা বৃষ্টি আমাদের ভিজিয়ে চুপচুপ করে দেয়। বাজও পড়ে। সামান্য যে কয়েকটি আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করা হয়, বৃষ্টিতে তাও পণ্ড হয়ে যায়। জন্তুর মত আমরা শুয়ে থাকি। নীরবে দুঃখ কষ্ট সহ্য করি।

সংবাদ রটে যায় যে ব্রিটিশরা আমাদের কাছাকাছি আছে, ক্ষীণ ভাবে একটি তুর্যধ্বনি কানে আসে। পেনসিলভানিয়ার সৈন্যদলের মধ্য দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে ওয়েন আমাদের সম্ভাব্য আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলে যান। গাছের গুঁড়ি জড়ো করে আমরা রক্ষাব্যূহ তৈরী করি এবং দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই ঘুমোই। ঘুমের ঘোরে অনেকেই গাছের গুঁড়ির উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

ওয়াশিংটনের তাঁবু আমাদের আস্তানা থেকে বেশী দূরে নয়। পরামর্শ বৈঠকের জন্য অন্যান্য ব্রিগেডের সেনানায়করা তাঁর তাঁবুতে যায়। ভারনাম,, স্টুবেন, চার্লস লী, গ্রীন আর লর্ড স্টার্লিং তাঁর ঘরে জমায়েত হন, আলোয় তাদের চেহারা ছায়ার মত ঘোরাফেরা করে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা তর্কাতর্কি ঝগড়া-ঝাটি করেন। সহসা ওয়েনের গলা শোনা যায়। তারস্বরে তিনি চেঁচিয়ে বলছেন, যুদ্ধ করুন, দোহাই ঈশ্বরের যুদ্ধ করুন! দেখছেন না যুদ্ধ না করলে সব খতম হয়ে যাবে? পনেরো মাইল লম্বা আধমরা সৈনিক আর বেশ্যার দলকে বাগে পাওয়া গেছে। এমন সুযোগ আর কখনো আসবে না। ভালমত একটা গুঁতো মারলেই যুদ্ধ খতম হয়ে যাবে। একটা জব্বর গুঁতোই যথেষ্ট। আমার লোকজনের দিকে তাকান। ভাবছেন কি গত শীতের মত আর একটা শীতও এরা সহ্য করতে পারবে? এখুনি লড়াই না করলে মাসখানেক পরে পল্টনের অস্তিত্ব থাকবে ভাবছেন?

ওয়াশিংটনের স্বর কানে আসে। ক্লান্ত পিতার মত ওয়েনকে তিনি প্রবোধ দেন।

হ্যামিলটন তখন বলে ওঠে, আমার সমস্ত ব্যাপারটায় ঘেন্না ধরে গেছে স্যার—সত্যিই ঘেন্না ধরে গেছে। আপনি আমার কমিশন নিয়ে নিতে পারেন।

লীর কর্কশ আওয়াজ বেজে ওঠে, আপনি সব ডোবাবেন। এ পল্টনের নেতৃত্ব কি নাবালকের হাতে, না বয়স্করা এর পরিচালনা করছেন? হ্যামিলটনের মত অমন ডেঁপো কুকুর ছানার উপদেশ আমি চাই না।

এ জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে স্যার।

দোহাই—দোহাই আপনাদের, সৈনিকদের কথা ভেবে একটু আস্তে কথাবার্তা বলুন না। চেঁচাবার কি দরকার ?

তখন তাদের কণ্ঠস্বর মৃদু গুঞ্জনে পরিণত হয়। আমরা তখন তাঁবুর কাছাকাছি এগিয়ে আসি। বালির উপর শুয়ে কান পেতে থাকি। বারে বারেই আমার ঝিম আসে। চোখ খুলবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর চেঁচামেচি কানে আসে। ভাঙা ইংরেজীতে লা ফায়েত বলে, এ কখনো হতে পারে ? এর চাইতে অপমানকর আর কি হতে পারে ? আপনারা শুনুন, আমরা যদি আঘাত না হানি তো আমি বাঁচতে চাই না।

আঘাত হান···আঘাত হান! কি দিয়ে আঘাত হানবেন স্যার ? বাইরের ঐ ন্যালান্যাংটা ভিখারীগুলোকে দিয়ে ?

আমার সৈন্যদলের জন্য আমিই দায়ী থাকব। ওদের নিয়ে আমি নরকে চলে যাব। শুধু একবার আমাকে সুযোগ দিন।

স্টুবেন বলেন, চমৎকার লোক ওরা। হলপ করে বলছি, ভাল লড়িয়ে।

অবশেষে পরামর্শ বৈঠক ভেঙে যায়! তাঁবু থেকে বেরিয়ে সেনানীরা ঘোড়ার চড়ে যে যার সৈন্যদলের দিকে চলে যায় ওয়েন এবং হ্যামিলটনকে নিয়ে ওয়াশিংটন তাঁর তাঁবুর প্রবেশ মুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। কথা বলেন চাপা গলায়। আরও অনেকটা বুড়িয়ে গেছে তাঁর মুখ। শীর্ণ হয়েছে আরও। হাড় বেরিয়ে পড়েছে টান টান চামড়ার তলায়।

সেনানী দুজনের সঙ্গে করমর্দন করে ওয়াশিংটন তাঁবুর মধ্যে ঢুকে যান। হ্যামিলটন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বেগনি চোখে শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন। ওয়েন গাছের গুঁড়ির বেড়া অবধি হেঁটে যান এবং একটা গুঁড়ির পর বসে হেঁট মাথায় মাটির দিকে চেয়ে থাকেন।

ক্যাপ্টেন মূলার তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসু ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। বলে, কালকে, স্যার ?

হ্যাঁ, কালকে অনেক কিছুর জবাব মিলবে।

তাহলে আমরা যুদ্ধ করব ?

চোখ না তুলে ওয়েন মাথা ঝাঁকান।

এলির সঙ্গে আমি পাহারায় বেরোই। গাছের বেড়া থেকে সামান্য এগিয়ে আমরা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকি। গভীর নিস্তব্ধ রাত। বেজায় গরম। বাতাস নেই একটুও।

অদ্ভুত জঙ্গল, মাটিতে শিকড় বসানো নিস্তব্ধ মৃতের জঙ্গল যেন। আবার মোহকের জঙ্গল দেখতে পাব ভেবেছিলাম। ভেবেছিলাম আবারও নরম সবুজ গাছের মধ্য দিয়ে হাঁটতে পাব।

শিগগিরই আমরা হয়ত ফিরে যাব। হয়ত কালকের যুদ্ধের পরেই···

তোমার ভয় করছে আলেন ? এলি শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করে।

আমি মাথা নেড়ে সায় দিই।

কেনটন আর ওদের সবাইর কথা ভাবছ বুঝি !

কেনটনের কথা ভাবছি বটে। ফাঁসিতে মরবার অপমানের জন্য কেনটন যদি আমায় শাপ দিয়ে থাকে···

কেনটন মারা গেছে। আমার ধারণা আলেন, মরা লোক শান্তিতে বিশ্রাম করে। পাহাড়ের পর যেখানে আমরা তাকে রেখে এসেছি, গভীর শান্তিতেই আছে সে সেখানে। এতে লজ্জার

কি আছে ? মৃত্যু তো ক্লান্ত দেহের পক্ষে পরম শান্তির বিশ্রাম।

আমি যখন এ সম্পর্কে ভাবি, কেবল যুদ্ধের ছবিই মনে পড়ে। মনে হয় যেন একটার পর আর একটা যুদ্ধ চলেছে। এই যুদ্ধ যদি চলে তো গত শীতের মত আরও বহু শীতের দুর্ভোগ ভুগতে হবে। যুদ্ধের উপর আমার ঘেন্না ধরে গেছে এলি। ড্রামের বাজনাহীন দৈনন্দিন জীবনের জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করছে। ভার্জিনিয়ানদের কাছ থেকে পালিয়ে যে ছোট্ট মেয়েটি ছুটে আসে, বারে বারে তার কথা মনে পড়ে। কোন পুরুষের স্ত্রী হবার যোগ্য সে নয়। তবু তা-ই সে চেয়েছিল। আজকে মনে হয় তাকে হয়ত পুরোপুরি ভালবাসতাম এবং তাকে স্ত্রী বলে গ্রহণ করতেও বিশেষ ইতস্তত করতাম না। তাকে নিয়ে ঘর করলে সাংসারিক জীবন শান্তিময় হত এলি। সূর্য উঠবার সঙ্গে সঙ্গে গাছ পুঁততে লেগে যেতে পারতাম···লাঙলের ফালে উলটান মাটির ধূসর রঙ দেখে চোখ জুড়িয়ে যেত···তারপর দিনান্তে এমন এক স্ত্রীর কাছে ফিরে আসতে পারতাম যে পুরুষের কাছে বেশী কিছু চাইত না।

তা আর হবার জো নেই। এলি বলে,—আমি তোমায় ব্যথা দেব না আলেন। তুমিই আমার সব কিছু। কোন ছেলে আমার নেই আলেন। মাঝে মাঝে তোমাকেই পুত্র বলে মনে হয়। কিন্তু যা চাইছ তা কোনদিনই পাবে না। কোন বিশ্রাম পাবে না। আমার নিষেধ রইল আলেন, বিশ্রাম কর না। আমার চির-বিশ্রামের দিন ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তুমি বিশ্রাম করতে পার না। আমার দিন ফুরিয়েছে—আর তোমাদের দিন শুরু হচ্ছে।

তার দিকে চেয়ে আমি বারে বারে মাথা ঝাঁকাই।

এই যুদ্ধের পর তোমাদের ভাঙা টুকুরো জোড়া দিতে হবে আলেন। শক্তিমানদের সামনে বহু বছরের সংগ্রাম পড়ে আছে। তুমিও শক্তিমান হবে। তখন তোমরা খণ্ড খণ্ড টুকরো জোড়া দেবে। কোন বিশ্রাম—কোন শান্তি তোমাদের নেই।

তারপর ?

মাঝে মাঝে ভরসা হয়, স্বপ্ন বুঝি সফল হবে। আমরা শুধু ব্রিটিশদের সঙ্গে লড়াই করছি না। লড়াই করছি ওই পশ্চিমে সুন্দর এক বিশাল দেশ গড়বার জন্য। আলাদা ধরনের মানুষ সেই স্বাধীন দেশে বাস করবে আলেন। স্বাধীন দেশের নতুন মানুষ।

আমি বুঝি না। আমি বলি,—আমি ক্লান্ত এলি।

আমার উপর বিশ্বাস রাখ। এলি বলে।

সে-রাত্রে ঘুমোবার চেষ্টা করি। বেসের কথা ভেবে তাকে নিবিড় করে কাছে টেনে আনতে চাই। কিন্তু কোন কিনারা হয় না। এ শুধু অন্তহীন এক সংগ্রাম। শূন্য আদর্শের পেছনে হাতড়ে-মরা। নিজের মনে দৃঢ় আস্থা আনবার চেষ্টা করি। এলি যে ভাবে বিশ্বাস করে, যে ভাবে বিশ্বাস করে জেকব—আমিও ঠিক সেই ভাবে বিশ্বাস করতে চাই।

ভোর হতে-হতেই আমাদের ঘুম ভেঙে যায়। ওয়েন রাত্রে ঘুমিয়েছেন বলে মনে হয় না। উত্তেজিত ভাবে তিনি আমাদের লাইনের পাশ দিয়ে পায়চারি করেছেন আর মাথা নাড়ছেন। মাঝে মাঝে আমাদের বন্দুকের দিকে তাকাচ্ছেন এবং বিনা প্রয়োজনে ফিসফাস করে কথা

বলছেন। অস্থির হয়ে পড়েছেন তিনি। মুখ বেয়ে দরদর ধারায় ঘাম পড়ছে।
কোমর অবধি নগ্ন অবস্থায় আমরা যুদ্ধের গোছগাছ করি। অধিকাংশেরই খালি-পা। মোজাও নেই। ব্রিচেসও নেই অনেকের। ছেঁড়া এক রকমের কিলট্ (হাইল্যাণ্ডার সৈনিকদের পোষাক-ঘাঘরা) পরে তারা লজ্জা নিবারণ করেছে। একঘেয়ে সুরে ব্রিগেডের ক্যাপ্টেন বলে যাচ্ছে ঃ বারুদ শুকিয়ে নাও আর শুকনো রাখার ব্যবস্থা কর। বিশ রাউণ্ডের কম গুলি যার আছে, সে এখুনি রিপোর্ট কর। বন্দুকগুলো পরীক্ষা করে দেখ—দেখ ঠিক মত জ্বলে কিনা।
সৈনিকদের হাতে রেতি দেওয়া হয়। সবাই নিজের নিজের চকমাকি ছুঁচলো করে নেয়। আমিও আমারটা পরখ করে দেখি। তেমন চট করে জ্বলে না। আমার ভিজা হাত কাঁপছে। তখন একটা রেতি নিয়ে চকমাকি ছুঁচলো করবার চেষ্টা করি। এলি আমার হাত থেকে চকমাকিটা নিয়ে দুটো ঘষায় ছুঁচলো করে দেয়। অদ্ভুত শান্ত এলি। মুখখানা সামান্য বিষণ্ণ এবং কতকটা বিস্মিত। জেকবের চোখ দুটো জ্বলছে। মনে হয় যেন জ্বর হয়েছে।
ওয়েন স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছেন না। চীৎকার করে বলেন, বেয়নেট—নিজের নিজের বেয়নেট ভাল করে লাগিয়ে নাও। একটা বন্দুক পরীক্ষা করে তিনি ফেলে দেন। অনবরত ছুটাছুটি করছেন পাগলের মত।
আমরা তখন নিজের নিজের গোলাগুলি গুণে দেখি। শিঙে-ভরা আমার নিজের বারুদটুকুও মেপে দেখলাম। আঙুল দিয়ে খানিকটা তুলে দেখলাম শুকনো আছে কি না। বারুদ শুকনো আছে বটে, কিন্তু আঙুল ভেজা। সারা গা ভিজে চুপচুপ হয়েছে। পট্টির মত ব্রিচেস লেগে রয়েছে পায়ের সাথে। জলে ভেজা আস্তরণে আমার গোটা দেহ ঢাকা।
অস্থির ভাবে আঙুল দিয়ে বন্দুক নাড়াচাড়া করি। জেকব বলে, গুলি ভরে রাখ। যত্ন করে গুলি ভরে রাখ আলেন। পয়লা গুলির উপরেই বাঁচা-মরা নির্ভর করে। প্রথম বারে যদি না জ্বলে তো আর জ্বলবে না।
জেকবের কথা শুনে গুলি ভরে রাখি। বন্দুকটা আমার বাবার। মোটা ফুটোওয়ালা সেকেলে বন্দুক। একসঙ্গে তিন তিনটে গুলি ভরলাম। শঙ্কিতভাবে এলিকে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনটে গুলি ভরেছি, খুব বেশী হয়েছে কি ?
মাস্কেটটা বেশ পোক্ত আছে আলেন।
আমার বেজায় বিচ্ছিরি লাগছে এলি। আমাকে দিয়ে আর কিছু হবে না। ইচ্ছে হয়, বনের ঠাণ্ডায় বসে একটু বিশ্রাম করি। নড়বার কোন আগ্রহই নেই এলি।
এই-ই প্রথম লড়াইতে যাচ্ছ না তো ! সংক্ষেপে বলে জেকব।
সাত মাস আগে একবার লড়াই করেছি।
শান্ত হও ছোকরা—শান্ত হও। এলি প্রবোধ দেয় আমাকে।
তারপর আমরা সার বেঁধে দাঁড়াই। তখনও চীৎকার করে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, গুলির ভাণ্ড শুকিয়ে নাও...মেপে দেখ কটা গুলি আছে···
সৈনিকদের কেউ কেউ নুনমাখা মাংস চিবোচ্ছে। আমারও পেট খালি। বেদম ক্ষিদে পেয়েছে। নিজের গাঁটরির কাছে গিয়ে এক টুকরো মাংস তুলে আনি। কিন্তু জেকব থাবা দিয়ে মাংসের টুকরো হাত থেকে ফেলে দেয়।

বেজায় তেষ্টা পাবে।
বড্ড খিদে পেয়েছে জেকব।
খেও না। সঙ্গীদের একজন বলে ওঠে,—খাওয়া পেটে গুলি লাগলে বেজায় বিচ্ছিরি লাগে।
সেনানায়রা ওয়াশিংটনকে ঘিরে ধরেছে। ওয়েন তর্ক করছেন! রাগে গড়গড় করে চার্লস লী গটমট করে দূরে সরে যায়। তার পরামর্শ উপেক্ষা করে লড়াই করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ওয়াশিংটন তাকে ডেকে ফেরান। হ্যামিলটন গোমরা মুখে তাঁবুর কাছে একলা দাঁড়িয়ে আছে। স্টুবেন আছেন তার লোকজনের কাছে। দূরে থাকবার উপায় তার নেই।
ছেলেরা, মনে থাকে যেন…
সবে সূর্য উঠছে। রঙের ছোপ লেগেছে পাইন বনের মাথায়। হাওয়া নেই একেবারেই। এত সকালেও অসহ্য গরম লাগছে! পাইন গাছের তীব্র গন্ধের সঙ্গে মিশেছে বারুদ আর ঘামের গন্ধ। মনে খুঁত-খুঁতি নিয়ে আমরা চলাফেরা করি। একদৃষ্টে চেয়ে থাকি নিজের বন্দুকের দিকে। যেন এর আগে কোন দিন বন্দুক দেখিনি।
সহসা ওয়েন নিজের ঘোড়ার কাছে যান এবং ঘোড়ায় চড়ে লাইনের সামনে এগিয়ে যান। লা ফায়েতও তার অনুসরণ করে। লী পেছন থেকে তাদের ডেকে কি যেন বলেন। তারপর লীও ঘোড়ায় চড়েন। সৈন্যনের তখন মার্চ করবার হুকুম দেওয়া হয়। জিনের পর বসে খানিকটা হেসে ভার্জিনিয়ার এক লম্বা স্কাউটকে ওয়েন যেন উদ্বিগ্নভাবে কি বলছেন। ওয়াশিংটন আমাদের লক্ষ্য করছেন। তাঁর মুখে দুশ্চিন্তার মেঘ। ঘোড়া ছুটিয়ে লী এক পাশে সরে যান। কারও সঙ্গে কথা বলেন না। দুঃসহ ক্রোধে তার অদ্ভুদ কদাকার মুখখানা কুঞ্চিত। বেজায় কুৎসিত লোকটা। নিজের কুৎসিত মনের আগুনে নিজেই পুড়ে মরছে। পেশাদার সৈনিক লী। স্টুবেন না-আসা অবধি পেশাদারী পরামর্শের জন্য অন্তত তার কদর ছিল। কিন্তু যুদ্ধ করা না-করার পরামর্শ এখন স্টুবেনই দেন এবং তার পরামর্শ অনুসারেই ওয়াশিংটন লী র যুদ্ধ না করার যুক্তি অগ্রাহ্য করেছেন। হ্যামিলটন, লা ফায়েত এবং ওয়েনের প্রতি তার ঘৃণা এত স্পষ্ট যে বুঝতে আদৌ কষ্ট হয় না।
দ্রুত এগোচ্ছি আমরা। সামনে যা পান ওয়েন যেন তার মধ্যেই ঝাঁপিয়ে পড়তে উদগ্রীব! বেজায় গরম। প্রথমে আমরা পাইন বনের মধ্য দিয়ে এঁকে বেঁকে এগোই। তারপর ঢুকে পড়ি বার্চ ও মেপল বনে। তারপর একটা খাদের মধ্যে নামি। খাদ পার হয়ে ওপারে গিয়ে আবার সার বেঁধে চলতে থাকি। ওয়েন তখন সৈন্যদলে মুখ ঘুরিয়ে দেন। পাখার মত ছড়িয়ে আমরা অর্ধবৃত্তাকারে চলতে থাকি। সামনে আর একটা বন পড়ে। এখন পর্যন্ত শত্রুর কোন হদিস মেলে নি।
বন পার হয়ে খানিকটা দূর আমরা পথ ধরে চলি। তারপর আর একটা পাহাড়ে খাদ পার হই। এ খাদের তলায় কাদা ভরতি। হাঁটু অবধি কাদায় দেবে যায়। পা টেনে টেনে কোনমতে পার হই। সারা গায়ে কাদার ছিটে লাগে। ব্রিগেডের কমাণ্ডাররা পরস্পরকে ডাকাডাকি করে। তরোয়াল ঘুরিয়ে ওয়েন আমাদের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখবার চেষ্টা করেন। লীর সাদা ঘোড়াটা সারা গায়ে কাদা ছিটিয়ে প্রাণপণে কাদার মধ্য দিয়ে এগোবার চেষ্টা

করছে। পেছন ফিরে আমাদের দিকে না চেয়ে এগিয়ে চলেছেন তিনি। উদাসীনের মত ক্লান্তভাবে বসে আছেন জিনের উপর।

ঘণ্টাখানেক হলো চলছি। তারও কিছু বেশী হতে পারে। সময়ের জ্ঞান নেই। কিন্তু চোখ তুলে দেখি যে গাছের ফাঁকে সূর্য উঁকি মারছে। রাস্তার চাইতে খাদের তলা অনেক ঠাণ্ডা। রাস্তা তেতে আগুন হয়েছে।

একবার আমি হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। জেকব ধরে তোলে। বলে, আমার কাছে থাক আলেন—কারও অসুবিধা হবে না। আমার কাছে কাছে থেক।

ওয়েন হেঁকে বলেন,—বারুদ যেন শুকনো থাকে। দোহাই ভগবানের, বন্দুকে যেন কাদা না লাগে।

তার হুঁশিয়ারির প্রতিধ্বনিতে হাঁক ওঠে, নিজের নিজের বারুদ সামলাও···চকমকি পরিচ্ছন্ন রেখ···

খাদ পার হয়ে আমাদের ব্রিগেড উপরে উঠছে। সবার কোমর অবধি কাদায় ভেজা। হোঁচট খেতে খেতে বনের মধ্য দিয়ে এগোই। সহসা গোটাকয়েক গুলির আওয়াজ কানে আসে। এ সঙ্কেতের অর্থ এই যে আমাদের অগ্রগামী স্কাউট শত্রুসৈন্যের পশ্চাদ-রক্ষীদের সংস্পর্শে এসেছে।

আমাদের এখনকার অবস্থা অনেকটা ফাঁদে পড়ার মত। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে উঠছি কিন্তু পেছনে কাদা-ভরতি খাদ। মূল সৈন্যদল এখনও অনেকটা পেছনে। কমপক্ষে মাইলটাক হবে। এই কথা মনে হবরে সঙ্গে সঙ্গে মাথায় আগুনের ঝিলিক খেলে যায়। চট করে সবাই থেমে পড়ে। পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। মুখ হাঁ-হয়ে যায়। আমি তখন শুধু খাদটি আবার পার হয়ে যাবার কথা ভাবি। ঐ একটি মাত্র চিন্তা জাগে মনে। সবাই হয়ত এক কথাই ভাবছে।

ওয়েন ঘোড়া ছুটিয়ে আমাদের সামনে এগিয়ে যান এবং উন্মত্তের মত চীৎকার করে বল্লেন, ওপরে ওঠো—চটপট ওপরে ওঠো।

হঠাৎ আমি অবাক হয়ে ভাবি, কেমন করে এলাম এখানে? কে আমাকে এমনি একটা ফাঁদে ফেলেছে যে কাদায় আটকে গুলি খেয়ে মরা ছাড়া গত্যন্তর নেই?

স্বপ্নাবিষ্টের মত বারে বারে মাথা ঝাঁকাচ্ছে এলি।

জেকবও ওয়েনের সঙ্গে গালমন্দ চেঁচামেচি শুরু করেছে। সে আমাদের সবাইর সামনে। পা টিপে টিপে এগোচ্ছে। মনে হয় যেন গাছের ফাঁক নিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে! যেন তার নিজের কোন ইচ্ছাশক্তি নেই—শুধু গড়িয়ে যাচ্ছে।

তবু আমরা এগোই। ওয়েনই যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছেন। হোঁচট খেয়ে, আছাড় খেয়ে কোন মতে পাহাড়ের মাথায় চড়ি। কোনমতে বন্দুক সহ নিজেদের দেহ টেনে নিয়ে আসি। সেখানে আবার সার বাঁধা হয়। ক্রমেই আরও লোকজন এসে পড়ে। লাইন বেঁধে সামনে চেয়ে দেখি যে ভার্জিনিয়ার স্কাউটরা গাছের মধ্য দিয়ে ছুটে আসছে। তাদের পেছনে অস্পষ্ট একটা লাল পোষাকের আভাও নজরে পড়ে।

ব্রিটিশদের রণভেরীর শব্দ যেন সকালের বাতাসে উত্তাপের তরঙ্গ সৃষ্টি করে। রণভেরীর শব্দে আমাদের মাথা দপদপ করে। মাটিও যেন কেঁপে ওঠে। ঘুর্ণায়মান চাকার ঘর্ঘর শব্দের

মত দামামার বিরামহীন শব্দে চিন্তা-ভাবনা যেন অতলে ডুবে যায়। মনে হয় যেন এই বাতাস কাঁপানো শব্দ উত্তাপের উৎস। ঘোড়া থেকে নেমে ওয়েন আমাদের সামনে হন্তদন্ত হয়ে ছুটাছুটি করে অনুনয়ের সুরে বলেন, এইখানেই রুখতে হবে। খেয়াল রেখ, এইখানেই রোখা চাই।

কাদা-মাখা সাদা ঘোড়াটার রাশ টেনে চার্লস লী হেঁকে বলেন, এখুনি এখান থেকে সরে পড়তে হবে জেনারেল! যে করে হোক সরে পড়া চাই। আমাদের দশা ফাঁদে-পড়া ইঁদুরের মত। এখুনি পিছু হটা দরকার।

তারস্বরে চীৎকার করে ওয়েন বলেন, ইচ্ছে হয় আপনি পিছু হটতে পারেন! পিছু হটে নরকে যান আপনি।

মনে রাখবেন, আমিই এখন সেনাপতি।

আপনি জাহান্নামে যেতে পারেন স্যার! ওয়েন কেঁদে ফেলেন।

ব্রিটিশরা তখন শ'খানেক পা দূরে। সঙিন উঁচিয়ে তিন সারে এগোচ্ছে। রোদে ঝিকিয়ে উঠছে তাদের কিরিচ। ইংরেজের রণভেরীতে তখন মার্চের বাজনার বদলে চাপা কুর-কুর কুর-কুর আওয়াজ হয়। এ বাজনা যেন আমাদের উপহাস করছে। তাড়াহুড়া না করে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে আসছে তারা!

আগুয়ান শত্রুসৈন্যর গুণবার চেষ্টা করি। গুণব কি, তাদের লাইনের কি অন্ত আছে? ব্রিটিশ বাহিনীর পশ্চাদরক্ষী সমস্ত সৈন্য এগিয়ে এসেছে পেনসিলভানিয়া আর নিউ ইংলণ্ডের গুটিকয়েক ব্রিগেডকে আক্রমণ করতে। আমাদের পল্টন কোথায়? বোকার মত এ কি ভাবে খতম হতে যাচ্ছি?

কি করতে হবে কিছুই জানি না। সেনাপতি হিসাবে লী পিছু হটার আদেশ দিয়েছে। লা ফায়েত আর ওয়েন পাগলের মত রাগে গরগর করছেন। চীৎকার করে রুখতে বলছেন আমাদের। লাইনের নীচে দাঁড়িয়ে স্কট মাথা ঝাঁকাচ্ছেন। গরমের চোটে আমাদের বুদ্ধি বিবেচনা লোপ পেয়েছে। এখনও যেন আমরা ফোর্জ উপত্যকার নরকের স্বপ্নে বিভোর। গরমের ওষুধ ঠাণ্ডা। নরক যেমন গরম তেমনি আবার ঠাণ্ডা। কেউ কেউ বন্দুক ফেলে খাদের দিকে দৌড় দেয়। কেউ কেউ আবার হাতের বন্দুক ফেলে দিয়ে অবাক বিস্ময়ে ব্রিটিশদের দেখছে। পল্টনের কি করতে হয়—কখন কি করা উচিত, তা আমরা ভুলে গেছি। জানি শুধু কষ্ট ভোগ করতে।

এবারেও কষ্ট ভোগ করি। পুরানো দুঃখ-কষ্টের জের টেনে চলেছি। নিজেরাই আটকা পড়েছি নিজেদের বাঁধনে। চোখের উপর দিয়ে পরিখা জীবনের দিবা-রাত্রির স্মৃতির মিছিল চলে যায়। মনে পড়ে শীতের রাতে পাহারা দেবার কথা। আরও মনে পড়ে সেই সব দিনের কথা যখন মাতাল জানোয়ারের মত উপোস করে কাটাতে হয়েছে! মানুষ মরলে তাদের কবর দেওয়া যায়নি—লাশ পাঁজা করে রাখা হয়েছে। নতুন একটা জাতির জন্ম দেবার দায়িত্ব যাদের মাথায়, তাদের শুধু মানুষ বই আর কিছু বলা যায় না। মেয়েদের মত সহ্যগুণও আমাদের নেই। ব্যথা সত্ত্বেও তারা সন্তান জন্ম দেয়। তারপর আবার ব্যথার শয্যা ছেড়ে নতুন করে পূর্ণ স্বাস্থ্যে উঠে দাঁড়ায়। দুঃখকষ্টের শেষে কোন ভবিষ্যৎ দেখবার শক্তি আমাদের নেই। পারি না বেদনার অভিজ্ঞতা থেকে নতুন স্বপ্নের জাল বুনতে। নতুন

স্বপ্নের ব্যথা আমাদের আর উদ্দীপ্ত করে না। পরাভূত বিজিত জনতা আমরা।
ব্রিটিশরা এগিয়ে আসে। স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তাদের ফৌজদারদের কড়া গলার হুকুম। অদ্ভুত কণ্ঠস্বর। পরদেশী উচ্চারণভঙ্গী! ভিন্ন জগতের কথা। প্যারেড করে এগোচ্ছে ব্রিটিশসেনা। অকুতোভয়ে এগিয়ে চলেছে বিজয়ের পথে!
আচমকা কান্নাজড়িত একটা কণ্ঠস্বর কানে আসে। ওয়েনের আর্তনাদ। এখন তিনি সবই বুঝেছেন। এখন আর আমাদের বিরাট কিছু করতে বলবেন না। বুঝছেন যে ছোটখাটো লোকের কাছে বিরাট কিছু চাওয়া অর্থহীন। তিনি দেখছেন যেন ফোর্জ উপত্যকা থেকে একটা বিভীষিকা উঠে তাকে অভিভূত করে ফেলছে। সে ভয় তিনি জয় করলেন। অকুতোভয় ওয়েন। ভয়লেশহীন পাগল। কিন্তু সাধারণ লোকজনের জানোয়ার হয়ে যাবার ছবি ওয়েনের চাইতেও বড় কথা। প্রাণপনে তারা চেষ্টা করছে কোনমতে নরক থেকে মুক্তি পাবার।
সত্যিই আমরা নরকে আছি। ওয়েনও আছেন সঙ্গে। কৃতকর্মের পাপ থেকে লীও রেহাই পায়নি। লোকজন নেতৃত্বহীন।
পঞ্চাশ পা সামনে থাকতে ব্রিটিশরা বেয়নেট চার্জের জন্য তৈরী হয়। এখন তাদের বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। উচু ছুঁচলো টুপি এবং সোনালী ফিতে লাগান লাল কোটের ফাঁকে প্রতিটি মুখ দেখা যাচ্ছে। দেখি, তামাক চিবোবার সময় একজনের চোয়াল নড়ছে। ভেরী বাজিয়েদেরও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটানা বাজিয়ে চলেছে তারা। স্পষ্ট দেখছি, মার্চ করবার সময় তাদের বারুদের কেসগুলো নড়ছে। টুপির তলায় একটি সৈনিকের হলদে চুল নড়ছে, তাও দেখতে পেলাম।
আমরা গুলি করতে শুরু করি। কোন তাক না করে অকারণে এলোপাথারি গুলি ছোঁড়ে সৈনিকেরা। ব্রিটিশ পক্ষের জনকয়েক মাটিতে পড়ে যায়। একজন পেট চেপে ধরে টলতে টলতে লাইন ছেড়ে যাছে হেলান দিয়ে বসে পড়ে। বাকী আর সবাই তখন আমাদের দিকে ছুটে আসে। সার বাঁধা বহ্নিশিখার মত বেয়নেট ঝলসে ওঠে তাদের বন্দুক। ধোঁয়ার আড়াল থেকে বারবার গুলি করে ইংরেজ-সেনা।
আমিও গুলি ছুঁড়ি। যে কোন কারণেই হোক, বন্দুকটা কাঁধে ধাক্কা মেরেছে দেখে অবাক হয়ে যাই। হঠাৎ দেখি, আমি আর এলিই শুধু রয়েছি। জেকব চিৎ হয়ে মাটিতে পড়ে আছে। তার মাথায় একটা ফুটো। সেই মুহূর্তে জেকবকে চিনতে পারি। মশালের মত সে বেঁচেছে; আবার দপ করে নিভেও গেছে মশালের মত! সাধারণ লোকজন, এমনকি ওয়েন বা ওয়াশিংটনের চাইতেও আলাদা জেকব। সে ছিল বিপ্লবের একক বহ্নিশিখা। জেকব ছাড়া এমনি আরও কিছু লোক দেখেছি। নিশ্চয়ই এমনি আরও অনেক লোক ছিল। সেদিন যখন এলি আমাকে বলে যে কোন শান্তি, কোন বিশ্রাম নেই, তখন সে যে কি বলতে চেয়েছে এখন তা···
এলি আমাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ইংরেজরা প্রায় আমাদের উপর এসে পড়েছে। কাস্তের মত কেটে চলেছে বেয়নেট দিয়ে। আমাদের খানিকটা সামনে এক ভার্জিনিয়ান স্কাউটকে কেটে ফেলেছে। রাইফেলটা মুগুরের মত ঘুরাবার সময় চার চারটে সঙিন বসিয়ে বসিয়ে দিয়েছে। ভার্জিনিয়ানদের সঙিন নেই—আছে শুধু লম্বা সরু নলের রাইফেল।

প্রবল শক্তিতে এলি টেনে নিয়ে যাচ্ছে আমাকে। দুজনেই অন্ধের মত ছুটছি আর আছাড় খাচ্ছি—আবার উঠে দৌড়োচ্ছি। আমাদের সামনে আরও অর্দ্ধোলঙ্গ লোক রয়েছে। তারাও হন্যে হয়ে দৌড়োচ্ছে আর ভীতিবিহ্বল জানোয়ারের মত চেঁচাচ্ছে। ছুটতে গিয়ে আছাড় খাচ্ছে…গাছে ধাক্কা লাগছে…গা ছড়ে যাচ্ছে…রক্ত পড়ছে, তবু ভীতি বিহ্বল লোক-জন দৌড়োচ্ছে শুধু একটি মাত্র চিন্তা নিয়ে—কি করে পালানো যায় ইংরেজ বেয়নেটের নির্মম মৃত্যুর থেকে। কি করে অব্যাহতি পাওয়া যায় এই কচু কাটা থেকে।
ছুটতে ছুটতে আমরা খাদের পাড়ে আসি এবং টলতে টলতে পড়ে যাই। খাদের পাড়ে দাঁড়িয়ে পলকের জন্য ওয়েনকে দেখতে পাই। ঘোড়ার পিঠে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। বলছেন, এর মানে কি ? আমার সৈন্যদল কোথায় ? কোথায় আমার লোকজন ?
ঢালু পাড় দিয়ে আমরা গড়িয়ে চলেছি। ধাক্কা খাচ্ছি গাছে। হুড়মুড় করে কাদা জায়গাটা পার হবার চেষ্টা করছি। কাদা ভরতি খাদটিতে লোক থৈ থৈ করছে। ভীতি-বিহ্বল নোংরা হতভাগার দল। অন্ধের মত হুড়োহুড়ি করছে। আমার দশাও আর দশজনের মত। অপর পারে যাবার জন্য আমি গোঁ ধরি কিন্তু এলি আবারও টেনে ধরে।
ইংরেজরা খাদের মাথায় সার বেঁধে দাঁড়িয়েছে এবং কাদা পার হয়ে যারা অপর পারে উঠবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে, বেছে বেছে নির্মমভাবে গুলি করছে তাদের। তবুও শত শত লোক সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ছুটে পালাচ্ছে। হাত দিয়ে দেখিয়ে এলিকে বলি, ঐ দিক দিয়ে চল এলি।
কাদার মধ্য দিয়ে এলি আমায় টেনে নিয়ে যায়! দুজনেই হাঁটছি খাদ দিয়ে। ঠিক আমার সামনের লোকটি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। মনে হয় যেন পিঠে হাতুড়ির পিটুনি খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল। লোকটি সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু টাল রাখতে না পেরে আবার পড়ে যায় এবং কাদায় ডুবে যায়। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে আসছে কাদার মধ্যে। জলকাদা ছিটকে উঠছে। আবাক হয়ে দেখছি এই দৃশ্য। এ দৃশ্য আমার চেনা। নরকের অভিজ্ঞতা আগেও একবার হয়েছে।
কোমর অবধি কাদায় ডেবে কয়েকশো লোক খাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। সবাই পেনসিলভানিয়ার ব্রিগেডের লোক। যে করেই হোক তারা সেখানে জড়ো হয়েছে। ফৌজদাররা তাদের তাড়িয়ে খানিকটা শৃঙ্খলা আনবার চেষ্টা করে।
আমরা দুজনেও তাদের দিকে এগিয়ে যাই। মিশে যাই। মিশে যাই তাদের ভীড়ে। চার পাশে লোকজনের ভীড়। তাদের গুলি চালাতে দেখে খানিকটা আশ্বস্ত বোধ করি।
আমাদের চোখের সামনেই বহুলোক পাগলের মতো পালাচ্ছে। আমরা যেন দর্শক আর ওই ভীতিবিহ্বল পলায়নপর জনতা যেন মঞ্চের অভিনেতা। এক পা দু'পা করে আমরা খাদ ধরে পেছু হটছি আর ফৌজদাররা চেঁচিয়ে বলছে, গুলি ভর…গুলির পাত্র মুছে নাও… চকমকি সাফ কর…আস্তে-সুস্থে গুলি ভরে বন্দুক চালাও…
আমার বন্দুকটা গাদাই। অকস্মাৎ শান্ত হয়ে পড়ি। মনের প্রচণ্ড আগুন যেন দপ করে নিভে যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি, একটু আগে কেন পালিয়েছি ? কিসের ভয় ? এমন কি আছে যা আমায় ভয় দিতে পারে ? আর কিসের আঘাত দিতে পারে ? আর কিসের বা ব্যথা দিতে পারে ? মৃত্যু তো চির-বিশ্রাম। আমার জীবনে আর কোন বিশ্রাম নেই।

এই নারকীয় উত্তাপ সত্ত্বেও আমার ভেতরটা বরফের মত ঠাণ্ডা।

এলি বলে, জেকব মারা গেছে। এমন ছাড়া ছাড়া ভাবে সে কথাটা বলে যেন ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে পারেনি।

হাঁ, সে মারা গেছে! আমি গাঢ় কণ্ঠে বলি। এই সবের মধ্যে তার মত লোকের বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। মরে যাওয়াই তার ধর্ম।

ভগবান তাকে শান্তি দিন।

এখন সে শান্তিতেই আছে।

সযত্নে আমি গুলি ভরি! আমার মনের এই আকস্মিক শান্তিও ভীতিজনক। প্যারেডের সময় যে ভাবে গুলি ভরেছি, এখনও সেই ভাবেই ভরছি। তখনও খাদের মধ্য দিয়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছি আমরা। কতজন হব জানিনা। তা তিন চারশোর কম নয়। মুলার রয়েছে সঙ্গে। আর দুজন ফৌজদারও আছে। অবিচলিত ভাবে আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে মুলার। লোকটার সাহস আছে।

ব্রিটিশরা তখন খাদ পার হবার চেষ্টা করে। কিন্তু পাশ থেকে গুলি করে আমরা তাদের তচনছ করে দিই। চোখের সামনে দেখছি, কাদামাথা লালকোট পড়ে যাচ্ছে এবং খানিকটা দাপাদাপি করে বুকে হেঁটে উঠবার চেষ্টা করছে। খাদটি ধোঁয়ায় ভরে যায় আর মানুষগুলো ভূতের মত তার মধ্যে চলাফেরা করে। ওপর থেকে ব্রিটিশরা আমাদের লক্ষ্য করে চোরা গুলি ছাড়ছে। কিন্তু সে-গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এখানে সেখানে দু'চারটি লোক আর্তনাদ করে কাদার মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে…দাপাদাপি করে মাথা তুলবার আগ্রহে…আপ্রাণ চেষ্টা করে শ্বাস রোধী কাদা থেকে মুখ তুলবার।

যন্ত্র চালিতের মত গুলি ভরে যাচ্ছি। হুঁশিয়ার হয়ে তাক করছি। লক্ষ্য খুঁজছি ধোঁয়ার মধ্যে। দেখছি কোথাও একটা লাল কি সবজে উর্দি পাওয়া যায় কিনা। আমাদের পল্টনের কথা ভেবে অবাক হচ্ছি। তারা কি আমাদের ছেড়ে গেছে নাকি? ভুলে গেছে আমাদের কথা? না পথ হারিয়েছে? যুদ্ধের শব্দও কি তাদের কানে যায় না? ওয়েনই বা কোথায়? লা ফায়েত, চার্লস লী—এরাই বা কোথায় গেল? স্টুবেন…গোলন্দাজ দল… তারাই বা কোথায়? হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেনারাই বা কোথায় এখন?

নিজেদের হঠকারিতার ফল কি হচ্ছে তা স্বচক্ষে দেখা ওয়েন বা লা ফায়েতের পক্ষে অসম্ভব। শত হলেও সৈনিকরা মানুষ তো! মানুষ এমন জানোয়ার হতে পারে না যে কোন ভয়-ভীতি বা বাধ্য বাধকতা ছাড়া পরস্পরকে খুন করবে। ফোর্জ উপত্যকা আমাদের কি সর্বনাশ যে করেছে, স্বচক্ষে তা দেখতে পারবেন না বলেই কি তারা সরে পড়েছেন?

লড়াই করতে করতে আমরা খাদ ধরে হটে আসি। সময় অর্থহীন হয়ে পড়ে। কতক্ষণ হেঁটেছি কারও খেয়াল নেই। মনে হয় যেন অনন্তকাল আঠালো কাদার মধ্য থেকে এক পা টেনে তুলছি আবার সেই পা ফেলছি; আর বন্দুক তেতে আগুন না হওয়া অবধি গুলি ভরছি। এত গরম অসহ্য। গা-পোড়ান এই তীব্র গরম যেন প্রাচীরের মত আমাদের ঘিরে রেখেছে। উত্তাপ যেন আকার পেয়েছে।

চোরা-গুলির বিরাম নেই। মাছির মত ব্রিটিশরা আমাদের পেছনে লেগে থাকে। কাদার মধ্যে গুলি লেগে পটপট আওয়াজ হয়। আমার সামান্য কয়েক ফুট দূরে মুলারের গায়ে

গুলি লাগে। এলি এগিয়ে গিয়ে তাকে তুলবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে ঝাঁকানি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে চেঁচিয়ে বলে, আমি মরতে চলেছি—দেখছ না ? টেনে তুলছ কি করতে ? আস্তে আস্তে সে কাদায় ডুবে যায়। সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, এর বরাতে কবরও জুটবে না। এর শেষ শয্যা চিহ্নিত করবে না কোন প্রস্তর ফলক বা কাঠ দিয়ে তৈরী ক্রশ। জীবিতকালে ভাল থাক কি মন্দ থাক, আর দশজনের মত তার গুণগান করে কোন কবিতার ছত্র রচিত হবে না। কোন স্মৃতি চিহ্নই থাকবে না লোকটার। আর কিছুদিন পরে লোকের মন থেকেও লোপ পাবে তার স্মৃতি। একাকীই যেতে হল মুলারকে।

উদ্দেশ্যহীন অদ্ভুত প্রেরণা অনেক সময় মানুষকে উদ্দীপ্ত করে তোলে। অনেকটা সেই রকম প্রভাবেই মরিয়া হয়ে আমরা এগিয়ে চলেছি। খাদের শেষ কিনারে এসে আমরা শক্ত মাটির দিকে রওনা হই। এখানে গুলির উৎপাত কম। কিছু লোক লক্ষ্যহীনের মত ঘুরে বেড়ায়। তাদের ডাকি আমি। নিজের কণ্ঠস্বর শুনে নিজেই অবাক হয়ে যাই। তখন এদের তাড়িয়ে আমি একটা লাইন গড়ে তুলি। বিনা আপত্তিতে আমার হুকুম শোনে তারা। এলি বাঁকা চোখে আমার দিকে তাকায়। তাকে বলি, এদের একসাথে রাখ। দেখছ না, একসাথে থাকা ছাড়া এখন আর উপায় নেই।

ছাড়া ছাড়া ভাবে সে মাথা নাড়ে। একটা বেড়ার পাশ ঘেষে আমি তাদের লম্বা লম্বা ঘাসের জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাই। যুদ্ধের কোলাহল আমাদের ডাইনে। বেশ কিছুটা দূরে। বিরাট শব্দ কখনও কখনও তা কমছে আবার কখনও বাড়ছে। কখনও খুব কাছে এগিয়ে আসছে কখনও বা দূরে সরে যাচ্ছে। এই কোলাহল কলরোলের মাঝে মাঝে গর্জে উঠছে তোপের বিকট আওয়াজ। ক্রুদ্ধ পশুর গর্জনের মত তোপদাগার ভয়াবহ শব্দে কানে তালা লাগে।

এখানে বেশ গরম। খাদের চাইতে গরম অনেক বেশী। রোদের হাত থেকে বাঁচার মত কোন ছায়া নেই। সূর্যও যেন শত্রুর দলে যেয়ে ভীড়েছে। সাথের লোকজনদের দিকে ফিরে তাকালাম। শ'কয়েক তাপদগ্ধ নোংরা ক্লান্ত উদভ্রান্ত লোক। অবাক হয়ে ভাবি, আমি কেন এদের পরিচালনা করছি ? ব্রিগেডের কমাণ্ডাররা কোথায় ? মুলারকে পড়ে যেতে দেখেছি—সে মারা গেছে ! কিন্তু আর সবাই গেল কোথায় ? তাদের তো থাকা উচিত। চারদিক চেয়ে তাদের খুঁজি। এলিকে জিজ্ঞাসা করি, ক্যাপ্টেন ডীন—মার্সি এরা সব কোথায় ?

এলি মাথা ঝাঁকায়।

গেইন ব্রো ?

আবারও মাথা ঝাঁকায় সে।

আমাদের সামনে ফলের বাগান। পুরানো একটা গোলাবাড়ী আর আপেলের বাগান। কিছু লোকজন আছে সেখানে। আমাদেরই মত অর্ধনগ্ন বেশ কয়েকশো ক্লান্ত লোক। উবু হয়ে বন্দুক তাক করে আছে।

রোড দ্বীপের লোকজন এরা। এলি বলে।

আক্রমণের প্রতীক্ষা করছে। মনে মনে ভাবি—জানেনা আক্রমণ কি জিনিস, তাই এই ভাবে অপেক্ষা করছে।

কাদা ও রক্তমাখা একটি লোক ঘোড়ায় চড়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। আমি পেছনের লোকজনদের থামতে বলি। অবাক হয়ে তারা আমার দিকে চেয়ে থাকে হাঁ করে। মুখ দিয়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলে। ক্লান্ত চোখে হাঁপায়।
আমি চেঁচিয়ে বলি, এই, জলদি বসে পড়ো। বসে একটু জিরিয়ে নাও। কথা বার্তা বোলো না। আরে বাবা, এখনও মরে যাওনি তো।
লোকটি ঘোড়া থেকে নামে। কাদার মধ্যেও এখন ওয়েনকে চিনতে পারি। তিনি বলেন, এরা কারা ? তুমি কে ?
চৌদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া স্যার। এই যা আছে তাই।
ওরাও পেনসিলভানিয়ার লোক, তাই না ? কি করে এখানে এলে ?
পেছু হটার পর আমরা খাদ বরাবর লড়াই করে সরে এসেছি স্যার। তারপর ঐ বনের মধ্য দিয়ে এদিকে এলাম।
তোমাদের ফৌজদাররা কোথায় ?
মারা গেছে।
কে তোমাদের পরিচালনা করেছে ?
তারা মারা যাবার পর ? আমিই করছি স্যার। যদিও পরিচালনার তেমন দরকারও ছিল না।
অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে ওয়েন মাথা নাড়েন। ভাঙা-ভাঙা গলায় বলেন, তোমরা আমার লোক—সবাই আমার লোক। একলাই তোমরা লড়াই করে সরে এসেছ ! হা খ্রীস্ট ! আমি পলায়নপর একটি দলের সঙ্গে যখন পালিয়ে যাচ্ছিলাম তখন তোমরা আমাদের পাশ থেকে রক্ষা করেছ। তোমাদের ফৌজদাররা কোথায় গেল ? শিগগির বল !
তারা মারা গেছে।
তোমার নাম কি ?
আলেন হেল।
বেশ বুঝছি, তিনি স্মৃতির ভাণ্ড খুঁজছেন। গরমে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন ওয়েন। বার কয়েক মাথা ঝাঁকান তিনি।—আলেন হেল···একবার পালানো আর খুনের দায়ে তোমার বিচার হয়েছিল...
হাঁ স্যার !
জানি ! ফিসফিস করে তিনি বলেন। তারপর আমার পেছনে দাঁড়ান লোকজনের দিকে চেয়ে বলেন, এই ব্রিগেডের ভার নাও তুমি।
ব্রিগেডের ভার আমি চাই না স্যার।
দুত্তোর ছাই, কি ভাবছ, তোমার কাছ থেকে আমি ফৌজদারের কাজ চাইছি ? শুধু বলেছি, এখন এই ব্রিগেডের ভার নাও। আমি তোমায় ক্যাপ্টেন করে দিলাম। তুমি এদের পরিচালনা করবে। না হয় ভগবানের নামে হলপ করে বলছি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ সেইখানেই গুলি করে মারব।
আমি তার দিকে অবাক হয়ে তাকালাম। পলকের জন্য তার রক্তচক্ষু দেখতে পেলাম।

ঘাড় কাত করে সম্মতি জানালাম। বল্লাম, আমি এদের পরিচালনা করব স্যার। দরকার হলে নরকেও নিয়ে যাব।

গাঢ়কণ্ঠে তিনি বলেন, হ্যাঁ, দরকার হলে নরক পর্যন্ত যাবে! একটু থেমে বললেন, বাগানের কিনারে ওই পাথুরে দেয়ালটার পেছনে এদের নিয়ে যাও। প্রস্তুত হয়ে থেক। ওরা তোমাকে ক্যাপ্টেন হেল বলে ডাকবে, আর তুমি ওদের পরিচালনা করবে। যতক্ষণ একটি লোকও বেঁচে থাকবে, যে-কোন আক্রমণ রুখবার জন্য প্রস্তুত থেক।

আচ্ছা স্যার।

তখন তিনি হাত বাড়িয়ে দেন। আমি হাতে হাত দিলাম। একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম তার মিগ্ধপ্রভ নীল চোখের দিকে। পলকের জন্য আমার দিকে চেয়ে তিনি পেছন ঘুরলেন এবং চটপট ঘোড়া ছোটালেন।

আমি সঙ্গীদের কাছে ফিরে এলাম। ওয়েনের কথা তারা শুনেছে। অবাক হয়ে নিরীক্ষণ করেছে আমাকে। এলি আমার দিক থেকে চোখ সরায়নি! তার মুখের চেহারা স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মত। কে জানত সে স্বপ্ন দেখছে এবং এ স্বপ্ন তার কোনদিনই ভাঙবে না। আমি তখন শান্তভাবে বলি, ব্রিগেডের কায়দায় তোমাদের দাঁড়াতে হবে। এখন আমি তোমাদের ফৌজদার। এখন থেকে আমাকে ক্যাপ্টেন বলে ডাকবে!

কেউ জবাব দেয় না। জনকয়েক মাথা নেড়ে সম্মতি জানায়।

ব্রিগেড···এটেনশন! চারজন করে সার বেঁধে দাঁড়াও!

লোকজন তখন উঠে পড়ে এবং ক্লান্তভাবে বন্দুক টেনে নিয়ে কোনমতে সার বেঁধে দাঁড়ায়। আমি তাদের মার্চ করিয়ে পাথুরে দেয়ালের কাছে নিয়ে যাই এবং দেয়ালের পেছনে প্রত্যেককে নিজের নিজের জায়গা দেখিয়ে দিই।

বন্দুকে গুলি ভরে রাখ। গুলির জবাবে গুলি করবার জন্য তৈরী থাকতে হবে। গুলি করবার আদেশ আমি দেব।

এলির কাছে গিয়ে আমি পাথুরে দেয়ালের উপর বসে পড়ি। পাথরও তেতে রয়েছে। সূর্য যেন আগুনের গোলা ছুড়ছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে গা বেয়ে। ধুলো ময়লা মাখা দেহে আঁকাবাঁকা রেখা পড়ছে। চোখ তুলে আমি লড়াইর ময়দানের দিকে তাকাই। আমাদের মূল বাহিনী এখনও অনেক পেছনে পড়ে আছে। তার সঙ্গে মোকাবিলা করতে হলে আগে আমাদের ঘায়েল করতে হবে। এই সব কথা মনে হচ্ছে। কিন্তু তবু চিন্তার সঙ্গে আমার দেহের যেন কোন যোগাযোগ নেই। অন্তরে নিষ্প্রাণ শূন্যতা। আর সেই শূন্যতা থেকেই যেন চিন্তা উঠছে।

এলি বলে, তাহলে এইবার তোমায় ক্যাপ্টেন করে দিল আলেন।

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন বানিয়েছে বটে!

আমার মধ্যে কোন আবেগ নেই। তবু কান্না আসে—চোখ দিয়ে জল পড়ে। চোখের নোনা জলের স্বাদ জিভে অনুভব করি।

অপেক্ষা করছি। সকাল কেটে যায়। যে কোন সময় আক্রমণ আসবে। না হয় কোনকালেই

আসবে না। আমাদের পেছনে ওয়েনরক নদীর ওপারে জেনারেল গ্রীন মূল বাহিনীকে জমায়েত করছেন? কিন্তু তারা প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত আমাদের রুখতে হবে। আঘাত করে ইংরেজরা যতক্ষণ ক্লান্ত হয়ে না পড়বে ততক্ষণ রুখতে হবে আমাদের। ক্লান্ত ব্রিটিশ বাহিনীকে আমরা পথ ছেড়ে দিতে পারি। ততক্ষণে মহাদেশীয় বাহিনী প্রস্তুত হয়ে তাদের পরাজিত করতে পারবে। বেড়া আর পাথুরে দেয়ালের পেছনে সামান্য কিছু লোক আমরা। সারা সকাল যুদ্ধ করতে হয়েছে আমাদের। আর কি নারকীয় সে যুদ্ধ! গা নিঙড়ে ঘাম বেরিয়েছে। মাংসহীন অস্থিসার অর্ধনগ্ন সৈনিক আমরা। ক্লান্তিতে মৃতপ্রায়। তিন তিনটি ব্রিগেড মিলিয়ে একটি হয়েছি। ঈশ্বর জানেন, আজ কি আছে বরাতে?

পাথুরে দেয়ালের পেছনে গা-পোড়ান রোদের মধ্যেই আমরা শুয়ে পড়ি। ছায়ার আশায় লোকজন দেয়ালের গা-ঘেঁষে গুটিসুটি মেরে থাকে। এক ফোঁটা ছায়া নেই কোথাও! সূর্য ঠিক মাথার উপরে! কেউ কেউ নদীতে গিয়ে জল খেয়ে আসবার অনুমতি চায়। বন্দুক উঁচিয়ে বলি, দেয়ালের পাশ থেকে যে নড়বে গুলি করব তাকে। খুব অবাক হয়ে যাই, কে বলছে এসব কথা? কে আলেন হেল? এলি ভয়ে ভয়ে আমার দিকে তাকায়। কিন্তু সে কি আর কিছু প্রত্যাশা করেছিল? একি সে জানত না? নিজেকে বিকিয়ে দিয়ে এই জন্যই কি সে আমাকে গড়ে তোলে নি? আজ জেকব নেই। পয়লা চোটেই মাথার একটা রক্তমাখা গোল ফুটো নিয়ে মারা গেছে। এখন আছি শুধু দুজন—এলি আর আমি। আমার জীবনে সত্যিই কোন বিশ্রাম নেই।

যুদ্ধ ক্রমে আমাদের দিকে এগিয়ে আসে। একদৃষ্টে আমরা লাল কোটের দীর্ঘ লাইন এবং সবজে উর্দি-পরা হেসিয়ানদের দিকে চেয়ে থাকি। মজা দেখছি যেন।

এক দুই করে আমি কামানের গোলা গুনি। রণক্ষেত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবার চেষ্টা করি। কোন সময় স্থির হয়ে দাঁড়াচ্ছি না। ঘুমোবার আগের মুহূর্তের মত একটা ঝিমানো ভাব দেখা দেয়। সৈনিকদের লাইনের পাশ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে তাদের বন্দুক পরীক্ষা করে দেখি, বারুদের পাত্র পরীক্ষা করি এবং চকমকিতে ভিজা হাত দিতে নিষেধ করি। জোরে জোরে কথা বলছি; কিন্তু নিজের কথার ধরণ শুনে নিজেই অবাক হয়ে যাই।

চকমকি নাড়াচাড়া করো না। বন্দুকগুলো রোদে দাও, বারুদটাও রোদে শুকিয়ে নাও। ঠাণ্ডা বারুদের চাইতে তাতান বারুদ অনেক ভাল। গাদন কাঠি ঢিলে কর...গাদন কাঠি ঢিলে কর।

এলি আমাকে লক্ষ্য করছে। সব সময় চেয়ে রয়েছে আমার দিকে। পলকের জন্যও তার চোখ অন্য দিকে ফেরেনি। এক একবার মনে হয় যে তাকে বলি, বুঝতে পারছ না কেন? দোহাই খ্রীস্টের, তুমিই যদি না বোঝ তো কে আর আমাকে বুঝবে? জেকবের মত, ওয়াশিংটনের মত আমাকেও কি নিঃসঙ্গ হতে হবে? আমাকেও কি তাদের মত নিঃসঙ্গতার জন্য আক্ষেপ করতে হবে? মানুষের সম্পর্কে পাছে উন্মাদনা কমে যায় এই শঙ্কায় আমাকেও কি লোকজন দূরে সরিয়ে রাখতে হবে? একলা তুমিই আছ—আর কেউই বেঁচে নেই। জেকবও মরে গেছে। আজকের এই আমি তোমারই পরিকল্পনার ফল।

মনে মনে ভাবলেও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারি না। মনে হয় আর কোনদিনই হয়ত এলির কাছে মন খুলতে পারব না। এলিকে আমি ছেড়ে এসেছি। পেছনে ফেলে এসেছি

তাকে। আর কোন দিনই এলির কাছে ফিরে যাওয়া যাবে না। আজকে সকালে প্রাণপ্রিয় পেনসিলভানিয়ানদের এক পাল ভীত হরিণের মত ছিন্নভিন্ন হতে দেখে ওয়েনের মনের যে অবস্থা হয়েছিল—যে চোখে তখন তিনি আমাদের দেখেছেন, আমিও তেমনি চোখে এখন চিনতে পারছি ওয়েনকে। ওয়াশিংটনকেও বুঝতে পারছি। এর মধ্যে কোন আনন্দ নেই—নেই কোন গৌরব। আমার অন্তর এখন বরফের মত শীতল আর শূন্য।

ইংরেজরা আক্রমণ করে। রয়েল ফুর্জিলিয়ার্স দলের লোক এরা। বাছাই সৈন্যদল! ইংলণ্ডের অভিজাত পরিবারের সন্তান এরা। দুনিয়ার সেরা সৈনিক। ভয় ডর নেই!

এ কথা তখন জানতাম না। দেখছি, পথ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেবার জন্য একদল ইংরেজ সৈনিক এগিয়ে আসছে। মূল সৈন্যদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অকুতোভয়ে বীরের মত এগিয়ে আসে। সেলাম করবার ভঙ্গীভে বন্দুক ধরে তারা মার্চ করে আসছে। চলবার ভঙ্গী অনেকটা প্যারেডের মাঠে মার্চ করার মত। এ রকম মার্চ আমি জীবনে দেখিনি। যে ভাবে মার্চ করা শেখাবার জন্য স্টুবেন এতদিন বার্থ চেষ্টা করেছেন, এখন তারই নিখুঁত ছবি দেখছি। কিন্তু আমরা তো সৈনিক নই। ও রকম মার্চ করা কোনদিনই আমরা শিখতে পারব না। আমরা চাষী। মানুষ নামে পরিচিত একদল উলঙ্গ নোংরা জীব। বারবার মনে মনে কথাটা আলোচনা করি। ভাল লাগা একটি গান যে ভাবে গাই, ঠিক তেমনি ভাবে বারবার মনে মনে বলি ঃ আমরা সৈনিক নই - আমরা সৈনিক নই। ওদের মত কোন দিন মার্চ করতে শিখব না। আমরা চাষী। স্বাধীন মানুষ আমরা। ভয়-ভীতি ঘৃণা দুঃখ সবই জানি। মানুষের মতই দুর্বল। নিজেরটার জন্যই শুধু লড়তে পারি—আর কিছুর জন্য নয়। আমাদের লোকজন অবাক হয়ে ইংরেজ সৈন্যদলের দিকে চেয়ে থাকে। এ দৃশ্য তাদের মুগ্ধ করে—আকর্ষণ করে। এ দৃশ্য যান্ত্রিক অবাস্তব প্রাণহীন। জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিবিহীন। জীবনের অংশ আমরা। জীবনের সঙ্গে যে সব জিনিসের সম্পর্ক আছে, আমরা শুধু তা-ই চিনি। আমাদের বন্দুকের সামনে ভেরী ও বাঁশী বাজিয়ে এই যে সৈন্যদল নিখুঁত ভাবে মার্চ করে আসছে, এর সঙ্গে জীবনের কোন সম্পর্ক নেই। বাজনার সুরটিও ধরতে পারি। 'হুট স্টাফ' গানের গৎ বাজাচ্ছে এই গৎ বাজিয়েই বাঙ্কার পাহাড়ে এগিয়েছিল ওরা।

সব মোহ, সব ভ্রান্তি ঝেড়ে ফেলি আমি। এত বরফ আমার অন্তরে জমে আছে যে সব মোহ ধ্বংস হয়ে যায়। ভিন্ন জগতের মানুষ এরা—এদের ধ্বংস করতে হবে। এদের ধ্বংস করবার মত সঞ্চিত বরফ আমাদের অন্তরে আছে। সৈন্যদলের পাশ দিয়ে হাঁটাহাটি করে শান্তভাবে বলি, কেউ আগে গুলি করো না। আমার হুকুম না পেয়ে কেউ গুলি করবে না। যে দল ছেড়ে পালাবে তাকেই খুন করব। মাথা নীচু কর। দেখতে না পায় এমন ভাবে ঘাপটি মেরে থাক। মাথা তুলে দেখবে না।

চাষী ঘরের একটি ছেলে, নেহাৎই নাবালক, উঠে দাঁড়িয়ে হাঁ করে ওদের দিকে চেয়ে থাকে। ঠাস করে এক চড় মারি তার গালে।

বসে পড়! দেয়ালের আড়ালে থাক। ওভাবে উঁচু হয়ে দেখে না। দেয়ালের আড়ালে লুকিয়ে থাক।

ওয়েন আমানের পেছনে। ঘোড়ার পিঠে বসে মৃদু হাসছেন। এই লোকটার প্রাণও যেন বরফ দিয়ে গড়া—পুরোপুরি বরফের তৈরী। তিনি আমার দিকে এগোতে থাকেন। কিন্তু

তার প্রশংসা আমি চাই না। আমি তার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াই। দেয়ালের পেছনে দাঁড়িয়ে ইংরেজদের হালচাল লক্ষ্য করি।
তারা আমাদের খুবই কাছে এসে পড়ে। প্যারেড করবার সময় যে-ভাবে বন্দুক ধরে থাকে এখনও সেই ভাবেই ধরে আছে। এ যেন ঝকঝকে ক্ষুরধার ইস্পাতের ফসল। লাইনটির এক প্রান্তে একটি ভেরী বাজিয়ে হাঁটছে। টুপিটা মাথার পেছনে ঠেলে নিয়েছে লোকটি। মাথা নড়ছে বাজনার তালে তলে। লোকটির কাঁধে একটি মস্ত উঁচু ভেরী। ভেরীটির উপরে-নীচে সোনার ব্যাণ্ড লাগানো। পাশে ইংরেজ রাজশক্তির প্রতীক রাজমুকুট আর সিংহ। ভেরী বাজিয়েটির মুখে প্রসন্ন হাসি। কাঠি দিয়ে বাজাবার সময় লাফিয়ে উঠছে।
খোলা তরোয়াল হাতে অফিসাররা সামনে চলছে। মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে তারা সৈনিকদের দেখছে। যেন প্যারেডের মাঠে সৈন্যদল পরিদর্শন করছে।
একদল চাষীকে হটাবার জন্য নির্ভীক তরুণ ইংরেজ সন্তান নিয়ে গড়া এই রেজিমেণ্টটির হঠকারিতা দেখতে দেখতে পলকের জন্য মনে হয়, লড়াইর বুঝি সাময়িক বিরতি হয়েছে। মনে মনে বলি, এই তো ইংলণ্ড—এই তো ইয়োরোপ। এর বিরুদ্ধেই তো আমাদের সংগ্রাম। মানুষের প্রতি চরম অবজ্ঞা···জীবনের প্রতি চরম তাচ্ছিল্য···মানুষের আত্মার প্রতি ঘৃণা··· মানুষের বাঁচবার অধিকার, সাধারণ জিনিস জানবার ও তাই নিয়ে সুখী হবার দাবী এবং তার দাসত্বমোচনের আকাঙ্খার প্রতি এই কুৎসিৎ অবজ্ঞার বিরুদ্ধেই. তো আমাদের আসল সংগ্রাম! হ্যাঁ, অনন্তকাল ধরে এর বিরুদ্ধেই তো অবিরাম সংগ্রাম চালাতে হবে আমাদের। এ যুদ্ধ চলবে! বিশ্রামের কোন অবসর নেই। আমরাই জীবনের প্রতীক। উলঙ্গ নোংরা অনশনক্লিষ্ট চাষীরাই তো জীবন। আর ওই ওখানে প্রাচীরের ওধারে যারা রয়েছে, জীবনকে উপহাস করছে তারা। এইজন্যই আজ ওদের সাথে আমাদের লড়াই—মনে মনে বারবার এই কথাটা আওড়াই।
এতক্ষণে আমাদের খুবই কাছে চলে এসেছে ওরা। নাবালকত্ব বেশীদিন ঘোচেনি কারও। ঘাড় বাঁকিয়ে পরস্পরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে হাসতে হাসতে এগোচ্ছে বালকের দল। দাঁত বার করে উন্নত শিরে এগোচ্ছে। গোঁফ দাড়ি কামানো ছিমছাম মুখে অবজ্ঞার হাসি। সে হাসি উপহাস করছে মৃত্যুকে—উপহাস করছে জীবনকে। জীবন শেষ হয়ে গেছে। হারানো জীবনের সঙ্গে ভয়ডরও গেছে। দুঃখ সয়ে বেঁচে থাকবার ক্ষমতা এদের এখন নেই। অতীতের মানুষ এরা। জাঁকজমকের বাহার আছে বটে, কিন্তু সে জাঁকজমক আমাকে স্পর্শ করে না। আমার কি এসে যায় তাতে? পুরো একটা শীতকাল নরকে কাটিয়েছি·· দলে দলে মানুষ মরতে দেখেছি·· মরতে দেখেছি অন্তরঙ্গদের, আমাদের সাথীদের।
আমাকে বাঁচাবার জন্য কেনটন ব্রেন্নার অপমানকর মৃত্যুবরণ করেছে। মরেছে চার্লি গ্রীন। পাঁচ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে যে ইহুদীটি এসেছিল, একদিন মানুষ স্বাধীন হবে—এই স্বপ্ন নিয়ে সেই আরন লেভিও মরেছে। একটি মাত্র আদর্শ বহ্নিশিখার মত যার জীবনে জ্বলেছে, সেই আত্মত্যাগী জেকব ইগেনও প্রাণ দিয়েছে। কৃষক এডওয়ার্ড ফ্লাগ ভেগেছিল কেননা অন্য একটা কিছুর উপর তার আস্থা ছিল। এই ফুর্জিলিয়ার্সদের উপর করুণা হওয়া উচিত। কিন্তু আমার অন্তরে কোন করুণা নেই। কি করে করুণা করব? ফোর্জ উপত্যকার হাসপাতালে কাঠের ঘরে গিয়ে আমি হাজার খানেক মানুষকে নরকে পচে

মরতে দেখেছি। মরবার আগেই তারা নরকে বাস করেছে। দেখেছি কত অনামী লাশ বরফের উপর পাঁজা করা রয়েছে। কারণ মাটি লোহার মত শক্ত। তাদের দেহ বাঘের খাবার জুগিয়েছে। হাসি মুখে তারা মরেনি। জীবনকে ভালবেসে তাদের মরতে হয়েছে। বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টায় মরেছে। জীবনকে যারা ভালবাসে, মানুষের জীবনের মর্যাদা যারা দেয়—স্বাধীন সুন্দর জীবনকে যারা ভগবানের দুনিয়ায় একমাত্র পবিত্র জিনিস বলে মনে করে তাদের সমগোত্রীয় এরা। জীবনের জন্য চোখের জল ফেলে মরেছে। হেলায় জীবন বিসর্জন দেয়নি।

আগুয়ান ফৌজদারদের মধ্যে একজন সহসা পেছন ফিরে চীৎকার করে হুকুম দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সব কটি সঙিন চট করে আমাদের দিকে উদ্যত হয়। পরিহাসরত ছেলের দল তখন ছুটতে শুরু করে।

সঙ্গে সঙ্গে আমিও চেঁচিয়ে উঠি, এইবার—এইবার—ব্যাটাদের জাহান্নামে পাঠাও।

পেনসিলভানিয়ার কাদামাখা উলঙ্গ চাষীরা উঠে দাঁড়ায়। তাদের মোটা ফুটোর বন্দুক আগুন বমি করে। আগুনের হলকায় বেড়া ও দেয়াল ঝলসে ওঠে। গুলির দুমদাম আওয়াজের সঙ্গে মানুষের আর্ত চীৎকার মিশে যায়। রয়াল ফুজিলিয়ার্সদের লাল লাইন ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। তাদের পরিহাসউচ্ছল কণ্ঠে ফুটে বেরোয় মৃত্যু-যন্ত্রণার কাতর আর্তনাদ, মুমুর্ষুর আর্ত-চীৎকার সব কিছু ছাপিয়ে ওঠে। পেট চেপে ধরে রক্ত বমি করে তারা। টলতে টলতে পালাতে চায়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় ইংরেজদের লাইন। ক্রমেই তারা পেছু হটে। ধোঁয়ার মধ্যে ছুটাছুটি করে ছত্রভঙ্গ অস্পষ্ট মানুষের কায়া। আবার কেউ কেউ হামাগুড়ি দিয়ে দেয়াল অবধি এগিয়ে আসে। কিন্তু বন্দুকের কুঁদোর বাড়িতে পেনসিলভানিয়ার চাষীরা তাদের মাথা চৌচির করে দেয়।

আমি তার স্বরে চেঁচিয়ে বলি, গুলি ভর—আবার ভর। দেয়ালের পেছনে থেকে গুলি ভর। দেয়ালের আড়ালে থাক! চটপট আবার গুলি ভর। চকমকি শুকনো রেখ।

দূর থেকে ভেসে-আসা কথার মত ওয়েনের কণ্ঠস্বর কানে আসে, আবার গুলি ভর—চটপট গুলি করবার জন্য তৈরী হও!

ধোঁয়া উড়ে যায়। সঙ্গীদের ছিন্নভিন্ন দেহের ধ্বংসস্তুপের খানিকটা পেছনে মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে ইংরেজসেনা। ফৌজদাররা আবার তাদের সার বেঁধে দাঁড় করায়। ভেরীটার আধখানা ভেঙে গেলেও ভেরী বাজিয়েটি আবার ঢ্যাব ঢ্যাব করে এক পক্কর বাজায়। এদের সাহসিকতা যুক্তির বাইরে—শৃঙ্খলা জীবনের অতীত। অবিচলভাবে তারা সার বেঁধে দাঁড়ায় এবং আবারও প্যারেড শুরু করে। একটি ফৌজদার আমাদের দিকে হেঁটে এগোয়। পেছন ফিরে হাঁটতে হাঁটতে সে পাথুরে দেয়ালের ত্রিশ গজের মধ্যে এসে পড়ে। ইংরেজ-জাতির নাম করে সে সঙ্গীদের আহ্বান জানায়। ক্রোধে ও গর্বে তার কণ্ঠস্বর কাঁপতে থাকে। আমরা তার কথা স্পষ্ট শুনতে পাই: সদ্বংশের সন্তানরা কি কোনদিন পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়?

আবার এগিয়ে আসে তারা। সূর্য হেলে পড়েছে। দরদর করে ঘাম ঝরছে আমাদের গা বেয়ে। স্পষ্ট দেখছি, কি রকম ঘামাচ্ছে লোকগুলো। তাদের শীর্ণ শুঁটকো দেহে বিন্দুমাত্র জল নেই। তবু ঘামছে।

ধমকে-ধামকে আবার তাদের দেয়ালের আড়ালে নিয়ে আসি।—মুখ তুলে চেয়ো না···চেয়ো

না বলছি ! কেউ ... বার করবে না !
আবার প্যারেড করছে ইংরেজরা। জোর করে হাসছে চলবার সময়। পায়ের ঠোক্কর মেরে ধুলো উড়োচ্ছে। হাসাহাসি করছে। সত্যি এদিকটা দিয়ে মহিমাময় এরা। কিন্তু আমরা এত মৃত্যু দেখেছি যাকে কোনমতেই মহিমাময় বলা যায় না।
ফৌজদারটি সৈন্যদলের সামনে চলে। ক্রমে সে দেয়ালের গজ দশেকের মধ্যে এগিয়ে আসে। তারপর সেইখানে দাঁড়িয়ে তরোয়াল খাড়া করে অবজ্ঞার হাসি হেসে আমার দিকে তাকায়। আমি ওকে ঘৃণা করি না। আমি ঘৃণার অতীত অবস্থায় চলে গেছি এ কথা ভেবে মনে মনে এক বীভৎস বর্বর উল্লাসের চমক অনুভব করি। লোকটি এমন একটি ব্যবস্থার অঙ্গ যাকে ধ্বংস করতেই হবে। আমি শুধু এই কথাই জানি যে তাকেও যেতে হবে। ধ্বংস করতে হবে জীবন ও দুঃখের প্রতি ওর এই অবজ্ঞা। ভেঙে চুরমার করতে হবে ওদের এই উন্মাদ নির্বোধ সাহস। ওদের শেখাতে হবে যে জীবনের মূল্য আছে—উপহাস অবজ্ঞার জিনিস তা নয় !
আগের বারের মতই তারা এগিয়ে আসে। বিশ পা—বিশ পা—পনেরো পা। তারপর সঙিন বাগিয়ে আমাদের দিকে রুখে এগোয়।
আবার আমি চেঁচিয়ে উঠি, এইবার…এইবার !
চাষীরা উঠে দাঁড়ায় এবং আবারও ফুজিলিয়ার্সদের উপর অগ্নিবর্ষণ করে। আগের বারের মতই তারা ধুপধাপ পড়ে যায়। মৃত্যু যন্ত্রণায় বীভৎস দাপাদাপি চীৎকার করে। এবারে আর পেনসিলভানিয়ানদের বাগ মানান যায় না। কোনদিন যে দৃশ্য তারা দেখেনি, আজকে তাই দেখতে পেয়েছে। মুখোমুখি সংগ্রামে বৃটিশ সৈন্যদল তাদের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে।
স্টুবেনের শেখান কায়দা এইবার কাজে লাগায় তারা। লাফিয়ে দেয়াল পার হয়ে সঙিন উঁচিয়ে রুখে এগোয় এবং শীতকালের নরকবাসের সমস্ত সঞ্চিত ক্ষোভ নিয়ে উন্মাদের মত ইংরেজদের পর ঝাঁপিয়ে পড়ে…তাদেয় গায়ে সঙিন বসিয়ে দেয়…কেটে কুচি কুচি করে …ধ্বংস করে ! এখন এরাই জীবন্ত নরক। এতদিনের ক্রম-সঞ্চিত অনির্বাণ ঘৃণা আজ ফেটে পড়েছে। এই লোকগুলোই তাদের শহর কেড়ে নিয়েছে—বরফের মধ্যে তাদের মধ্যে তাদের উপবাসে রেখেছে।
আমিও এদের সঙ্গে আছি। জীবন-মৃত্যুর কোন পরোয়া নেই ! আমাদের পথ থেকে এদের সরিয়ে দিতে হবে, এদের ধ্বংস করতে হবে—এই একটি মাত্র পণ ছাড়া আর কিছুর কোন মূল্য নেই। আমাদের ধ্বংস করবার জন্য পাঠানো হয়েছে এদের। এরা উপহাস করেছে আমাদের ··উপহাস করেছে দেয়ালের পেছনে লুকানো উর্দিবিহীন গেঁয়ো চাষীদের উলঙ্গ নোংরা শীর্ণ এক জনতাকে। এদের উপহাস আমাদের অন্তরে জ্বালিয়েছে আগুন।
পলায়নপর একটি লোকের দেহে আমি বেয়নেট বসিয়ে দিই এবং সঙ্গে দঙ্গে টেনে বার করে লাফ দিয়ে তাকে পার হয়ে যাই। আমি এখন প্রাণহীন হত্যার যন্ত্রে পরিণত হয়েছি। অন্তরে বরফ। এখন আর আমি মানুষ নই। এতদিনে জেকবকে বুঝতে পেরেছি।
রক্তমাখা বিভীষিকার মত দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছি আমরা। রয়েল ব্রিটিশ ফুজিলিয়ার্সদের সাবাড় করেছি। হাতাহাতি সংগ্রামে ধ্বংস করেছি ইওরোপের বাছাই সৈন্যদলকে। পাহাড়িয়া

খোলা মাঠের মধ্যে পড়ে আছে তারা ! কেউ মরেছে, কেউ মরছে। আমেরিকার মাটি ভিজে যাচ্ছে ইংলণ্ডের রক্তে। মৃত্যু ও বলির মধ্য থেকে যে আমেরিকা জন্ম নিয়েছে, এই-ই তার আসল রূপ ! একই রক্ত আমাদের। তবু ওরা আমাদের কেউ নয়। এক নতুন দুনিয়ার মালিক আমরা। আজকে এইখানে ফুর্জিলিয়ার্সদের রক্তে আর গোটা শীতকালের নরক-বাসের দুঃখের ফলে জন্ম নিচ্ছে সে দুনিয়া।

রণক্ষেত্রে বিজয়ীর মত পলকের জন্য আমরা স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। মাঠের চারদিকে চেয়ে নিজেদের কাণ্ড দেখে নিজেরাই অবাক হয়ে যাই। আমরা যেন সৈনিক নই। হয়ত কথাটা তখন আমাদের সকলেরই মনে জাগে যে আমরা সৈনিক নই। শুধু একবারই এই কাণ্ড করে ফেলেছি। এখন সব ভুলে যাও ! গা এলিয়ে দেবার মত একটা ঠাণ্ডা জায়গা বার করে ঘুমিরে পড়। লম্বা ঘুম দিলেই সব ক্লান্তি ভুলে যাবে। এক টানা লম্বা ঘুম।

ওয়েন ঘোড়ায় চড়ে আমাদের মধ্যে ছুটছেন আর পেছু হটতে বলছেন। বোকার মত তার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকি। জনকয়েক যেখানে দাঁড়ান ছিল সেইখানেই পড়ে যায়। তাদের দেহ এত ক্লান্ত যে আর ভার বইতে পারছে না ! আমরা ওয়েনের দিকে তাকাই। অনেক কিছুই আমরা করেছি, তাই নয় কি ? ওদের বুঝেছি তো !

এবার মূল ব্রিটিশ বাহিনী এগোচ্ছে। অবাক হয়ে দেখছি, বিশাল এক ব্যহিনী আমাদের দিকে আসছে। অসহায়ের মত মাথা ঝাঁকাই। এই বিরাট বাহিনীর পথে আমরা কয়েকশো মাত্র রয়েছি ! লম্বা লম্বা সবজে ও লাল লাইনে এগোচ্ছে তারা। এবারে হেসিয়ানরা সামনে। বেয়নেট উঁচিয়ে আসছে। যেন মাঠভরা বেয়নেটের ফসল ফলেছে। আমরা পালাবার চেষ্টা করি। ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই। লোকজনদের আমাকে অনুসরণ করতে বলি এবং প্রাণপনে ছুটবার চেষ্টা করি। আস্তে পা চলে, নড়তে চায় না। যেন স্বপ্নে হাঁটছি। বার বার পড়ে যাই আবার পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াই ! গুলির শব্দে তালা লাগে কানে। এই অগ্নিবর্ষণের মুখে কিছুই দাঁড়াতে পারে না, কিছুই বাঁচতে পারে না। পাথুরে দেয়াল অবধি পৌঁছুতে যেন অনন্তকাল লাগে। দেয়াল বেয়ে পার হই। পেছন ফিরে দেখি, অর্দ্ধেক লোক এরই মধ্যে সাবাড় হয়ে গেছে। পেছনে ফুর্জিলিয়ার্সদের সঙ্গেই পড়ে আছে। গোটা শীতকালের দুঃখ কষ্ট সার্থক হবার মুখে মরেছে এরা।

ব্রিটিশ বাহিনীর গুলিবর্ষণ যেন দুনিয়া ঝেঁটিয়ে সাফ করছে…যেন ঝেঁটিয়ে বিদায় করছে জীবনের সব চিহ্ন। আমরা দৌড়োবার চেষ্টা করি এবং মোড় ঘুরে গুলির পাল্লার বাইরে চলে যাই ! নদীর কাছে পৌঁছেই সৈনিকেরা ঝুপঝাপ জলের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে এবং মাথা ডুবিয়ে থাকে। জল খায় ঢকঢক করে।

নদীর জল আমাদের নতুন জীবন দান করে। জলে পা ডুবিয়ে সর্বাঙ্গ দিয়ে আমি নদীর স্নিগ্ধ পরশ অনুভব করি। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে লোকজনকে এগিয়ে যেতে বলি। আমার অন্তরে বরফ। জলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ঠাণ্ডা মেজাজে হুকুম দিচ্ছি। যেন এখনকার মত দুনিয়ার কোথাও কোন পাগলামি নেই। লাইন দিয়ে সৈনিকেরা এগিয়ে চলে। গ্রীনের সৈন্যদল আমাদের সামনে। রক্ষাব্যূহের পেছনে ওৎ পেতে আছে। অপেক্ষা করছে।

একটি লোক নদী থেকে উঠতে চায়না। আমি বলি, চটপট উঠে পড় বোকা কোথাকার !

আমার ভাই পেছনে রয়েছে ক্যাপ্টেন হেল।
সে মারা গেছে। উঠে পড়।
মরেনি। পড়ে যাবার সময় তাকে নড়তে দেখেছি।
বলছি মরে গেছে। উঠে পড় চটপট।
লোকটি এগিয়ে যায়। বার বার মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকায় আর মাথা ঝাঁকায়। ওয়েনের ঘোড়াটা নদীর জল ছিটিয়ে আমার পাশ দিয়ে চলে যায়। যুদ্ধের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। পাগলের মত ছুটছেন আর চেঁচামেচি করছেন।
আমি এলির খোঁজ করি। অন্যান্য লোকজনের সঙ্গে তাকে তো যেতে দেখিনি! মনে হয় পেছনে পড়ে গেছে,এখুনি আসবে হয়ত। কিন্তু পেছন ফিরে শুধু আগুয়ান ব্রিটিশ সেনাদের চোখে পড়ে। মনে মনে বলি এলি হয়ত আর বেঁচে নেই। পেছনে কোথাও হয়ত পড়ে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে নেই!
আমাদের মূল বাহিনীর দিকে হেঁটে এগোবার সময় অসংখ্য হুঁশিয়ারি কানে আসে। তারস্বরে চীৎকার করে সাবধান করছে আমাকে। আক্রমণ আসছে আমারই পেছনে। আমি ভাববার চেষ্টা করি। কান থেকে মুছে ফেলতে চাই গুলির বিকট আওয়াজ। চিন্তা আমাকে করতেই হবে। মনের এই শূন্যতা দূর করে ভাবতে হবে এলির কথা। বুঝতে হবে এলির কি হয়েছে। আজীবন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। আমার প্রসবকালে বাবার সঙ্গে অপেক্ষা করেছে আঁতুর ঘরের বাইরে। শুনেছে মাকে প্রসব ব্যথায় আর্তনাদ করতে। তার কথা না ভেবে পারি? কোথায় গেল এলি? কেন হারালাম তাকে?
এলি মারা গেছে! কিন্তু তার মৃত্যু অর্থহীন লাগছে কেন? ওরা সবাই মরেছে। শুধু আমিই বেঁচে আছি এখনও। একলা আমিই আছি কিন্তু আর সবাই মরেছে!
আমি ছুটতে শুরু করি। বাঁচতেই হবে আমাকে। আমার জীবনে বিশ্রাম নেই।
দৌড়ে আমি মহাদেশীয় বাহিনীর মধ্যে পড়ি। পেনসিলভানিয়ানদের মধ্যে যারা ফিরেছে তাদের সবাই আছে সেখানে। বন্দুকে ভর করে এখানে ওখানে ঝিমোচ্ছে। এ ব্যূহ নিউ জার্সি'র লোক নিয়ে গড়া। সদ্য-আগত নতুন সৈন্যদল অপেক্ষা করছে পয়লা সংগ্রামের জন্য। বেজায় গরম। এত গরম যে কোন সুস্থ চিন্তা মাথায় আসে না। কিন্তু এ উত্তাপেও আমার অন্তরের বরফ গলে না। আমি এখন সৈন্যদলের চালক। তাদের গুলি ভরতে বলা, গুলি করার হুকুম দেওয়া এবং চকমকি শুকনো রাখতে বলাই আমার কাজ। মাথাটা যন্ত্রণায় ফেটে যাচ্ছে, তবু আমাকে চকমকি শুকনো রাখতে হবে। আবার তাদের ঘুম ভাঙাই। তারা ঘুমোতে চায় কিন্তু আমি তাদের ঘুমোতে দিতে পারি না। তাড়া দিয়ে আবার লড়াই করতে নিয়ে আসি।
ব্রিটিশরা আক্রমণ শুরু করে। বিরাট তরঙ্গের মত একদল সৈন্য ওয়েনরক নদীতে নামে। কোলাহল ও গুলির আওয়াজে আমার কণ্ঠস্বর তলিয়ে যায়। হেসিয়ানরা নদীতে ছড়িয়ে পড়ে এবং নদীর মধ্যেই সাবাড় হয়। আমেরিকানদের ব্যূহ আগুনের প্রাচীরের মত। হাজার হাজার লোক একসাথে গুলি করছে। শব্দ আর আগুন মিলে এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করে। আমার মাথাটা দপদপ করে। যন্ত্রণায় ফেটে যেতে চায়। নদীর জল রক্তে লাল হয়ে যায়। গুলি বিদ্ধ ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে ইংরেজ ফৌজদাররা মাটিতে গড়াগড়ি

খায় । আক্রমণের বেগ কমে আসে। পেছু হটে আক্রমণকারীরা ; কামানের গোলায় তাদের সম্মুখ ব্যূহ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। নদী লাল হয়ে ওঠে। লালে লাল হয়ে যায় গোটা দুনিয়া। গোটা পৃথিবীর বুকে লাল রঙ লেপে সূর্যও পশ্চিমে হেলে পড়ে। পেনসিলভানিয়ানরা এখন ঘুমোচ্ছে বন্দুকের উপর উবু হয়ে। তারা এখন আর যুদ্ধে কোন অংশ নিচ্ছে না। বিকট শব্দেও তাদের ঘুম ভাঙছে না। লম্বা টানা ঘুমে অচেতন ক্লান্ত পেনসিলভানিয়ানরা। দীর্ঘ ঘুম মানে বিস্মৃতি। এলির কথা ভুলতে হলে ঘুম চাই। সে মারা গেছে। বেশ অনেক সঙ্গী পেয়েছে এখন। মস্ত বড় দল। সবাই ঘুমোচ্ছে শান্তিতে। কোন শব্দ তাদের ঘুম ভাঙাবে না। দুনিয়ায় এমন কোন শব্দ হতে পারে না, যা তাদের ঘুম ভাঙাতে পারে। শীত-গ্রীষ্মের পুরোণো ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট-মুক্ত কামনাহীন গভীর প্রশান্তি আর গভীরতম ক্লান্তিহরা নিদ্রা। এলির হৃদয়ের মতই সুখদায়ক এ বিশ্রাম। মহান অপূর্ব বিশাল তার হৃদয়।
প্রত্যেক মানুষেরই হৃদয় আছে। মানুষের প্রাণ পবিত্র—পবিত্র তার দেহ। ভগবানের প্রতিমূর্তি মানুষ। তাঁর পবিত্র প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত মানুষের মধ্যে।
রণক্ষেত্রে এখন ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর নিঃশব্দ দীর্ঘশ্বাস। মানুষের রক্তে নদীর জল লাল হয়ে গেছে।
ব্রিটিশরা পেছু হটে যাচ্ছে। পেছু হটা ক্রমশঃ ছত্রভঙ্গ পলায়নে পরিণত হয়। ছত্রভঙ্গ সৈন্যদল পালাচ্ছে মাঠ দিয়ে। প্রথম গুলিবর্ষণের চোট হেসিয়ানদের উপর দিয়েই গেছে। এখন আর তারা ভারী উর্দির নব্বই পাউণ্ড ওজন বইতে পারছে না। টলতে টলতে বিক্ষিপ্তভাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। সারা মাঠে ছড়িয়ে পড়ছে ছোট ছোট সবজে বিন্দু। নদীর মধ্যে এবং পাড়েও পড়ে আছে অনেক। আমরা গুলি বর্ষণ বন্ধ করি; কিন্তু কামানের গুড়ুম গুড়ুম গোলাবর্ষণ চলতেই থাকে। ব্রিটিশ বাহিনী আর আমাদের মাঝখানে ছররা গোলার প্রাচীর।
মাঠের বুকে ওরা লাল-সবজে রঙের দাগ ছিটিয়ে দেয়। পেছু হটতে হটতে আবার সার বাঁধবার চেষ্টা করে। মৃতদের ফেলে যায়। আমাদের দিয়ে যায় মৃত মুমূর্ষ আর বিজয়ীর অধিকার।
সময়ের হিসাব নেই। তার একমাত্র পরিমাপক ক্লান্তি। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি আমরা, বিশ্রাম পাব কতক্ষণে? আজ রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমানো যাবে।
সূর্য দিগন্তের কোলে হেলে পড়েছে। বাতাস বইছে দীর্ঘশ্বাসের মত। বাতাসে বারুদের ধোঁয়া সুতোর মত জট পাকিয়ে যায়। আমার বন্দুকের মুখ দিয়েও আঁকাবাঁকা ধোঁয়া বেরোয়। যন্ত্রের মত আমি গুলি ভরছি—গুলি করছি—আবার গুলি ভরছি। বন্দুকটা হাতের উপর তেতে আগুনের মত হয়েছে। বেয়নেটখানাও বেঁকে গেছে। কি করে কখন বেঁকে গেল? সন্তর্পণে আমি বেয়নেটখানা স্পর্শ করি। শুকনো রক্ত কাল হয়ে আছে। মানুষের খুন শুকিয়ে আছে।
ঠিক এলির রক্তের মত। এলি ঘুমোচ্ছে। আমার চারদিকে লোকজন ধুপধাপ করে শুয়ে পড়ছে বন্দুক বুকে চেপে। যে যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই কাত হয়ে পড়ছে। ফৌজদাররা এদের ঘুম ভাঙাবার চেষ্টা করে। কেন? কেন ঘুম ভাঙাচ্ছে? যুদ্ধ তো শেষ হয়ে গেছে। এখন ওরা ঘুমোবার অধিকার অর্জন করেছে। ঘুমোক—লম্বা টানা গভীর ঘুম

দিক। ঘুম দিয়ে যাবে অতীতের বিস্মৃতি।

আমি ঘুমোতে পারি না। মাথার যন্ত্রণা ক্রমেই বাড়তে থাকে। দপদপ করে অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা ফেটে যেতে চায়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি পেছু হটা দেখি। মাঠের বুকে গোধূলির ছায়া নামে। আস্তে আস্তে চলেছে ব্রিটিশ সৈন্যদল। পা টেনে টেনে ছেড়ে যাচ্ছে পরাজিত রণক্ষেত্র। বার বার একটা কামার দাগার শব্দ হচ্ছে। দূরে কোথায় যেন আচমকা পটপট গুলির আওয়াজ হয়। পূব আকাশে পাতলা একখণ্ড মেঘ ভেসে ওঠে। অস্তগামী সূর্য তার গায়ে রঙ মাখিয়ে দেয়। গোলাপী আভা দেখতে দেখতে গাঢ় রক্তরাঙা হয়ে ওঠে। মনে হয়, রণক্ষেত্রের আর্ত বেদনা যেন আকাশের বুকে প্রতিফলিত হচ্ছে।

তোপ দাগার শব্দের বিরাম নেই। ক্রমে আর সব শব্দ মিলিয়ে যায়। সেই গভীর স্তব্ধতার মধ্যে শুধু তোপের শব্দই কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এখনও তোপ দাগা থামাচ্ছে না কেন?

বৃটিশ সৈন্যদল গোধূলির ম্লান আলোর মধ্যে মিশে যায়। সবুজ রঙ মিলিয়ে যায় মাটির বাদামি আর সবুজ রঙের সঙ্গে। আমি কামানটির জন্য অপেক্ষা করি। কিন্তু তার এগিয়ে আসবার লক্ষণ দেখা যায় না।

সূর্য অস্ত গেছে।

সৈন্যদল ঘুমোচ্ছে। আত্মরক্ষার ঘাঁটির পেছনে বন্দুক জড়িয়ে লম্বা লাইন দিয়ে ঘুমোচ্ছে সৈনিকেরা আর মৃতেরাও ঘুমোচ্ছে তাদের পাশাপাশি। কিন্তু মরার ভয় কেউ করে না। গভীর ঘুমে সবাই অচেতন।

গাছে গাছে বাতাস দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যায়। বন্দুকটা আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে বন্দুকের দিকে চেয়ে থাকি।

তারপর আত্মরক্ষার অস্থায়ী প্রাচীর পার হয়ে হাঁটতে থাকি। প্রতি পদক্ষেপে ব্যথা লাগে। তবু হাঁটতে হবে। একটি লোক আমায় চ্যালেঞ্জ করে।

বলি, ক্যাপ্টেন হেল—চোদ্দ নম্বর পেনসিলভানিয়া।

লোকটি বলে, পাহারা দেওয়া নরক যন্ত্রণার মত। মড়াগুলো গেলেই তো পারে। আমি ঘুমোতে চল্লাম।

আমি হেঁটে এগোই। আহতেরা কাতরাচ্ছে। একটি ডাক্তার এবং জনকয়েক স্ট্রেচারবাহী আমার পাশ দিয়ে যায়। ডাক্তার বিড় বিড় করে বলে, ঘুম না হলে মানুষ বাঁচে কি করে? একটি আহত লোক আমার পা জড়িয়ে ধরে। আমি ডাক্তারকে ডাকি।

হা ঈশ্বর! আমি একলা। একলা লোক আর কত করতে পারে বল?

মৃত ও জীবিতেরা পাশাপাশি শুয়ে আছে। উলঙ্গ হয়ে ঘুমোচ্ছে। বার বার হোঁচট খেতে হচ্ছে আমাকে। হিমশীতল আমার অন্তর। বরফের মত ঠাণ্ডা। এলি এটা জানত।

নদীটা হেঁটে পার হয়ে যাই ব্রিটিশ শবের মধ্য দিয়া। বেশ অন্ধকার হয়েছে এখন। কতক্ষণ আগে আগে আমরা যুদ্ধ করেছি?

নিশ্চয়ই সামনে কোথাও এলির দেখা পাব। তাকে বোঝাতে পারি। সে সব বুঝতে পারত। জেকবের মনের কথাও সে বুঝত।

একটা গাছের দিকে এগোই। তলায় দুটি লোক দাঁড়ান। কথা বলছে। ওয়াশিংটনের গলা চিনতে পারি। যে কোন অবস্থায় চিনতে পারি ও গলা। অপর লোকটি লা ফায়েত।
তাঁদের দিকে হেঁটে এগোই। গাছে নীচে না আসা অবধি থামিনি।
কে তুমি? ওয়াশিংটন জিজ্ঞাসা করেন।
পাগলের মত আপন মনে হাসতে থাকি। যন্ত্রণায় মাথা ফেটে যাচ্ছে তবু হাসছি। বলি, পলাতক খুনী। কিন্তু ওয়েন আমাকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছেন। সৈনিকদের নরকে নিয়ে যাবার জন্য বীর জেনারেল ওয়েন ক্যাপ্টেন বানিয়েছেন আমাকে! নরক কেমন জানেন? আজ দেখে এসেছি। সঙ্গীদের আজ নিয়ে গিয়েছিলাম নরকে! ওয়েনকে জিজ্ঞাসা করবেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতে পারবেন। তিনিই তো ক্যাপ্টেন বানিয়েছেন আমাকে।
পাগল! ওয়াশিংটন বিড়বিড় করে বলেন,—অবাক হবার কিছু নেই! যা গরম আর আজকে যা ঘটনা দেখেছে!
আমি পাগল নই। শান্তভাবে বলি,—মানুষ কখন পাগল হয় জানি। আমি পাগল নই। তবে বড্ড ক্লান্ত। ঘুমোতে চাই।
যাও, তাহলে ঘুমোও গে।
যাচ্ছি—ঘুমোতেই যাচ্ছি।
প্রতিটি মুখ লক্ষ্য করে আপেল বাগানের মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি। শেষ পর্যন্ত এলির দেখা পাই। পাথুরে দেয়ালের কাছে শুয়ে আছে। অন্ধকারের মধ্যেও তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। তার উপর ঝুঁকে ফিসফিস করে ডাকি, এলি…আমি আলেন হেল!
এলির বুকে আঘাত লেগেছে। তার হাত বাঁকিয়ে আমি ক্ষতটি ঢেকে দেবার চেষ্টা করি। চোখ দুটো বুজিয়ে দিই। আর তার মুখে কোন ক্লান্তি নেই এখন। মহান আত্মদানের পরম প্রশান্তি তার মুখমণ্ডলে।
এলির পাশে শুয়ে পড়ি। ফিসফিস করে বলি, এইবার ঘুমোব এলি। বড্ড ঘুম পেয়েছে। আমার সবকিছুই তো তোমার জানা। বরাবরের দরদী হৃদয় তোমার—সব কিছু বুঝতে পারতে তুমি!
আস্তে আস্তে ঘুম আসে। মাথার দপদপানিও ছেড়ে যায় ধীরে ধীরে। এলির পাশাপাশি শুয়ে থাকি আর ফলের বাগানের গাছে গাছে বাতাসের দীর্ঘশ্বাস কান পেতে শুনি।

পরদিন সকালে এলিকে কবর দিলাম। বহু ব্রিটিশ হেসিয়ান এবং আমেরিকানকে কবর দিতে হবে। অধিকাংশ আমেরিকান উলঙ্গ। তাদের গায়ে আমরা হেসিয়ানদের সবজে কোট জড়িয়ে দিই। উলঙ্গ ভাবে কোন সঙ্গীকে কবর দেওয়া ভাল দেখায় না। জামা খোলা নোংরা হেসিয়ানদের সার বেঁধে শুইয়ে দেওয়া হলো। লম্বা পরিখা কেটে পুঁতে রাখা হয় তাদের। কোন প্রস্তর ফলক তাদের কবর চিহ্নিত করবে না।
আপেল বাগানের যেখানে এলি পড়েছিল, সেইখানেই তার কবরের ব্যবস্থা করি। পাথুরে

দেয়ালের কাছাকাছিই তাকে সমাধিস্থ করা হয়। এখানকার জমিতে কোনদিনই লাঙল পড়বে না। তাছাড়া সূর্য যখন হেলে পড়বে, পাথুরে দেয়ালের ছায়া পড়বে কবরের উপর। ছায়ায় ঘাস গাঢ় সবুজ হয়। নিশ্চয়ই ঘাস জন্মাবে এলির সমাধিতে।

বাগানের মালিক চাষীটি দূরে দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য করে। পাতলা ঢ্যাঙা লোকটি। বিড়বিড় করে শাপ-শাপান্ত করছে। ক্ষতি পূরণ বাবদ সে টাকা চায়। গুলি বৃষ্টিতে ছিন্ন-ভিন্ন আপেল গাছগুলোর দিকে চেয়ে তার গালাগাল বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবারও সে গালমন্দ শুরু করে। তারস্বরে বলে, যত পারিস পুঁতে রাখ। লাঙল দিয়ে চষে আমি বার করবই করব।

আমাদের মধ্যে জনকয়েক তার দিকে ফিরে তাকায়। সেই তাকানোর চোটেই তার গালমন্দ বন্ধ হয়ে যায়! এখনও আমরা গা-হাত-পা ধুইনি। সকলেরই রক্তমাখা বীভৎস চেহারা। তাহলেও বিজয়ী তো!

এলির জন্য একখানা তরোয়াল চাই। তার সঙ্গে একখানা তরোয়াল দিতে হবে আর মুখ ঢেকে দিতে হবে রেজিমেন্টের ঝাণ্ডা দিয়ে। আমাদের রেজিমেন্টের পাত্তা নেই! কোন পতাকাও নেই আমাদের! এলি কোনদিন তরোয়াল ব্যবহার করত না। যাই হোক, রণক্ষেত্রে তরোয়ালের অভাব নেই।

মৃত ফুজিলিয়ার্সদের মধ্যে গেলাম! এখনও তাদের কবর দেওয়া হয়নি। তাদের কিছু লোক শূন্যদৃষ্টিতে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। অধিকাংশই অল্পবয়সী। মৃত্যুর কোলেও লালকোট পরা ফুজিলিয়ার্সদের সাহসী দেখায়। আগে হলে এদের জন্য করুণা হত। কিন্তু এখন কোন কিছুর জন্যই করুণা নেই। এলির জন্যও না।

বেশ সরু একখানা পোশাকী তরোয়াল পেলাম। নীল পতাকাও যোগাড় হয়। নীল রঙটা বেশ স্নিগ্ধ। পতাকাটি দিয়ে এলিকে ঢেকে দিলাম আর তরোয়ালখানি রেখে দিলাম পাশে। পতাকার উপর নোংরা পড়ে। তারপর এলির শেষ-শয্যার সাক্ষী রইল ছোট একটি ঢিবি। ঢিবির উপর একখানা বেয়নেট পুঁতে কবরটি চিহ্নিত করে রাখলাম। এই মরচে পরা বাঁকানো বেয়নেট কারও কোন কাজে লাগবে না। সামান্য কিছুক্ষণই এখানা খাড়া হয়ে থাকবে।

এলি মরে গেছে। জেকবও নেই।

লক্ষ্যহীনের মত হেঁটে বেড়াচ্ছি। সারা মাঠে মৃত্যুর বিভীষিকা। কিন্তু মৃত্যু আর এখন আমায় বিচলিত করতে পারে না।

আজকের গরমটা কালকের চাইতে কম। আকাশে কয়েক খণ্ড পাতলা মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। মাটিতে তার ছায়া পড়ে। একটা গাছের তলায় বসে আমি পা ছড়িয়ে দিই। দীর্ঘ বিশ্রাম···

একটি লোক আমার কাছে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। জিজ্ঞাসা করি, কি চাও?

রেজিমেণ্ট খুঁজে পাচ্ছি না ক্যাপ্টেন।

আমায় ক্যাপ্টেন বলছ কেন?

কালকে আপনিই তো আমাদের চালনা করেছিলেন।

তবুও সে দাঁড়িয়ে থাকে।

আরও কিছু বলবে ?
আপনিই আমার ব্রিগেড চালনা করেছিলেন।
সে তো কালকের কথা।
আপনার কাছেই কি হাজিরা দিতে হবে ক্যাপ্টেন ?
বল্লাম তো, সে সব তো কালকের কথা।
নদীতে গিয়ে স্নান করলাম। আরও বহু লোক উলঙ্গ হয়ে ঠাণ্ডা জলে গড়াচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে জলের মধ্যে শুয়ে থাকি। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ি আর ঠাণ্ডা জল কুলকুল শব্দে গায়ের উপর দিয়ে বয়ে যায়। বেশ ঠাণ্ডা জল। ভারি আরাম লাগে চেয়ে দেখি, খণ্ড খণ্ড মেঘ গড়িয়ে যাচ্ছে আকাশ পথে।
এখন কি করব, কোথায় যাব, তাই নিয়ে সবাই কথা বলে। কথাবার্তার ভাব শুনে মনে হয়, যুদ্ধ যেন শেষ হয়ে গেছে। ইংরেজরা পরাজিত—ফ্রান্স এখন আমাদের মিত্র।
লোকজন তখন বাড়ি ফিরবার কথা তোলে। এই আলোচনায় অস্বস্তি বোধ করি আমি। ফিরে যাবার স্থান আমার এখন আর নেই। কোন জীবনের অস্তিত্ব নেই শুধু এ-জীবন ছাড়া। এককালে যাকে বাড়ি বলতাম, তা আজ স্বপ্নের মত মনে হয়। এখন বাস্তব রয়েছে এইখানে--এই বিপ্লবের সঙ্গে। আবার জামা কাপড় পরি। শার্ট নেই, আছে শুধু একটা ছেঁড়া ব্রিচেস আর আর একটা বন্দুক। একলা হাঁটতে থাকি।
আবার সেই ফলের বাগানে ফিরে আসি। ওয়েনের সঙ্গে দেখা হয়। ঘাসের উপর বসে আছেন! স্টুবেন দাঁড়িয়ে আছেন তার পাশে। ওয়েন সোৎসাহে গড় গড় করে কথা বলে চলেছেন। মুখে প্রসন্ন হাসি। ভুরু কুঁচকে স্টুবেন তার ইংরেজী বুঝবার চেষ্টা করছেন।
তাদের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। ওয়েন আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, আলেন হেল।
হাঁ স্যার।
ঘাড় নেড়ে স্টুবেনকে ইশারা করে বলেন, এর কথাই আপনাকে বলছিলাম।
স্টুবেন জার্মান ভাষায় বলেন, খুব সাহসী লোক তুমি, ভাল পরিচালনা করেছ।
আমি মাথা ঝাঁকাই। না স্যার, সাহসীরা সবাই মরে গেছে। ওয়েনকে বলি, আমার ব্রিগেড উধাও হয়ে গেছে। আমাদের রেজিমেণ্ট ভেঙে দিয়েছে।
কে ভেঙে দিল।
হাত দিয়ে আমি এলির কবর দেখাই। ওয়েন তখন উঠে আমার দিকে হাত বাড়ান। বলেন, মনে পড়ে একদিন তুমি আমার হাতে হাত দিতে অস্বীকার করেছিলে ?
মাথা নেড়ে সায় দিই আমি।
তোমাদের আর সবাই কোথায়, কোথায় গেল নিউ ইয়র্কের লোক জন ?
সব মারা গেছে স্যার।
কিছুক্ষণ তার মুখে কোন কথা ফোটে না, তারপর বলেন, আমি তোমাকে ক্যাপ্টেন বানিয়েছিলাম। তুমি একটা ব্রিগেড চালনা করেছ।
সে ব্রিগেডের অস্তিত্ব আর এখন নেই স্যার।
তাহলেও তোমার এই র‍্যাঙ্ক যাতে পাকা হয় তার ব্যবস্থা করব।

মাথা নেড়ে আমি স্যালুট জানাই। তারপর ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকি। এলির কবরের পাশ দিয়ে যাই। বেয়নেট এখুনি একটু হেলে পড়েছে। আর বেশীক্ষণ খাড়া থাকবে না।

স্থান ত্যাগের পূর্বে আমরা একবার প্যারেড করি। রণক্ষেত্রে সার বেঁধে দাঁড়াই। সামনে আর মাঝখানে পেনসিলভানিয়ানদের লাইন। এখন অধিকাংশই গণফৌজ আর স্বেচ্ছাসৈন্যার দল। গণফৌজের প্রতিটি কোম্পানীতে গত শীতকালের অভিজ্ঞতা আছে এমন জনকয়েক পল্টনে নাম লেখান নিয়মিত সৈন্যদের ভাগ ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা তুলনায় খুবই কম।

প্রচণ্ড রোদের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকি। হাতে তপ্ত বন্দুক আর কানের পেছনে আপেল গাছের সবজে কুঁড়ি। জেনারেলরা সৈন্য পরিদর্শন করে আমাদের প্রশংসা করেন। সেই ভিখারীরা আজ সাহসী সৈন্যদল হয়েছে—দাঁড়িয়ে রয়েছে বিজয়ী রণক্ষেত্রে। ভিখারীরা লড়াই করে তাদের বাঁচবার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

এ আজ ইতিহাস।

এলি শুয়ে রইল এই মনমাথের রণক্ষেত্রে। জেকবও আছে সঙ্গে। আর সবাই রয়ে গেল ফোর্জ উপত্যকা নামে একটা জায়গায়। গ্রীষ্মকালে এই ফোর্জ উপত্যকা সুন্দর সবুজ হয়ে ওঠে। কোনো শীতকালেও আর এ-বছরের মত শীত পড়বে না। মাটির বুকে যেখানে তারা শুয়ে আছে, নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে মাটির অতটা গভীর জমে যাবার মত ঠাণ্ডা আর কোনকালেই পড়বে না।